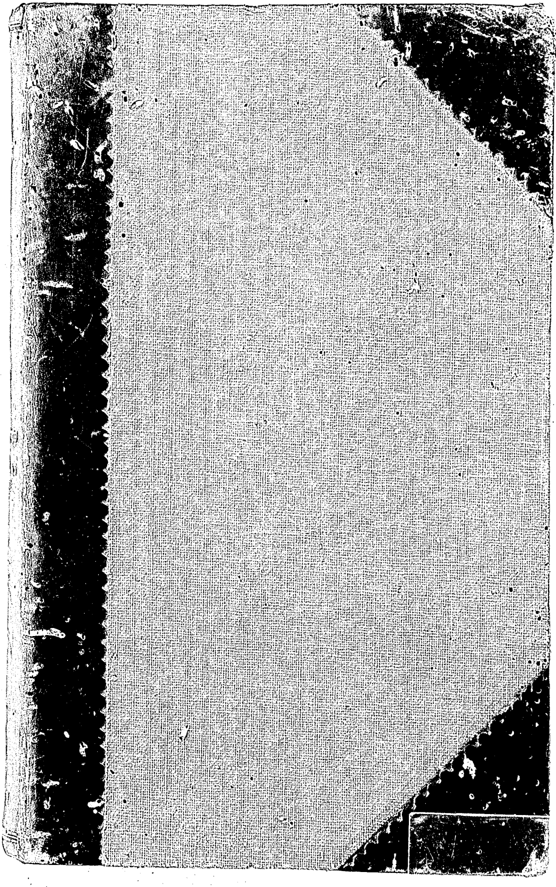

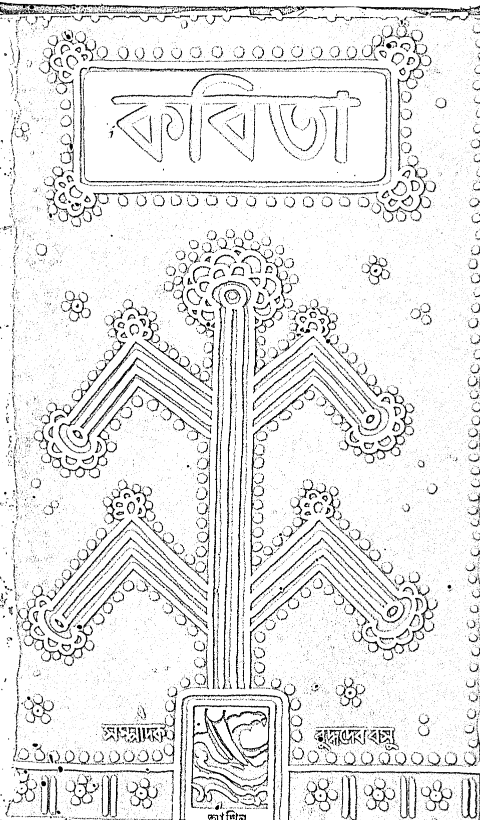
কবিতা
সম্পাদক
বুদ্ধদেব বসু
আশ্বিন

কবিতা

আশ্বিন ১৩৬০

সুস্মিতা সরকার, অমিয় চক্রবর্তী, নরেশ গুহ, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শামসুর রাহমান, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মৃণালকান্তি, সরিৎ শর্মা, বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, আনন্দ বাগচী, আলাউদ্দিন আল আজাদ, বটকৃষ্ণ দাস

অনুবাদ

রাইনের মারিয়া রিল্‌কে থেকে :
বুদ্ধদেব বসু

প্রবন্ধ

চলতি কালের ফরাসী কবিতা :
লোকনাথ ভট্টাচার্য

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-র 'সংবর্ত' :
অরুণকুমার সরকার

প্রবন্ধ

সমালোচনা :

কবিতা

ত্রৈমাসিক পত্র

আশ্বিন, পৌষ, চৈত্র ও আষাঢ়ে প্রকাশিত। * আশ্বিনে বর্ষারম্ভ, বছরের প্রথম সংখ্যা থেকে গ্রাহক হ'তে হয়। বার্ষিক চার টাকা, রেজিস্টার্ড ডাকে পাঁচ টাকা, ভি. পি. স্বতন্ত্র। ষাণ্মাসিক গ্রাহক করা হয় না। * চিঠিপত্রে গ্রাহকনম্বরের উল্লেখ আবশ্যক। ঠিকানা পরিবর্তনের খবর দয়া ক'রে সঙ্গে-সঙ্গে জানাবেন, নয়তো অপ্রাপ্ত সংখ্যা পুনরায় পাঠাতে আমরা বাধ্য থাকবো না। অল্প সময়ের জন্য হ'লে স্থানীয় ডাকঘরে ব্যবস্থা করাই বাঞ্ছনীয়। * অমনোনীত রচনা ফেরৎ পেতে হ'লে যথাযোগ্য স্ট্যাম্পসমেত ঠিকানা-লেখা খাম পাঠাতে হয়। প্রেরিত রচনার অনুলিপি নিজের কাছে সর্বদা রাখবেন, পাণ্ডুলিপি ডাকে কিংবা দৈবাৎ হারিয়ে গেলে আমরা দায়ী থাকবো না। * সমস্ত চিঠিপত্রাদি পাঠাবার ঠিকানা :

কবিতাভবন

২০২ রাসবিহারী এভিনিউ,
কলকাতা ২৯

কবিতা

সম্পাদক

বুদ্ধদেব বসু

অষ্টাদশ বর্ষ

আশ্বিন ১৩৬০—আষাঢ় ১৩৬১

ক্রমিক সংখ্যা ৭৫—৭৮

কবিতা ভবন

বার্ষিক সূচীপত্র

কবিতা

অন্নদাশঙ্কর রায়
রাতের অতিথি
(কাব্যনাটিকা) ১২৩
অধ্যায় শেষ ১৯৮

অমিয় চক্রবর্ত্তী
প্রবাসী ৩
পাগলা জগাইয়ের গান ৭৫
এরোপ্লেনে ১৩৪
অপঘাত ১৭৩

অশেষ চট্টোপাধ্যায়
আত্মচেতনাকে ১৯৪

অরবিন্দ গুহ
অপেক্ষা ১৪৫

অরুণকুমার সরকার
বর্ষণ ২১১

অরুণ ভট্টাচার্য
ময়ূরাক্ষী ৮৭

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত
জীবনস্মৃতি ১৫৭
নির্জন দিনপঞ্জী ২০১

আনন্দ বাগচী
ভোগবতী ৩৩

আলাউদ্দিন আল আজাদ
জলরং ৫০

আলোক সরকার
আপনার সুর ১৯১

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
আকাশের ঘুম নেই ১৫
বাঁচলে পরেই ৮৯

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত
রাজা ৩২
অন্বেষণ ৯৫

জীবনানন্দ দাশ
একটি নক্ষত্র আসে ১১৭

নরেশ গুহ
শান্তির গান ৬
তাতারসমুদ্র ঘেরা ৯৭

পূর্ণেন্দুবিকাশ ভট্টাচার্য
কবি ৯২
সহজিয়া ১৫৩

প্রণব মিত্র
বলো না কতদিন ৯৩

বটকৃষ্ণ দাস
কোনো বন্ধুকে লেখা ৫৩
হৈমন্তী ১৫২

বিষ্ণু দে
যামিনী রায়ের এক ছবি ৭৮
হোমরিক ষট্‌মাত্রা ১৭৪

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়
বউ ডোবা দীঘি ১২
অভিনয় তৌর্যত্রিক ৮২

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
ত্রৈলোক্যনাথের কঙ্কাবত ২৩
কাক ডাকে ১৪১

বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যয়ে
যাবার দিনের কবিতা ১৮

বুদ্ধদেব বসু
স্বর্গ ১১৩
দিনের পর দিন : দোকান ১১৮
শীতরাত্রির প্রার্থনা ১৫৯
সমুদ্রের প্রতি—জাহাজ থেকে ২১০
আবির্ভাব ২১২

মৃণালকান্তি
নির্জন স্বাক্ষর ২৪

যুগান্তর চক্রবর্তী
প্রাণশিল্প ৭৯

JESSICA LEWIS
Sadist Time ৯৯
Fledged ১০০

রাজলক্ষ্মী দেবী
মধুবনী থেকে কানাডা ১৫৩
ওয়ার্ডস্‌ওঅর্থের প্রতি ১৯৭

লোকনাথ ভট্টাচার্য
নাম-না-জানা শিল্পীর আঁকা বিবসনা ১৪৭
মুনলিট সনাটা ১৮৯
আর এক বসন্ত ১৮৯

শামসুর রাহমান
জর্ণাল, শ্রাবণ ১৬
১৩৫৭-এর একটি দিন ১৯
অতি পুরাতন বৃষ্টি ৮
যুদ্ধ ১৩৭

শোভন সোম
দুটি কবিতা ১৫০
তিনটি কবিতা ২০৯

সঞ্জয় ভট্টাচার্য
স্মরণে ৮
ভাদ্রপদা ৮১
নাম ১৪০

সরিৎ শর্মা
ডায়ালে

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
প্রেমের কবিতা ২২
সমর্পণ ১৩৯

সুনীলচন্দ্র সরকার
তাকে আজ ডাকি ১৫৫
ভিতর এলাকা ১৯২
নটীর পূজার নটী ১৯২

সুস্মিতা সরকার
সকাল-সন্ধ্যা ১
স্কেচ ৮৪

সৈয়দ শামসুল হক
এই মেঘ এই রৌদ্রের বনে ১৫১

সৌম্য মিত্র
পতঙ্গ ১৮৮

স্বদেশরঞ্জন দত্ত
ছায়াছবি ১৪২

হরপ্রসাদ মিত্র
পিয়াল ৮৫
জোনাকি ৮৫

হুমায়ুন কবির
প্রতারণা ২০৭

অনুবাদ

বুদ্ধদেব বসু
আবিশাগ
(রাইনের মারিয়া রিলকে) ৪

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত
প্রদীপ
(হিউ মেনাই অবলম্বনে) ৯
ফনের দিবাস্বপ্ন
(মালার্মের ফরাসী অবলম্বনে) ৬৫
আদিনাগ
(ভালেরির 'এবোশ দ্যঁা সের্পা' অবলম্বনে) ১৭৫

প্রবন্ধ

অমিয় চক্রবর্তী
মার্কিণ প্রবাসীর পত্র ১০১

অরুণকুমার সরকার
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-র 'সংবর্ত' ৫৪

নরেশ গুহ
বুদ্ধদেব বসুর কবিতা ২১৩

লোকনাথ ভট্টাচার্য
চলতি কালের ফরাসী কবিতা ৩৪

সুনীলচন্দ্র সরকার
রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা ১৬৫

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত
ফনের দিবাস্বপ্নের ভাষ্য ৭০

আলোচনা

অরুণকুমার সরকার
‘সময় ও সাহিত্য’ ৬২
‘স্বর ও অন্যান্য কবিতা’ } ২২১
‘স্বগত সন্ধ্যা’ } ২২১

নিমাই চট্টোপাধ্যায়
‘কয়েকটি সনেট’ ১২১

আধুনিক বাংলাকাব্যে একটি স্মরণীয় ঘটনা

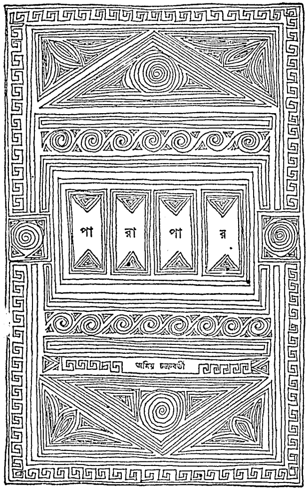

পা রা পা র্

অমিয় চক্রবর্তীর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনাসংগ্রহ

বাঙালি কবিদের মধ্যে প্রকৃতই সর্বদেশীয় কবি অমিয় চক্রবর্তী। চিরন্তন বাংলাকাব্যের ঐতিহ্যপুষ্ট তাঁর রচনা আন্তর্জাতিক কাব্য-লোকের আকাশে শাখা মেলেছে। তাঁর তুল্য দেশভ্রমণের সৌভাগ্য পৃথিবীতে মুষ্টিমেয় লেখকের জীবনেই ঘটে থাকে। বাংলাকাব্য লাভবান হয়েছে সেই ভ্রমণের ফলে, নতুন বিচিত্র ভূগোলের অভাবিত রসে সমৃদ্ধ হয়েছে তাঁর রচনা। পারাপার কাব্যগ্রন্থের বেশির ভাগ কবিতা বিদেশে রচিত। ছন্দভাবময় এক গভীর কাব্যপ্রেরণা এখানে বিচিত্র বিদেশের আবহময় হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। দাম আড়াই টাকা।

সিগনেট প্রেসের বই।

সিগনেট বুকশপ। ১২ বঙ্কিম চাটুজ্জ্যে স্ট্রিট। ১৪২।১ রাসবিহারী এভিনিউ

important books on
MAHATMA GANDHI

1. MY DAYS WITH GANDHI.
by Prof. Nirmal Kumar Bosu.

The author who served as Mahatma Gandhi's Secretary during the critical and final period of his life shows by a detailed analysis of a mass of unpublished letters and documents, how two grave crises of Gandhi's life helped in shaping the destiny of Indian Nation.
Rs 7/8, or 10s.

2. STUDIES IN GANDHISM.
(*by the same author*)

বাংলা উপন্যাস

(লেখক কর্তৃক পরিমার্জিত ৩টি উপন্যাসের নতুন সংস্করণ)

বুদ্ধদেব বসু-র
হে বিজয়ী বীর
এবং
লালমেঘ
প্রতিভা বসু-র
মনোলীনা
(শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে)

৯৩ হ্যারিসন রোড, কলকাতা ৭

এতকাল
ছোটরা
ভূতের
গল্পে
ভীত
হয়ে
এসেছে
এবার
পুজোয়
ভূতেদের
ভয়
পাবার
হাস্যকর
কাহিনী

এলোমেলো
বুদ্ধদেব বসুর
হাত
থেকে
প্রকাশিত
হচ্ছে
১।০

৮৯, হ্যারিসন রোড, কলকাতা ৭

The following works of T. S. Eliot are available from immediate stock.

PROSE.

Selected Essays, 20s.
Essays Ancient And Modern, 7/6d.
The Use of Poetry And The Use Of Criticism, 8/5d. ('the finest criticism of the century'—Week-End Review).
The Idea of A Christian Society ('this is one of Mr. Eliot's most powerful pieces, in thought and structure alike'—Observer), 7/6d.
What is a Classic ? (A lecture to the Virgil Society), 5s.
Notes Towards The Definition of Culture, 10/6d.
Poetry And Drama, 7/6d.
Points of view (A selection of Mr. Eliot's prose), 6s.
The Sacred Wood, 8/6d.

POETRY

The Wasteland & other poems, 4/6d.
The Cocktail Party, 10/6d.
Collected Poems, (1909—1935), 10/6d.
Four Quartets, 7/6d.
Murder In The Cathedral, 7/6d.
The Family Reunion, 10/6d.
Old Possum's Book of Practical Cats, 5s.
Selected Poems, (Penguin). 2s.

Conversion Rate Rs. 0-12-0 per shilling.

Mr. Eliot at present is at work on a new play, "The Confidential Clerk", which is to be produced at the 1953 Edinburgh festival.

Rupa & Co

Publishers' Agents & Wholesale Booksellers.
15, Bankim Chatterjee Street (College Sq.)
CALCUTTA-12.

and at 107, SOUTH MALAKA, ALLAHABAD-1.

আরামে ভ্রমণের জন্য
ডানলপ
TRADE MARK

সুন্দর
কেশগুচ্ছ...
বেঙ্গল কেমিক্যালের
ক্যান্থারাইডিন হেয়ার অয়েল
কেশমূল সতেজ রাখে ও কেশের শ্রী বৃদ্ধি করে
বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা · বোম্বাই · কানপুর

অরুণকুমার সরকারের

দূরের আকাশ ২৲

প্রমথনাথ বিশীর

উত্তর মেঘ ২৲

হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের

অমর প্রেম ২৮০

কৃষ্ণদয়াল বসু অনূদিত

মেঘদূত ৪।০

মিত্রালয়: ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট : কলি ১২

সত্যিকারের ভালো

চা

নিজেই নিজের গুণগান করে

আমাদের চা সেই রকম

সুবোধ ব্রাদার্স

কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য প্রণীত প্রেমের কবিতার বই ০ দুই টাকা ০ ২২শে শ্রাবণ প্রকাশিত

পথবেলা

প্রকাশক ০ পূর্বাশা লিমিটেড ০ কলিকাতা
৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, ফোন - ২৪। ১২০৯

॥ সম্প্রতি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে ॥

দ্বাদশ খণ্ড

ত্রয়োদশ খণ্ড

চতুর্দশ খণ্ড

রবীন্দ্র রচনাবলী

॥ পূজার পূর্বেই প্রকাশিত হবে ॥

সপ্তম খণ্ড

পঞ্চদশ খণ্ড

॥ শীঘ্রই প্রকাশিত হবে ॥

ষোড়শ খণ্ড

উল্লিখিত খণ্ডগুলি ছাড়া এখন পাওয়া যাচ্ছে ॥ ক: কাগজের মলাট, প্রতিখণ্ড আট টাকা— প্রথম, নবম, দশম, একাদশ, ত্রয়োবিংশ থেকে ষড়বিংশ খণ্ড ॥ খ: রেক্সিনে বাঁধাই, সাধারণ কাগজে ছাপা, প্রতিখণ্ড এগারো টাকা প্রথম, নবম, দশম ও একাদশ খণ্ড ॥ গ: রেক্সিনে বাঁধাই, মোটা কাগজে ছাপা, প্রতিখণ্ড বারো টাকা—দশম ও একাদশ।

রবীন্দ্র-রচনাবলী পাবার সহজ উপায় ॥ আপনি কোন্ কোন্ খণ্ড সংগ্রহ করেছেন বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগে (৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলকাতা ৭) চিঠি লিখে তা জানিয়ে, স্থায়ী গ্রাহক হয়ে থাকা। ক খ গ কোন্ রকমের বই আগে কিনেছেন তা জানালে সেই রকম বই দেবার চেষ্টা করা হবে। কোনো খণ্ড প্রকাশিত বা পুনর্মুদ্রিত হলেই গ্রাহকদের চিঠি লিখে জানানো হয়। গ্রাহক হবার জন্য অনুরোধপত্রই যথেষ্ট, কোনো দক্ষিণা বা অগ্রিম মূল্য জমা দিতে হয় না।

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় ০ ২ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলকাতা

কবিতার পুনর্মুদ্রণ

আষাঢ় : ১৩৬০

Bilingual Number

কিছু বেশী পরিমাণে ছাপানো সত্ত্বেও প্রকাশমাত্রই কবিতার গত সংখ্যাটি সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হয়েছে। কাজেই যাঁদের ইচ্ছে ছিল তাঁদের মধ্যে অনেকেই সংখ্যাটি সংগ্রহ করতে পারেন নি। বিদেশ থেকেও যত কপির অর্ডার এসেছিল তার একাংশ মাত্র পাঠানো সম্ভব হয়েছে। নতুন বাংলা কবিতা ছাড়াও এসংখ্যায় অতিরিক্ত ছিল বিশিষ্ট বাঙালী কবিদের থেকে ইংরেজী অনুবাদ। অনেকেই সংখ্যাটি পুনর্মুদ্রণের জন্যে অনুরোধ জানিয়েছেন। যাঁরা পূর্বে সংগ্রহ করতে পারেন নি, কিংবা নতুন করে ছাপানো হলে যাঁরা সংগ্রহ করবেন তাঁরা দয়া করে অবিলম্বে চিঠি লিখে আমাদের জানালে সংখ্যাটি আমরা পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা করতে পারি।

কবিতাভবন

বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত
আধুনিক বাংলা কবিতা
আধুনিক বাংলা কবিতার শ্রেষ্ঠ সঙ্কয়ন

বাংলার সাম্প্রতিক শ্রেষ্ঠ কবিদের শ্রেষ্ঠ কবিতা চয়ন করে এই গ্রন্থ প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রায় একশত কবির কবিতা এখানে একত্র পাওয়া যাবে।

সুদৃশ্য ছাপা — বাঁধাই — প্রচ্ছদপট
মূল্য : পাঁচ টাকা
শোভন সংস্করণ : ছ'টাকা

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার সম্পাদিত
কথা গুচ্ছ
প্রাচীন ও আধুনিক চল্লিশজন গল্পকারের রচনায় সমৃদ্ধ
৩য় সংস্করণ : : মূল্য সাত টাকা

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের
এই মর্তভূমি ৩॥৹
অন্নদাশঙ্কর রায়ের
পথে প্রবাসে ৩॥৹
নতুন ক'রে বাঁচা ১৸৹
সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের
কাব্য সঞ্চয়ন ৫৲
হসন্তিকা ১॥৹

এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিঃ
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রিট, কলকাতা ১২

কবিতা
আশ্বিন ১৩৬০
অষ্টাদশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা
ক্রমিক সংখ্যা ৭৫

সকাল-সন্ধ্যা

সুস্মিতা সরকার

চৌকো থামে পোরা এক টুকরো রোদ জানলা গলিয়ে কে যেন রোজ আমার মুখের ওপর ফেলে দিয়ে যায়। থাম খুলে দেখি কড়া ভাষায় লেখা; সংসারের কাজ এদিকে অনেকটা এগিয়ে গেছে।

রাত্রের ট্রেনে চ'ড়ে ভোরে এসে নেমেছি জানা স্টেশনে। কতোবার। কিন্তু হঠাৎ একটা ছোট্ট ইষ্টিশনে এসে থামলো সেদিন ট্রেনটা। এখানে থামে না। ক্ষীণ নাড়ি-স্পন্দনের মতো দু একটা কেরোসিনের আলো টিপটিপ করছে। আমাদের জানলা গলিয়ে কিছু শৌখিন আলো গিয়ে পড়েছিলো এক জোড়া তাজা মুখের ওপর; পুরুষের ঘাড়ে মেয়েটির ঘুমন্ত মুখ। পাহাড়ের গায়ে, চাঁদের আলোর নিচে একটি ঘুমন্ত পাহাড়ি গ্রাম যেন।

কতোবার যাওয়া আসার মধ্যে আচমকা সেদিনের ঐ ইষ্টিশনের নাম, মনে পড়ে না। মনে পড়ে সেই জাগ্রত পুরুষের বুনো মুখটি। আকাশের অনেকটা পেরিয়ে শহরের কোনো মিনার-চূড়ায় জ্বলন্ত একটি আলোর দিকে বিস্ফারিত চেয়ে থাকা কোনো পাহাড়ের মতো।

তেমনি হঠাৎ একদিন খুব ভোরে ঘুম ভেঙে দেখতে পেয়েছিলাম পথে-প'ড়ে-থাকা রঙিন নুড়িগুলো ছোটো-ছোটো পাখির মতো লাফাচ্ছে। আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পেলাম ওরা হাঁটছে।

কিছু দূরেই মসজিদ। ভোরের আজান পড়ছে বুড়ো নেয়াজ। ওকে সেদিন শাজাহানের মতো লাগলো। আর মসজিদটা যেন তাজমহল। আজানের করুণ সুরে মুমতাজ নেমে আসছে। ধীরে-ধীরে ফুটে উঠছে ওর

হাতের তাজা গোলাপ ফুলটা। টকটকে লাল। শিশিরের মতো ভেজা-ভেজা তারাগুলো ঝ'রে পড়ছে টুপটাপ—মুমতাজের কুনুইয়ে, বুকে, কোমরে ধাক্কা লেগে। কিংবা মিশে যাচ্ছে ওর টলটলে রঙে। যেমন ক'রে লম্বা ঘাসের ডগা থেকে এক কণা জল টুপ ক'রে ঝরে, মিশে যায় নদীর জলে। একটি দুর্বল হাত কোনো সরল রেখা টানতে গিয়ে যেমন কেঁপে যায়, তেমনি কেঁপে উঠলো নদীর সোনালি তার।

আহা, আমার চোখের পাতায় অমনি ক'রে ঝ'রে পড়ে যদি দু একটা তারা; ভিজিয়ে দেয় আমার চোখ দুটো! কালো রেশমি সুতোর মতো আমার ভুরু দুটো কেঁপে উঠবে। না জানি দেখতে কেমন হবে—যা রোজ দেখি, দেখতে পাচ্ছি। হয়তো তবে আমারি দেখার জগতের স্পর্শও পাবো। ঐ—ঐ যে দূরে মুমতাজের গোলাপের ছোঁয়া লাগলো যে শুকনো গাছটার হাড়ে, পাঁজরে তার স্পর্শ, আর, কী ঠাণ্ডা।

রোজের মধ্যে এ একটা অন্য রকম ভোর। গ্লাশের জল দু আঁজলায় নিয়ে দেখলাম অন্য আকার নিয়ে টলটল করছে হাতের জল। আস্তে-আস্তে মুখ ডোবাই। আমার মুখের ছাঁচ পড়লো সে-জলে। কী নিষ্ঠুর জলের কাছে আমার এ কঠিন মুখ!

ভাঙছে, শুধু ভাঙছে। আকার থেকে আকারে। মনের এক কোঠা থেকে অন্য কোঠায়। ক্লান্ত চোখের দৃষ্টিতে উত্তপ্ত চোখ, উদাস চোখ, অপমানিত চোখ, ক্রুদ্ধ চোখ; হিংস্র চোখ, নিরাশ চোখ, আশাপূর্ণ চোখ। শুধু রূপের আকার আর তার পরিবর্তন।

সুন্দর কোথাও ভীষণ, সুন্দর কোথাও হিংস্র, সুন্দর সেখানে প্রতিবাদ, সুন্দর যেখানে মীমাংসা—সুন্দর তখন আনন্দ।

আচমকা দুটো দিন এক জোড়া আনন্দ-সুন্দর চকচকে চোখ তুলে তাকালো আমার দিকে। হলুদ খামে, সকাল-সন্ধ্যা দুদিকটা আঠা দিয়ে জোড়া। মধ্যিখানে অনেক কাটাকুটি দিয়ে ভরা আমার কর্মব্যস্ত দুপুর। যেখানে এমন একটা অক্ষর বাদ পড়েছে, মাথা কুটেও কেউ সংসারের সচ্ছল ঠিকানাটা খুঁজে পাচ্ছে না।

প্রবাসী

অমিয় চক্রবর্তী

নিরবধি কালের সকাল। নীল ইস্পাতী রেলে জ্ব'লে ওঠে
কালো দ্যুতি, দুটো-পঁচিশের ট্রেন এল ব'লে, প্রশ্ন চক্ষু স্থির
সিগ্‌নলের—হঠাৎ সবুজ দৃষ্টি—ঝোড়ো এক্সপ্রেস ছোটে
সময়ের অন্য দূরে দূরে ; থেমে যায় আন্দোলিত ভিড়

কম্পিত পরিধিপ্রান্তে ; পাশে অসংলগ্ন জলে গম্ভীর বকের
এক-পা বাড়ানো ধ্যান : মগ্ন একটি মাছ ; উঁচু টেলিগ্রাফ তারে
কোটি বার্তা চলে তা কে জানে, তাতে ব'সে দোলায় শখের
পুচ্ছ বুনো পাখি, ভিন্ন লোকে ; মাঠে লাল ট্র্যাক্টর অন্য ধারে।

মধ্য-মার্কিনে আছি মিসিসিপি পারে, চলেছি যে-ঘড়ি হাতে
টিকটিক আয়ু তার আনে ছিন্ন এটা-ওটা : খুঁজি নিঃসময়
কোন ঘটনার ছবি—বাংলা ভাষায় গাঁথা—চিরক্ষণে যাতে
শাদা বক, ব্যস্ত ট্রেন, বুকে ধরে এই সকালের পরিচয় ॥

আবিশাগ

রাইনের মারিয়া রিলকে

১

শুয়ে পড়লো। তার বাহু দুটি—শিশুর বাহু—ভৃত্যেরা বেঁধে দিলো
শুকনো পাংশু পুরুষটিকে ঘিরে-ঘিরে,
শুয়ে থাকলো, পতির দেহ ঢেকে, দীর্ঘ মধুর ঘণ্টার পর ঘণ্টা—
একটু ভয় পেলো তাঁর বিস্তর বয়স দেখে।

আর, যখন প্যাঁচা ডেকে উঠলো বাইরে, থেকে-থেকে
ছোট্ট মুখটি দাড়ির মধ্যে ধীরে-ধীরে নড়লো,
আর রাত্রির যা-কিছু অর্থ, যত প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত
তাকে ঘিরে ভিড় করলো সব, বাসনার অস্বস্তি নিয়ে।

তারাগুলো, যেন তার আত্মীয়, কেঁপে-কেঁপে জ্বললো,
গন্ধ ঘুরলো খুঁজে-খুঁজে সেই বাসর-ঘরে,
চঞ্চল হ'য়ে ইশারা করলো পরদা,
তার দৃষ্টি স'রে-স'রে গেলো সেই ইশারার অনুসরণে।

কিন্তু রইলো ঘন হ'য়ে তাঁর সংলগ্ন, সেই অন্ধকার পুরুষের,
আর, যদিও রাত্রিধর হৃদয়ের রাত্রি তাকে পৌঁছতে পারলো না,
তবু রইলো শুয়ে, যতক্ষণ তার বুকের তলায় রাজরক্ত হিম হ'য়ে এলো,
অস্পৃষ্ট কুমারী, আত্মার মতো নির্ভার।

২

রাজা ভাবলেন সারাদিন ব'সে-ব'সে
কীর্তিমান দিন কেমন শূন্য, কত ইচ্ছার অনুভব বাকি থাকলো,
তাঁর প্রিয় মৃগয়ার কুকুর, আদর কুড়িয়ে চ'লে গেলো কোথায়।

কিন্তু সন্ধেবেলা, আবিশাগ
বাঁকা রেখায় নিচু হ'য়ে তাঁকে ঢেকে ফেললো। তাঁর জীবন,
জটিল, গ্রন্থিময়, প'ড়ে থাকলো কুখ্যাত কোনো বেলাভূমির মতো, শূন্য,
তার শান্ত, সংহত স্তনের নক্ষত্রপুঞ্জের তলায়।

আর মাঝে-মাঝে, সহবাসে অভিজ্ঞ ব'লে,
ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে তিনি চিনতে পারলেন
তার নিষ্কাম ঠোঁট দুটিকে—রিক্ত, চুম্বনহীন ;
আর জানলেন : তার বাসনার কচি সবুজ ডাল
তাঁর অন্ধকার গভীরের দিকে নুয়ে-নুয়ে নামলো না।
হঠাৎ কেঁপে উঠলেন। কুকুরের মতো কান পেতে শুনলেন,
তারপর নিজেকে খুঁজে পেলেন তাঁর অন্তিম শোণিতে।

অনুবাদ : বুদ্ধদেব বসু

নাস্তিকের গান

নরেশ গুহ

শাস্তিও যদি সিংহের মতো গর্জায়,
তাকে ডরাই,
ভালুকের মতো আগলিয়ে থাকে দরজায়,
তাকে ডরাই,
ঈগলের মতো বাঁকা নখে পড়ে ঝাঁপিয়ে,
ডুকরিয়ে কাঁদে গৃহস্থপাড়া কাঁপিয়ে,
বুড়ি ছুঁতে গিয়ে অবেলায় পড়ে হাঁপিয়ে,
তাকে ডরাই।

আমার শান্তি সাধু ভৃত্যের মতো,
বাড়িঘর দেবে পাহারা।
চোখে মুখে হেসে বশ রাখবে সে সতত
বাস করে যারা এ পাড়ায়।
বলি যদি : 'ওঠ', উঠবে, 'চা আনো',
'রাতে আলো জালো তিনশো'—
—তিনশো মাটির প্রদীপ জালবে
কে করবে তারে হিংসে ?
কে তারে করবে ভয়।
আমি বলি : সেই শান্তির হোক জয়।

সেই তো আমার সাধ্য শান্তি,
বিশ্বাসী, প্রভুভক্ত।

অনেক কালের পুরোনো সে লোক,
দুজনে জেনেছি দুজনের শোক,
দুজনের আশা-নেশা-আনন্দ
চিনিয়ে দিয়েছে বিজ্ঞ সময়।
আমি, সে (আমার প্রহরী), উভয়ে
ডরাই লড়াই রক্ত ॥

স্মরণে

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

তোমার নাম তো নয় শাড়ির আঁচল
টেনে নিয়ে মোছা যাবে শাওনের জল
অশ্রুর ছবি চোখে ঝলমল ফোঁটা!
ফোটা ফুলও হত যদি ছিঁড়ে নিয়ে বোঁটা
হৃদয়কে দেয়া যেতো সুরভিত শ্বাস!

নাম নয় আকাশের কোনো নামী তারা
তাকিয়ে যে বাকি ক'টা দিনের পাহারা
পার হয়ে পাব এক কবোষ্ণ আবাস
মরণ মেরুর শীতে মেরুন আলোর
অরোরার ভিড়ে!
আর আছে কি সে ভোর?

প্রেম নয় খালি শালীনতা আমাদের
এ-কথা বলার আছে। যদি এসো ফের
পৃথিবীতে দিতে শীত প্রেত হয়ে আজ
কি অশ্লীল আগুনে যে এ-দেহ নিলাজ
হয় অহরহ নিজে দেখে যাও এসে—
সে কোথায় যারে রেখে গেছ ভালবেসে॥

প্রদীপ

(হিউ মেনাই-এর কবিতা অবলম্বনে)

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

বনবীথি জনশূন্য নিশীথে,
শঙ্কিত শিখা বক্ষোদীপে,
সুদূরের বাঁশি ডাকে অভিসারে,
পিছনে কে আসে পা টিপে টিপে?
পথের দু পাশে ভূতের জটলা
স্মৃতি-বিস্মৃতি উজাড় করে;
চিত্রার্পিত পুরাণকাহিনী
নক্ষত্রের ঘুণাক্ষরে;
চক্রী পবনে গূঢ় কানাকানি,
প্রতিবাদে জাগে প্রতিধ্বনি;
বনস্পতির নিবিদ রটায়
অবোধ হৃদয়ে কী আগমনী!
অনাদি কালের চির রহস্য
ত্রস্ন্ শরীরে বেপথু হানে;
সৃজননেমীর ঘূর্ণাবর্ত
ভ্রাম্যমাণেরে কেন্দ্রে টানে;
বিশ্বপিতার হাতে হাত রেখে,
শিশু ধরিত্রী আচম্বিতে
দোলা ছেড়ে ওঠে, টলমল পদে
ক্রান্তিবলয়ে টহল দিতে।
স্তম্ভিত কভু হয় না সে তবু,
যদিও পলক পড়ে না চোখে;

শুধু আনন্দবেদনার সাড়া
পায় মাঝে মাঝে মানসলোকে ॥

নিশীথে বিজন বনবীথি যবে,
শঙ্কিত শিখা বক্ষোদীপে,
নিরুদ্দেশের যাত্রী তখন
আপনার ছবি নিরখে নীপে ;
প্রথম প্রাণের পরম প্রণবে
সার্থক তার মর্মবাণী ;
অভিসারিকার নূপুরে সে-সুর,
সে-তালে দোদুল অরণ্যানি।
অগ্নিগর্ভ গুল্মে আবার
পুরাণপুরুষ আবির্ভূত ;
কাণ্ডে কাণ্ডে ধরা পড়ে যূপ
আত্মবলির মন্ত্রপূত ;
যুগান্তরের সঞ্চিত খেদ
নিবেদন করে মৌন তারে,
মৃত্যুদণ্ডে নতশির যিশু
তারই অগ্রিম কপটাচারে।
দর্শক আর দৃশ্যের দ্বিধা
ঘুচে যায় তার সঙ্গোপনে,
থাকে না প্রভেদ শ্রুতিতে শ্রোতাতে,
প্রবর্তকে ও প্রবর্তনে ;
প্রেমেও যেহেতু নিষ্কাম, তাই
নির্বিকার সে দুঃখে, সুখে ;
আত্মীয়-পর সরূপ যমজ,
পক্ষপাতের আপদ চুকে।

নৈশ পাখীর স্বগত কূজনে
পূরে আরব্ধ কাব্যকলি ;
জানে সে কোথায় মাধুরী জমায়
অন্ধকারের অতলে অলি ;
চটকের চ্যুতি দেখে সে যেমন,
তেমনই মুগ্ধ উল্কাপাতে ;
ভাস্বর বনবীথিকা যখন
দীপ্রহৃদয়, নিভৃত রাতে ॥

দূর থেকে দূরে যায় সে একাকী,
নিঃস্ব, অথচ পৃথিবীপতি ;
অদ্বিতীয় সে অনুকম্পায়,
ত্রিভুবনে তার অবাধ গতি ;
মন্দাকিনীর অমৃতশীকর
থেকে থেকে তার মাথায় ঝরে ;
অধরার বরমাল্য গলায়,
সৃষ্টির চাবি মুক্ত করে,
সে আসে যেথানে বন্দী অরূপ
যক্ষজাগর পাতালে কাঁদে,
পারায়ে বনের নিশীথ নিরালা
বক্ষোদীপের আশীর্বাদে ॥

বউ-ডোবা দিঘি ও ভাঙা মহল

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

লোক-ইতিহাস কথা ক'য়ে ওঠে এখানে আজো
দুপুর হ'লেই ছায়া-ছায়া ঝোপে বাগানময়,
হে শততন্ত্রী হৃদয়, কেন যে বেসুরো বাজো
চৌধুরীদের ছোটো বউ বুঝি আত্মঘাতিনী এখানে হয় ?

অতনুর তীরে বেঁধা সুকুমার জীবন একটি বেদনাময়
কুৎসা রটনা, যত গ্লানি লোকনিন্দা, ভয়
এড়াতে চেয়ে কি মরণ নিলো সে এরি জলে
পঙ্গু সমাজ যাকে নিলে নাকো কোল পেতে দিঘি তাকে নিলে ?

অধীর হোয়ো না, দাঁড়াও এখানে
শোনো হাহাকার হাওয়ার রব।
হয়তো নেহাৎ মামুলি ঘটনা
সে নয় গল্প অসম্ভব।

সে-গল্প আর বলবে না কোনো গাঁয়ের লোক
মড়কে ও বানে বিগত সবাই বেঁচে তো এখন নেই কেউ
এ-দিঘিজলেই গ'লে মিশে গেছে ব'লে প্রবাদ
চৌধুরীদের বড়ো তরফের স্বর্ণপ্রতিমা ছোটো বউ।

হঠাৎ হাওয়ায় শ্বাস ছাড়ে যদি চৌধুরীদের ভাঙা মহল
হঠাৎ হাওয়ায় কেঁপে ওঠে যদি বউ-ডোবা পানা-দিঘির জল
স্মৃতির শিহরে কেঁপে ওঠে বোবা মরণ-ঝিল
দুপুর ফাটিয়ে ডেকে যায় যদি দূরের চিল

বুক চিরে-চিরে কান্নার মতো করুণ ডাক—
বলবো না আর, থেমেই গেলাম, এখানে থাক,
বাকিটা বলুক চৌধুরীদের ভাঙা পাঁচিল।

ধ্ব'সে-পড়া সেই গোল বুরুজের ভাঙা নহবৎখানা
ওর পাশ দিয়ে যেয়ো নাকো তুমি, না, না—
আস্তে পা ফেলো, ঘুমিয়ে রয়েছে মোহিনী মেয়ে—
এত বছরেও ভাঙেনিকো ঘুম, ছাখেনি সে চোখ চেয়ে।
স্বপনিত তবু আজো সেই নহবতের সুর
একা-একা ঘোরে আকাশে বাতাসে স্মৃতি নিয়ে বায়ু আজো বিধুর।
আস্তে পা ফেলো পথিকবর,
ওখানেই ছিলো ঘড়ির ঘর,
এখান থেকেই দেখা যেতো দিঘি
দেখা যেতো তার জলটুঙি
বউ-ডোবা-দিঘি করেছে তা গ্রাস বহুদিনই।

হরিণ-বাড়ির হাজারো কাহিনী, চৌধুরীদের অত্যাচার…
নীরব নিয়তি ক্ষমাহীনভাবে আজো করে চুল-চেরা বিচার
ডাকাত-ডাঙাটা ডানদিকে রেখে
দুরুদুরু বুকে কাটিয়ে পাশ
হরিণ-বাড়ির জঙ্গল পাবে, সেখানে শুকনো পাতার রাশ
দু'পায়ে মাড়িয়ে চ'লে যাও যদি আরো
কিংবা সেখানে বসতেও তুমি পারো।

সেখানে না যদি বোসো যেয়ো তবে
পাঁচিলটা ঘেঁষে আরেকটু পুবে
খড়কে ডুরেটি প'রে যায় ও কে ?
খিড়কি দিয়ে সে আবছা আলোকে
চললো দিঘিতে, তখন ভোর

বাগানে তখনো কাটেনি ঘোর
তারপর ভাঙা দিঘির ঘাট
ঢেউয়ের বিছানা জলের খাট
সারা তনু-মন-জুড়োনো ঘুম
সে-দিঘির কালো জল নিঝুম
কলস ভরার একটু আওয়াজ…
কালো জলে ওঠে কী ঝিলমিল !
ঠিক দুপুরের ভূতের ঢিল।
ভয় করবে না, তবু ভয় পাবে
খালি মনে হবে, খালি মনে হবে
হঠাৎ হাওয়ায় ভাঙা দরোজার খুলছে খিল।

ঘটনা এখানে বহুদিন ধ'রে হ'য়ে আছে আজো কথা
অনুভবে ছুঁয়ে দেখো সেইখানে কান্নাহীন যত ব্যথা।
উপশম খুঁজে দুপুর হাওয়ায় ঘোরে
আসে আর যায় প্রশ্ন শুধায় ভাঙা আগলের দোরে।
ওধারে যেখানে গোচারণ ছিলো
আজকে যেটার চিহ্ন নেই
খুঁড়লে হয়তো বেরোবে হাড়
মড়কে হয়েছে সব উজাড়
ছায়া খুঁজে-পেতে বসতেও পারো সেইখানেই।
বসতেও পারো ঐ তো রয়েছে দিঘির পাড়
এখনো রয়েছে সেইখানে মরা গাছের হাড়
দাঁড়াবার ভানে খাড়া হ'য়েই।

চৌধুরীদের ভাঙা বাড়ি ডাকে, ছাতি-ফাটা ডাক—'শোনোই না,
এ-ডাক না-শুনে যেতে যে নাই ;
শোনার রয়েছে অনেক গল্প সারাটা দুপুর-এসো শোনাই।'

আকাশের ঘুম নেই

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

আকাশের ঘুম নেই। শতবর্ণ তারার দেয়ালি
নিরর্থক জেগে থেকে পুড়ে-পুড়ে হয়ে যায় ছাই
কখনো সূর্যের সোনা বসন্ত বা হু-হু করে
স্মৃতিহীন আকাশের কিছু মনে নেই।

কত দীর্ঘ এ-আকাশ জানবার প্রয়োজন নেই
জানি শুধু ইথরের উপত্যকা ঘিরে
বাদুড়, চামচিকে আর জলচর হাঁস কখনো বা
হঠাৎ জোয়ার আনে, ভেসে যায় প্রাণবন্যায়।

আকাশের ঘুম নেই। অনর্থক জেগে থাকা তার
তার কাছে পেঁচা আর বাদুড়ের অর্থহীন চোখের মতন
শতবর্ণ তারাদের দেয়ালিও সঙ্গীহীন।
সেখানে ঠিকরে পড়ে অতীতের রঙিন বেদনা—

বেদনার কথা থাক। তাও বুঝি অর্থহীন আজ
জেগে-থাকা আকাশের মতো। আসলে ভাবাই ভুল,
ভুল বেঁচে থাকা, মরণেরও নেই কোনো মানে
এই কথা হয়তো বা জানে
আশ্বিনের ফাঁকা খেত, ধানকাটা মাঠ
নিশির শিশির আর ঝিমঝিম নির্জনতা ঘিরে।

অর্থহীন এ-আকাশ কোন ফাঁকে ছেয়েছে তোমাকে
বোবা স্বরে আপনার অতৃপ্ত ক্ষুধায়।

দুটি কবিতা

শামসুর রাহমান

জর্নাল, শ্রাবণ

(নার্গিস পারভীনকে)

এক

তুমি আসবে না
নিঃশব্দে নিঃসঙ্গ এই চেনা
বাগানের দরজা খুলে ফাল্গুনের বিহ্বল দুপুরে
মাড়িয়ে ঘাসের পিঁপড়ে, শুকনো পাতা। সিঁড়ির নির্জন বাঁক ঘুরে
এসে শিশিরের মতো স্বেদকণা মুছে মিহি রুমালে, হাওয়ায়
প্রীত তুমি মৃদু টোকা দেবে না দরজায়;
গানের গুঞ্জনে আর উঠবে না ভ'রে
দক্ষিণের শূন্য ঘর প্রহরে প্রহরে।

যে-চোখে ফুলের ঝাড়, ফলের গুচ্ছের ভার দেখি
সেই চোখ চোখই থাকে অনাদি, সাবেকি;
যখন তোমার দিকে চাই, চোখ আর চোখ নয়,
থরথর কম্পিত হৃদয়।
দুপুরের ছায়া মনে, হালকা পর্দা তুলে
তুমি এসে দাঁড়ালে কি পিঠ-ছাওয়া চুলে?
শুধু ভুল ভেঙে দিতে ঘরময় ব'য়ে গেলো বেনামি নিশ্বাস।
বাতাসের ঘূর্ণী নাচে বাগানের শুকনো পাতা ওড়ে পথে, পীচে—
তরতর সিঁড়ি বেয়ে সূর্য নামে পশ্চিমের, দোতলার নিচে

মশকের ভারে কুঁজো ভিস্তি, জলোচ্ছ্বাস। ভেজা ঘাস।

যাকে ভুলি, যোজন-যোজন দূরে যে যায় হারিয়ে
তাকে হাৎড়িয়ে

আনো ফের স্মৃতির রোদ্দুরে
অবিকল যেন ফুল হয়ে যাওয়া ভ্রমরের সুরে।
দূরত্বের তটরেখা ব্যাপ্ত জাগরণে
এই চরাচরে— সব ব্যবধান ঘুচে যায় মনে,
জানি ঘুচে যায়
অরণ্যমর্মরে দূর স্বপ্নের ছায়ায়:
একই স্রোতে গ'লে গিয়ে, একই কামনার সুরে ভেসে
দু'দিকের অভিসারী দুই নদী মেশে।

পাখির মতন কেউ বলে—
'অজস্র তারার ধূলি ধুয়ে যাবে শিশিরের জলে
ঘুমহারা জানালার রাত শেষ হলে।
সন্ধ্যার হাটের মেলা ভেঙে গেলে যার
ভয় থাকে কিছু হারাবার
সে-ও অনুরাগে হাত ছোঁয় কত চেনা ও অচেনা
পথিকের—' ভোরের স্বপ্নের ডালে।

তুমি আসবে না।

দুই

পৃথিবী শেখায় বহু তত্ত্বকথা, সব টুকিটাকি
আশ্চর্য খবর জানা যায় গ্রন্থকীট সেজে ব'সে;
যেখানেই থাকি
কোথাও আকাশ থেকে দূরে তারা খ'সে
গেলে টের পাই,
সাংহাই জলেছে কবে, কার চোখে ট্রয় জ'লে পুড়ে হলো ছাই,

রুশের বিপ্লবে কারা করতালি পেয়েছে প্রচুর,
জীবনের নানা ছলাকলা আর দূর
আকাশের পরপারে যা রয়েছে লেখা
একদিন সবি যায় শেখা।
শিল্পের জটিল সূত্র উন্মীলিত হয়
রবীন্দ্রনাথের গান সময় সময়
হাওয়া দেয়, হাওয়া দেয় সত্তার গভীরে,

তবু জানি, মেয়ে, এত আলো মেঘো মনের তিমিরে
কী আশ্চর্য আজো মনে হয়—
তোমার হাতের স্পর্শ, কপালের টিপ,
তোমার কণ্ঠের মৃদু গুনগুন ধ্বনি, হাসি, কালো
চুল আর অতল চোখের ছুটি শিখা দিতে পারে যত আলো
তত আর দেয় নাকো অন্য কোনো জ্ঞানের প্রদীপ।

তিন

জানি না রাত্রির কানে কার নাম প্রার্থনার মতো
বলো তুমি ঘন-ঘন অন্ধকার নিশ্বাসের স্বরে,
পুবের জানালা খুলে গুনগুন গান গেয়ে শেষে
যখন শয্যায় জলে দেহ, কার মুখ ভেবে-ভেবে
তোমার চোখের হ্রদে নামে সব ঘুমের অপ্সরী,
কার স্বপ্ন দেখে, কার তীব্র চুম্বনের প্রতীক্ষায়
তোমার যুগল স্তন স্বর্গ হয় রাত্রির নরকে;
জানবো না কার কোলে মাথা রেখে অন্তিম বিদায়,
শেষ ক্ষমা চেয়ে নেবে পরিচিত পৃথিবীর কাছে—
হায় মেয়ে, জানবো না কোনোদিন, কোনোদিন আর।

১৩৫৭-এর একটি দিন

দৈনন্দিন নগরে ও বন্দরের ভিড়ে যত মুখ
দেখি, ছুঁই যত হাত, রংছুট জীবনের যত
টুকরো ছবি তুলে নিয়ে মনে রোজ ফিরে আসি ঘরে,
বুদ্বুদের মতো সবি একদিন হারায় সুদূরে,
মিলায় কৌতুকী ধূপে। সবি মুছে যায়? তবু কিছু
স্বর্ণ ঘটনা
জমা থাকে জাদুকর সময়ের আশ্চর্য থলিতে।

বিস্ময়ের স্তব্ধ তটে দাঁড়িয়ে দু'জন
মুখোমুখি পদ্মার স্টিমারে,
উন্মীলিত চোখের আকাশে
বিদ্যুতের মতো উঠলো জ'লে প্রিয়-সম্ভাষের শিখা।
ডেকের রেলিং ধ'রে সে-ও পদ্মাপারের সুদূর
একফোঁটা কাজল গাঁয়ের দিকে, ধূধূ শূন্য চরে
চেয়ে ছিল অপলক চোখে;
জেলেদের সরু ডিঙি চ'লে গেলো ঢেউয়ের আড়ালে।

পদ্মায় সন্ধ্যার ছায়া। দূরযাত্রী পাখিকণ্ঠে সাড়া
দিগন্তের অদৃশ্য নূপুরে,
এখানেই একদিন ছিল নাকি রৌদ্র-ছায়া-আঁকা
কোনো গ্রাম,—কোমল শিশিরে আর ঘাসে পরিপাটি,
হয়তো মুখর হ'তো মানুষের উজ্জ্বল উৎসবে সেই গ্রাম
এখন যেখানে শুধু জলের ধূসর মরুভূমি।

মদির চুলের গাঢ় তিমির-সৌরভে
সহস্র রজনীগন্ধা হৃদয়ের উষ্ণ অন্ধকারে
উঠলো ফুটে থরে-থরে, তখন হঠাৎ যদি নিতাম মুঠোয়
তুলে তার দুটি হাত,
স্নিগ্ধ গালে উঠতো জেগে লজ্জার আশ্চর্য রামধনু,
আর যা হতো তা (বলা নয়) ভাবা যায় শুধু।

দুরন্ত পদ্মার
অজানা যাত্রীর সাথে সে-ও নেমে গেলো
একফোঁটা গাঁয়ের স্টেশনে,
জলে তার পূর্ণ ছায়া, বাতাসে রুমাল, মেঘে-মেঘে ঝাপসা চোখ,
প্রৌঢ় পিতা বিব্রত শরীরে
জড়িয়ে পুরোনো শাল নামলেন ধূসর ডাঙায়,
পিছনে আড়ষ্ট গিন্নি, শিশুপুত্র। কন্যা অষ্টাদশী।
সারেঙের তীব্র বাঁশি, নিচে ফের চাকার তলায়
উচ্ছল, ফেনিল জল—দূরে নীল কুয়াশায় সুখী পরিবার।

পেরিয়ে বাঁশের সাঁকো, মাঠ। মধ্যযুগী
অশ্বত্থের নিচে হেঁটে যেতে
হয়তো পড়বে চোখে পথের কিনারে
পাড়াগাঁর কোনো
দুরন্ত ছেলের কিছু ফেলে-যাওয়া ম্লান বুনো ফল,
কড়ি আর রাঙা নুড়ি: ছেঁড়াখোঁড়া খেলার সংসার।
কার কথা ভেবে-ভেবে সেই মেয়ে পৌঁছে যাবে শেষে
তার সাতপুরুষের দেশের ভিটায়? কত সুবর্ণ ঘটনা
জমা থাকে জাদুকর সময়ের আশ্চর্য থলিতে।

নগর-শিয়রে রোজ সূর্যোদয়, সূর্যাস্তের ছবি
রং ঢালে, প্রজ্জ্বলিত হয় দিনলিপি।
কে যেন ফুঁ দিয়ে
বার-বার খুলে দেয় রহস্যের থলি;
ঝরায় বর্ষার জল প্রথামতো আষাঢ়, শ্রাবণ,
পথ চলি আশার উল্লাসে।
সব কলরব, সব গুঞ্জন ছাপিয়ে
মাঝে-মাঝে তাকে মনে পড়ার মতন
সমুজ্জ্বল বেদনায় হৃদয়কে ছিঁড়ে
জেগে ওঠে দুরন্ত পদ্মার সেই সফেন কল্লোল।

প্রেমের কবিতা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আমার যৌবনে তুমি স্পর্ধা এনে দিলে—
তোমার দু চোখে তবু ভীরুতার হিম।
রাত্রিময় আকাশের মিলনান্ত নীলে—
ছোট এই পৃথিবীরে করেছ অসীম।

বেদনা-মাধুর্যে গড়া তোমার শরীর
অনুভবে মনে হয় এখনো চিনি না,
তুমিই প্রতীক বুঝি এই পৃথিবীর ;
আবার কখনো ভাবি অপার্থিবা কিনা!

সারাদিন পৃথিবীকে সূর্যের মতন
দুপুর-দগ্ধ পায়ে করি পরিক্রমা,
তারপর সন্ধ্যার মত বিস্মরণ—
জীবনকে, স্থির জানি, তুমি দেবে ক্ষমা।

তোমার শরীরে তুমি গেঁথে রাখো গান
রাত্রিকে করেছ তাই ঝংকার-মুখর।
তোমার সান্নিধ্যের অপরূপ ঘ্রাণ
অজান্তে জীবনে রাখে জয়ের স্বাক্ষর।

যা কিছু বলেছি আমি মধুর অস্ফুটে
অস্থির অবগাহনে তোমারি আলোকে,—
দিয়েছ উত্তর তার নব পত্রপুটে
বুদ্ধ মূর্তির মতো শান্ত দুই চোখে।

ত্রৈলোক্যনাথের কঙ্কাবতী

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বসুমতী সিরিজের এককোণে রূপকথা-মমি
শুয়ে আছে। চোখে তার তেপান্তর মাঠের আকাশ
মেঘলা শেমিজে মেয়ে শরীরের স্বর্ণ লাবণি
কেমন ঢেকেছে যেন। বুকে তার কুসুমের মাস
বিবর্ণ বৈশাখী ঝড়ে পরিশ্রান্ত কথা ব'লে-ব'লে—
আশ্চর্য ব্যথায় তাই শুয়ে আছে বিষণ্ণ বিকেলে।

কঙ্কাবতী! অপরূপ রূপকাহিনীর নদীপারে
একাকী বিস্মৃত মেয়ে বহুদিন ব'সে থেকে-থেকে
হাসি ও কান্নার পান্না কুড়িয়ে, ছড়িয়ে, স্নান সেরে
যারা এলো, যারা গেলো, তাদের হৃদয় দেখে-দেখে
বুড়ি হ'লো। তারপর সময়ের হাতছানি শুনে
স্মৃতির ধূসর থেকে চ'লে গেল অন্য কোনোখানে।

নির্জন স্বাক্ষর

মৃণালকান্তি

১

যৌবন ছড়ায় রাঙা ফুলের আগুন
বর্ণময় দীপ্তি তার,
অনির্বাণ দহন দ্বিগুণ।

২

কী নিস্তব্ধ রাত
পুবের আকাশে জ্বলে শীর্ণ পাণ্ডু চাঁদ,
শালবন
ধূ-ধূ মাঠ ঘুমে অচেতন।
অগম পথের পাশে
নিশীথে বিরলে,
একা একা চলে মন
চিন্ময় চিন্তার জাল ফেলে।

৩

উদাসীন ফুল রয়
শূন্য নীলে চেয়ে—
একা বনময়
পথিক বাতাস বৃথা
ফেরে গান গেয়ে।

৪

মেঘের শিবিরে সূর্য-সেনানী
দীপ্ত বর্শা ছোঁড়ে,

রাঙা সন্ধ্যার স্বপ্ন মিলায়
ধূসর দিগন্তরে—
একটি দিনের মোছে ইতিহাস
মৃত্যুর স্বাক্ষরে।

৫

নিরিবিলি শব্দ ঝরে শুকনো পাতার,
ঐখানে অন্ধকারে ছায়া দোলে কার?
কী নিঝুম পথ ঘাট, কার কথা শুনি।
শিহরায় গাছপালা, বাতাসের ধ্বনি।
ঝিকিমিকি জোনাকির লণ্ঠন হাতে,
শীতের ধূসর মূর্তি ঘোরে মাঝ রাতে।

৬

নিরবধি ঢেউ কেটে নদীর মতন
উধাও সুদূর—হে সময়, হে জীবন!
কেন তবে ফুল ফোটে গাছের শাখায়?
মেঘে ঝরে রামধনু, পাখি গান গায়?
রৌদ্রের দুপুরে মাঠে ওড়ে প্রজাপতি?
কেন সন্ধ্যা জেলে দেয় আকাশে সেঁজুতি?

৭

কাল রাতে পাহাড়ে ঝড় হ'য়ে গেছে,
নিঃশেষে ধুয়ে গেছে সব মলিন ধূলি—
রোদের সোনায় হাসছে গাছ পাতা ঘাস।
জীবনের উপর দিয়েও ব'য়ে গেল কত ঝড়,
ঈশ্বর, কবে সে তোমারি গৌরবে ফুটে উঠবে
একটি শুভ্র পুষ্পিত শিখায়।

ডায়ালে

সরিৎ শর্মা

ডায়ালে ডালিম রোদে
ছোটো ছোটো ছুটি ছায়া ফেলে—
ডানা ছুটি মেলে
ছুটি পাখি রোদ্দুর পোহায় !
টাওয়ার ক্লকের উঁচু কঠিন কার্নিশে ব'সে ব'সে
ঠোঁটে ঠোঁট ঘ'ষে
ছুটি পাখি রোদ্দুর পোহায় !

এর ডানা ওর সাথে জড়িয়ে, ছড়িয়ে,
দীঘল কাঁটার গায়
মৃদু ঠুকরিয়ে,
পশ্চিম ডায়ালে, আহা, ওরা ছুটি রোদ্দুর পোহায় !

মসৃণ বাদামি পিঠে রোদ চমকায় !

নিচে স্ট্র্যাণ্ড, জনতার ভিড়,
ট্র্যাফিকের কোলাহল উন্মত্ত অধীর—
'স্টেশান'···'স্টেশান'—
ছায়া নামে-নামে, ভয় পায় :
কুটিকুটি হয় পাছে, হয় খান খান
এই বুঝি, তাই, নেমে-আসা স্তব্ধতায়
ধ'রে ওঠে চিড় !

ট্রেন গেছে চ'লে ;
পাথুরে ডায়াল যেন
নিভে গেছে শেষবার জলে ;
অবশেষে নিলামের দূরাগত ডাক শোনা যায় ;
কাঁটা ঘোরে পুরোনো ছায়ায় !

ছায়া দিয়ে ছায়া মুছে
পাখিরা মিলিয়ে গেছে ঘুমের বাসায়—
পুবের ডায়ালে ফিরে
সকালে নতুন ছায়া,
ডালিম রোদ্দুর আর গানের আশায় !

যাবার দিনের কবিতা

বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সকালে উঠে মনে পড়লো
যেতে হবে।
চারদিকে ছড়ানো হাজার জিনিস
টুকিটাকি ছোটো কাজ,
এটা তোলো, ওটা রাখো,
বইগুলো নিতে হবে, আর খাতাটা,
ভুলো না যেন বর্ষাতি আর ছাতাটা,
সমস্ত কিছু যার মধ্যে জড়িয়ে আমি,
যার মধ্যে ছড়ানো আমার অস্তিত্ব।

বেশ ছিলুম, যেন ঘুমের মধ্যে,
স্বপ্নের দেশে আনাগোনার মতো
চলেছে কাজ, চলেছে খেলা,
চলেছে ভিড়ের মেলা।
আজ সব গুটিয়ে নেবার পালা
যেখানে যা-কিছু হারড়ে আমার জীবন।

বাইরের এই বর্ষা যেমন
বিন্দু-বিন্দু জল দিয়ে বিন্দুসরোবর,
তৈরি করে নিয়ে নিজেকে ছড়িয়ে দেয়,
তেমনি একটু-একটু ক'রে কেমন ক'রে
আমাকে আমি ছড়িয়ে দিয়েছিলুম
তোমার মধ্যে।
সেখান থেকে কেমন ক'রে আমি
দুই হাতে জড়ো করব আমাকে?

মনে পড়ে, যাবার বেলায় সেদিন
বললুম, বলো আমাকে তোমার
সেই একটি কথা—
যে-কথা শুনে পদ্মের পাতার মতো
হৃদয় উঠবে ফুটে পাখা মেলে,
যে-কথা শুনে গানের সুরের মতো
তোমার হৃদয় আমাকে যাবে ছুঁয়ে;
শুনে অনেকক্ষণ রইলে চেয়ে,
তারপরে আমার মধ্যে
আরো নিবিড় হয়ে এসে তোমার
চোখের পাতা উঠলো কেঁপে, বললে,
'তুমি আমার।'

চারদিক থেকে দমকা হাওয়ার মতো—
বর্ষার সমুদ্রের মতো উঠলো তুফান।
এক মুহূর্তে ভেসে গেলুম তোমাকে নিয়ে
পৃথিবীর প্রথম দিনে।
সেই প্রথম দিনের শত বিস্ময়
শত সংশয় শত আশ্রয়
আবার উদ্দাম হয়ে এলো।
আবার উন্মুখ হোল তোমার আমার মন
ঘুম-ভাঙা স্বপ্নের সমুদ্রে।

একদিন মনে আছে
অনেক বসন্তের গান আর অনেক বর্ষার জোয়ার
স্তব্ধ হয়ে এসেছিল যখন এমনি করে

তোমাকে তুমি তুলে ধরেছিলে আমার দিকে,
আমাকে আমি ছড়িয়ে দিয়েছিলুম তোমার মধ্যে।
একটু, একটু, একটু ক'রে
আমি হয়ে উঠেছিলুম,
আমি জেগে উঠেছিলুম,
ঘুম ভাঙানোর সেই রঙিন রাগিণীতে
জাগিয়েছিলুম তোমাকেও।
তুমি হয়ত সেদিন জানোনি
আমারি জাগরণী সুরে তোমাকে ডেকে ডেকে
তবু আমি তোমারি হয়েছিলুম।
কিন্তু সে-কথা এমন ক'রে তো জানতে পারিনি,
এমন ক'রে তো মনে ভাবিনি যে তুমি আমার।
আমি তোমার, তাই শুধু ভেবে নিয়ে
সুরু হয়েছিল তোমাকে আমার ক'রে নেবার পালা।

আজ যাবার বেলায়
অনেক দূরের দেশ থেকে
অনেক দূরের সুরের রেশ দুয়ারে দিল হানা।
জানি না, কোন কাজের সাড়া দেব আমি
কার ডাকের ইঙ্গিতে।
ডেস্কের চাবি খুলতে গিয়ে হয়ত মনে হয়
কোথায় আমার মনের চাবি?
এমন জোর ক'রে কে কেড়ে নিল তাকে?
কেমন ক'রে সে হয়ে উঠেছিল আমারি মধ্যে
ফুলের বুকে ফলের সম্ভাবনার মতো?
আমার যে-হৃদয় ফুল হয়ে ফুটেছিল

তাকে এমন নিজের ক'রে নিয়ে
নিজের মতো জোর কে দিল তোমায়?

আমি?·········আমার কোন ইতিহাস
জানি না কবে লেখা হবে কোন কালের পাতায়।
শুধু জানি, পৃথিবীর ইতিহাসকে জেনে নিয়েছিলুম
তোমার চোখের পাতায়-পাতায়।

আজ সেই চোখের জ্যোতি
আমাকে এগিয়ে দেয়, আমাকে মাতিয়ে দেয়,
বার বার ভুলিয়ে দেয় প্রত্যহের আনাগোনা।
স্তব্ধ হয়ে মন তোমার চোখে
হৃদয়ের সমস্ত সঞ্চয় রেখে দিয়ে
ইটকাঠ-ঘেরা জীবনের অবিশ্রান্ত আবর্তনে
যখন টেনে নিয়ে যাবার লগ্ন আসে
তখনো বার বার ঘুরে-ঘুরে
ঐ একটি কথাই আমাকে জাগিয়ে রাখে :
তুমি আমার, তুমি আমার।

রাজা

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

মদমত্ত রাজা আজ ম্রিয়মাণ। সহসা উৎসব
স্তব্ধ হ'লো প্রেক্ষাগৃহে, শতাব্দীর যুগসন্ধ্যাকালে
রক্তহীন ঐশ্বর্যের শেষ চিতা নীলাকাশ জ্বালে,
রাজার মোতির মালা স্বর্ণহার ছিন্নভিন্ন সব!
পলাতক পারিষদ, চাটুকার আতঙ্কে ফেরার,
প্রদীপের আলো নেভে, নর্তকীর আশ্লেষ অসার,
প'ড়ে থাকে পানপাত্র, 'স্বাদ নেই আতপ্ত সুরার,
মণিময় কক্ষদ্বার শূন্য ঘর স্তব্ধ নিরুচ্চার।

বাহিরের পৃথিবীতে পিপাসার তীব্র অন্তর্জ্বালা
অগ্নি ঢালে চোখে-চোখে, শিহরিয়া ওঠে শুষ্ক মূল;
অন্ধকারে দূর নীলে বহ্নিমান মশালের মালা,
শর্বরীর ভাঙে ঘুম রক্তবর্ণ প্রাণের শিমুল।
ঘুম নেই, শ্রান্তদেহ,—রাজা এসে জানালায় বসে;
অতর্কিত হাওয়া এসে তাড়া করে প্রচণ্ড আক্রোশে॥

ভোগবতী

আনন্দ বাগচী

পাণ্ডুর জ্যোৎস্নার খিল দরজায় কান্নাক্লান্ত হাতে
তুলে দিয়ে, দেয়ালের রংছুট দৃশ্যের নিচে
শিথিল প্রণাম সেরে বিছানায় শূন্য শেষ রাতে
যে-মেয়েটা শুতে গেল, সমাজ সংসার তার মিছে।

রাত্রিশুল্ক শরীরের বিজ্ঞাপন শেষ করে মেয়ে;
প্রসাধন ধুয়ে যায়, বর্ণরাগ, ওষ্ঠের রাঙিমা
মৃতহাসি, মদিরাক্ষী, কান্নার শিশিরে নেয়ে-নেয়ে
স্নিগ্ধ হলো অবশেষে উগ্ররেখাচিত্রের তণিমা'।

রাত্রির ভগ্নাংশগুলো এইভাবে তার জমা হয়
ভাঙা বোতলের পাশে, বাসি ফুলে, মথিত শয্যায়
প্রকাণ্ড আর্শির নিচে, আপনাতে একান্ত নির্ভয়:
তবলার হরবোলে, চোরা ঘুঙুরের তীক্ষ্ণতায়
অনাহত; হরিণীর মত যেন হ্রদের নির্জন
তৃণ-তটে রেখে তার অকপট হৃদয়ের ঘুম
শরীর নিঝুম, তার জীবনের চতুরঙ্গ-কোণ
ছায়াচারী, সকলের পরে আজ ঘুমের কুঙ্কুম।

ঘুমের গভীর ভাঁজে তার শরীরের রেখাগুলো
যেন কী আরক-রসে রাখা থাকে, সহস্র বছর
আগেকার অনায়াস অবিকৃত, সময়ের ধুলো—
যে-মমির নারী-মুখে জমেনি, রাত্রির বালিঝড়
ব্যর্থ হয়ে গেছে যার বাসি মুখে, ঠিক তার মত
এ-রজনীগন্ধা-নারী শুয়ে আছে, শরীরের ছায়া
জ্যোৎস্নার মত তার শয্যায় ছড়িয়ে অক্ষত,
সে আজ নিজের তাই ঘুমের এ-দেহাতীত মায়া।

চলতি কালের ফরাসী কবিতা

লোকনাথ ভট্টাচার্য

বোদলেয়ার অনেক দুঃখে ব'লেছিলেন, ফ্রান্স কবিতার দেশ নয়, সত্যিকারের কবিতার প্রতি তার একটি বিজাতীয় আতঙ্ক আছে, এখানে হ্য মুস্সে ও সেই গোত্রীয় স্থলিত পদ্য-লিখিয়েদেরই জয়জয়কার। সত্যিকারের কবিতা কী, সে তো যুগযুগান্তরের প্রশ্ন এবং এমন উক্তির পেছনে যাই থাক, তাঁর কঠিন আত্মগ্লানি, পারিপার্শ্বিক প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার অবিরাম ব্যর্থ প্রচেষ্টা, সব সত্ত্বেও সেই এক ও অদ্বিতীয় বোদলেয়ার আজ ফরাসী কাব্য-জগতে পাঠকমাত্রেরই নমস্য। বোদলেয়ার যে-যুগে বেঁচেছিলেন, তার পরে বহু যুগ কেটে গেছে, শতাব্দী পেরিয়ে গেছে, পরিবর্তনের স্রোতে আদর্শ ও ধারণার রূপ এত বদলে গেছে যে তাকে আর চেনবার উপায় নেই—তবু আজ মেট্রোয় যেতে-যেতে কখনো কোনো সুন্দরী তরুণীকে দেখি, হয়তো যাবে দশ-বারোটা স্টেশন, মিনিট পনেরর পথ, হাতে তার বোদলেয়ারের তিক্ত মন্দ দিনের কুপুষ্প-চয়ন। পড়ছে সে: প্রকৃতি এমন এক মন্দির যার জীবন্ত থিলান হ'তে কখনো-কখনো অদ্ভুত সব ধ্বনি বেরোতে থাকে, চিন্ময় কোনো অরণ্যের মধ্যে দিয়ে যেতে-যেতে মানুষ যখন তাকে অতিক্রম করে, তারা পরস্পর পরিচিত সস্নেহ দৃষ্টিতে তাকায়।

চলতি কালের স্বয়ংসম্পূর্ণ কোনো অস্তিত্ব নেই, পিছনের পটভূমিকায় তাকে না ফেললে তার স্বরূপ বোধগম্য হবে না। বলা বাহুল্য, ফরাসী কবিতা বলতে একেবারে অনন্য অথবা অদ্ভুত একটা কিছু নিশ্চয়ই বোঝায় না। দেশ-কাল-পাত্রে যেমন ভেদ আছে, অভেদও আছে। একই সেই অনুভূতি, আবেগ, আত্মপ্রকাশের বাসনা সর্বত্রই ধ্বনিত। তবু কেমন যেন একটু একটু অন্যরকম। যেমন এখানকার এই ঘর-বাড়ি, নিসর্গ-শোভা, লোকেদের চোখ-মুখ-চেহারা, আমাদের সঙ্গে এ সবের খুব একটা আকাশ-পাতাল পার্থক্য নেই, তবু পার্থক্য আছে। ফ্রাঁসোয়া ভিলঁ-র সেই বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব, লিরিকের জগতে এখানকার সেই প্রথম বসন্ত ঋতু, তারপর আরম্ভ হ'ল মিছিল একের

পর এক, রেনেসাঁস-এর যুগ, অপূর্ব অশ্রুত সব উজ্জ্বল মুখচ্ছবি, তারপর এলেন ক্লাসিকরা, কর্নেই, রাসিন এবং আরো অনেকে, আবার লিরিকের যুগ, রোমান্টিকদের আত্ম-বিক্ষোভ, পরে এলেন পারনাস ও সিম্বলিস্টরা। এবং এই সিম্বলিষ্টদের থেকেই আজকের ফরাসী কবিতার আরম্ভ।

রীতির দেশ, কলাকৌশলের দেশ ফ্রান্স। দৃষ্টির জগতে কারুশিল্পের যেমন চমৎকারিত্ব এইখানে, অন্তরের জগতেও নতুন-নতুন ধারা, বাঁচবার, ভাববার নিত্য নতুন পদ্ধতি এরা আবিষ্কার করেছে ও করেই চলেছে। যেমন এদের বাগানের গাছ-কাটা, বসন্তে-বসন্তে হরেক রকম পরিচ্ছদের উদ্ভাবন, তেমনি শিল্প ও সাহিত্যের এলাকায় নিত্য নতুন দর্শন, নতুন-নতুন আঙ্গিকের অবিরাম মহড়া। তাই এই সব পারনাস, সিম্বলিষ্ট, ইম্প্রেশনিষ্ট, দাদা-ইষ্ট, স্যুর্‌রেয়ালিষ্ট, কতরকম শব্দই না এখানে শুনতে পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে একটি কথা স্মরণীয়, চিত্রকলার সঙ্গে সাহিত্যের সম্বন্ধ এখানে যত ঘনিষ্ট, আমাদের দেশে ততটা নয়। একদলের যাত্রী-আলো অন্য দলের পথের অন্ধকার দূর করেছে। বিশেষত চিত্রকলা সম্বন্ধে এখানকার সাধারণ লোকও এতটা বেশি সজাগ যে তাই দেখে আমরা শুধু বিস্মিতই হ'তে পারি। এই শিল্প-সচেতনতার প্রমাণ মেলে এখানকার অন্তহীন আর্ট গ্যালারিতে, প্রতি সপ্তাহের সংখ্যাহীন ছোট-বড়-মাঝারি প্রদর্শনীতে। কাফেতে যাওয়া, থিয়েটার দেখা, অতি তুচ্ছ লোকের পক্ষেও সৌন্দর্যজগতের অন্তত একটু-আধটু খবরাখবর রাখা এখানকার জীবনের অঙ্গ। যে-প্রদর্শনী যেমনই হোক, কোনো নাটক, ব্যালে অথবা অপেরা যত সাধারণই হোক, সময় মতো শ্রোতা ও দর্শক ঠিক জুটে যায়—ভিড় সবখানে। তাই বোদলেয়ারের জীবনে শুধু এড্‌গার পো-ই নয়, দ্যলাক্রোয়ার প্রীতিও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আজকের দিনেও দেখি শুধু মায়াকোস্কিই নয়, পিকাসো-ও আরাগঁ-এলুয়ারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং একজন আর একজনের দ্বারা প্রভাবান্বিত। কিন্তু সে কথা পরে হবে।

একেবারে আত্মকেন্দ্রিক চেতনা, অকারণ মানসিক বিক্ষোভ-জনিত অনুভূতি ও আবেগ, ছায়াবাজি, এসব হ'তে রেহাই পাওয়ার একটা দুর্দম

বাসনা সিম্বলিস্টদের অনেককেই আকুল ক'রে তুলেছিল। এমন কি বোদলেয়ারও একবার উন্মত্তের মত চেঁচিয়ে উঠেছিলেন : অতএব এই সব কুহকিনী ছায়া, রনে, ত্যবের্মান ও হ্বার্থার, তোমরা ছিটকে পড় ; শূন্যের ধোঁয়ায় মিশে যাক তোমাদের আলস্য ও নিঃসঙ্গতার দানবীয় সৃষ্টি সব ; জেনেজারেথের হ্রদের মধ্যে শূকরদের মত তোমাদের মুগ্ধ অরণ্যের ছায়ায় তোমরা নিজেদের বিছিয়ে দাও যেখান হ'তে বেরিয়েছে তোমাদের এইসব স্বকপোল-কল্পিত অরির দল, রোমাণ্টিক চেতনায় আক্রান্ত পাল-পাল ভেড়া—সময়ের বিচার তোমাদের স্থান দেবে না আমাদের মধ্যে, কাব্যের নিয়তি বড় কঠিন, মনে রেখো ! মালার্মেও অবিশ্রান্ত ভাবে খুঁজে গিয়েছেন এমন একটি অর্থ, যা অব্যর্থ, যা মানুষকে ঐশী চেতনার দৃঢ় প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে, যাতে মানুষ ভুল আবেগ ও সুযোগের পথে স্বেচ্ছাচারী হবে না, তাকে বশ করতে পারবে। মানুষ অর্থে এখানে কবি, বলা বাহুল্য। ভালেরিতেও ঐ একই ধারার পরিণতি। ভালেরি ছিলেন মালার্মের বন্ধু এবং তাঁরি পথের পথিক। লেখাকে ঐশী চেতনার মত দৃঢ় ও উজ্জ্বল ক'রে তোলা ছিল মালার্মের স্বপ্ন। ভালেরিও বারবার এই কথা ব'লে গেছেন, লেখাটা বড় কথা নয়, কী ভাবে লিখলাম, সেটাই বিবেচ্য—তার প্রতিচ্ছবি ও পরিণতি যেন আমাদের নতুন ক'রে নির্মাণ করতে পারে, সমৃদ্ধ করতে পারে। এঁদের বক্তব্য বড় অস্পষ্ট—তবে সৌভাগ্যের কথা, এত জীবন-দর্শনের ঘোর-প্যাঁচেও তাঁদের কাব্য সব সময় ভারাক্রান্ত হয়নি এবং সেইখানেই তাঁরা সাবলীল হয়েছেন, এবং এক কথায়, কবি হয়েছেন। ছায়াবাজির থেকে রেহাই পেতে চেয়ে আবেগ ও অনুপ্রেরণাকে এঁরা এমন ভাবে বশ করতে চেয়েছিলেন যাতে কবিতা লেখা রীতিমত ব্যায়ামের পর্যায়ে প'ড়ে যায়। লজিককে প্রাধান্য দিতে-দিতে ভালেরির পরিণতি অঙ্ক-প্রীতিতে, লেওনার্দোর প্রতি শ্রদ্ধায়। এত সত্ত্বেও, এই জীবন-দর্শন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ লোকও তাঁর কবিতা প'ড়ে মুগ্ধ হবে এবং সত্যি কথা বলতে কি, ভালেরিকে ঐতিহ্য-অনুসরণকারী কবি হিসেবে অনায়াসে চালিয়ে দেওয়া যায়। অবশ্য ঐতিহ্য-পন্থীদের সাম্প্রতিক সৌরজগতে ভালেরি যদি সূর্য হন, উল্লেখযোগ্য কয়েকজন 'গ্রহেরও তবে নাম করতে হয়।

যেমন—শার্ল্ মোর্‌রা, ফ্রাঁসোয়া-পল আলিবের, রেমঁ শোয়াব, ভ্যাসঁা মুসেই্‌ঈ, রজের আলার, জাঁ পেলর‍্যাঁ ও ত্রিস্তঁা ড্যরেম্।

এতো গেল একটু পরের কথা। আগে রইলেন সিম্বলিস্টরা। কাব্য-জগতের গড্ডলিকাস্রোতে মোড় ফেরালেন তাঁরাই—ভাষার মুক্তি দিলেন, বাণী আনলেন, কত বিচিত্র ছবি, বিচিত্রতর অনুভূতির রাজ্য খুলে দিলেন পাঠকের চোখে। তবে বর্তমান কালটা স্বভাবতই বড় নিষ্ঠুর, অবুঝ, বধির। স্বীকৃতি প্রায় কেউই পাননি। তাঁদের প্রতিভা বুঝতে পৃথিবী সময় নিয়েছে, অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সংঘাত অতিক্রম করেছে শুধু প্রাণপণ বিশ্বাসের জোরে—এবং সে-বিশ্বাস ব্যর্থ যায়নি। আজ তাই র‍্যাঁবোকে নিয়ে কাহিনীর অন্ত নেই, তাঁকে দেবশিশু ব'লে সেই উনিশ বছরের কীর্তির অলৌকিকতাকে লোকে অনেকখানি সহজ ক'রে নিয়েছে। বাস্তবিক, যারা বোদলেয়ারকেই গ্রহণ করতে চায়নি, আইন ক'রে তাঁর বই নিষিদ্ধ ক'রে দিয়েছিল, তারা যে র‍্যাঁবোর মত লাগাম-ছেঁড়া এক ক্ষ্যাপাকে সহজে স্বীকার করবে না, এতে আর আশ্চর্য কী ! কোথায় যেন পড়েছিলাম মনে নেই, বোদলেয়ারকে শুদ্ধ মদের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, আর র‍্যাঁবো হচ্ছেন এ্যালকোহল। র‍্যাঁবো এত তীক্ষ্ণ, এত তীব্র যে আজও তিনি সকলের জন্যে নন। সবাইকার ধাতে র‍্যাঁবোর কবিতা সয় না। যাই হোক, সিম্বলিস্টরা কাব্যকে মুক্তি দিলেন, এক অর্থে তার নতুন জন্ম দিলেন। উনিশ শতকের শেষ দিকেই জেরার দ্য নের্ভালকে বলতে শুনি যে তাঁর কবিতায় তিনি শুধু স্বপ্ন সঞ্চয় ক'রে যাচ্ছেন, তাতে এতটুকু লজিক নেই। এ-কথা গর্বের সঙ্গে তিনি বলেননি, এ তাঁর খেদোক্তি। তার কিছু পরে র‍্যাঁবোও বলতে বাধ্য হয়েছিলেন যে কবির চোখ-কান খুলে রাখার দরকার আছে, যথার্থ দার্শনিক না-হ'য়ে তার উপায় নেই—এই অন্ধকার ও আবেগের পথে শুধু মৃত্যু চয়ন ক'রে কী হবে ? নিজের ব্যক্তিত্ব দিয়ে আশপাশের জগতকে চিনতে হবে ও তাকে সেইভাবেই প্রকাশ করতে হবে। তাঁর এক বিখ্যাত চিঠিতে (১৫ই মে, ১৮৭১) র‍্যাঁবো চেঁচিয়ে উঠেছিলেন এই বলে : এই একঘেয়ে আমির কথা থাক—আমি একটা অন্য জিনিষ। আশ্চর্য, ঠিক একই সময়ে অজান্তে লোত্রেয়াম-ও লিখছেন

তাঁর কাব্য ও মালদোররের গীতি। তাঁর লেখায় আশ্চর্যভাবে একটি সচেতন মনোযোগের ক্রিয়া রূপায়িত হ'য়ে উঠছে, স্বপ্নের মত হ'লেও বাস্তবের কেমন যেন এক অনির্দেশ্য সম্বন্ধ সর্বত্র বিক্ষিপ্ত রয়েছে—যা বলছেন, তা যদিও স্বাভাবিক তৎপরতার সঙ্গেই তাঁর হাত দিয়ে বেরোচ্ছে, তবু বক্তব্য ও বলবার ভঙ্গীর মধ্যে এমন একটি সংযম লুক্কায়িত রয়েছে যেটা কিছু কম স্বাভাবিক নয়। অন্য এক জায়গায় তিনি নিজেই বলেছেন, কাব্যের যখন বিচার করতে বসবে, তার ভার কাব্যের চেয়েও অনেক বেশি হওয়া উচিত—কারণ তখন তা তো শুধু কাব্য নয়, সে যে দর্শনও; কবিরা দার্শনিকদেরও মাথার ওপর চড়তে পারেন, কবি মাত্রেই ভাবুক। চলতি কালের কাব্যের এই গেল পটভূমিকা। তবে বুদ্ধির পথে যাত্রা করা মানেই সহজ হবার সাধনা নয়, এ শুধু স্বপ্ন, কুহক ও আবেগ থেকে মুক্তি পাবার একটা প্রবল বাসনা মাত্র। তাকে কেন্দ্র ক'রে অনেক আঙ্গিকেরও সৃষ্টি হয়েছে। তবে এই সাধনায় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা যা ঘটল তা হচ্ছে বস্তুময়তা তথা বর্তমান মানবধর্মিতার বীজ তাতে নিহিত হ'য়ে গেল।

এর পরে আসছেন দাদা ও সুর্রেয়ালিস্টরা। ১৯১৮ সাল থেকেই যুদ্ধোত্তর শিল্পজীবীর মন এই ক্রমোন্নত বুদ্ধির চমৎকারিত্ব প্রদর্শনে একটু গা আলগা করেছিল। এদের মধ্যে থেকে ধীরে-ধীরে একটি দলের অভ্যুদয় ঘটল যারা নিজেদের দাদা ব'লে পরিচিত করল এবং যাদের মুখ্য বক্তব্য হল ধ্বংসকারী শক্তির বিনাশ-সাধন। এই দলে যে-সব কবি ও ভাবুক ছিলেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন আঁদ্রে-ব্রেতঁ, জঁা পোলঁা, পিকাবিয়া, জাক ভাশে, মার্সেল দুশাঁ, রিবমঁ—দ্যস্‌সেইন, ত্রিস্তঁা জারা ও পিয়ের রভের্দি। এঁদের বক্তব্য বিষয় অনেক কিছুই ছিল, তবে সবই এত ধোঁয়াটে ও ঘোলাটে রঙের যে বহুক্ষেত্রেই তার অর্থউদ্ধার পাঠকের পক্ষে তো দূরের কথা, স্বয়ং কবির পক্ষেও হয়তো সম্ভব নয়। ত্রিস্তঁা জারার লেখার একটু নমুনা দিই। ইনি রীতিমতো একজন বিখ্যাত কবি, বাংলাদেশেই এঁর নাম শুনে এসেছিলাম। তবু কাব্য এঁর কেউই পড়ে না আজকাল, অন্তত ফ্রান্সে

তো নয়ই। এমন কি এখানকার জাতীয় গ্রন্থাগারে এঁর একটি মাত্র বই আছে। জারা বলছেন,

রোজ জাগে এক নতুন আবেগ জাগে
যখন অন্য কত অগণ্য ম'রে প'ড়ে গেল অতীতে
ভাসে কোন্ দূরে ক্ষুদে শিকারীর হাসি
আহত চরণে চলা কার হ'ল সহসা বিড়ম্বিত
লজ্জায় মরে তিক্ত বান্ধবী

পড়ার পরে মনে হয় এর সঙ্গে 'তেঁতুল-বটের কোলে দক্ষিণে যাও চ'লে, ঈশান কোণে ঈশানী ব'লে দিলাম নিশানী'র কোনো প্রভেদ নেই। পাঠকের প্রতি কোনো রকমের দায়িত্বই এই সব কবি অনুভব করেন না। জারা পরে বলছেন,

যে-জীবন তবু গাঁজিয়ে উঠেছে আমাদের এই মনে
ভীষণের সনে কোমল সুতোয় গ্রথিত
তোমাকেও দেখে হাসবে অশ্বারোহী
নির্ভয় তুমি চিনবে একদা অসম্মানের সার
বিশুদ্ধ রসে তোমার শক্তি হারানো

কিন্তু এইভাবে কাব্য বেশিদিন চলতে পারে না, তাই ১৯২৪ সালের মধ্যেই দাদা-ইজম ভেঙে আরো অনেক নতুন 'ইজমে'র উৎপত্তি হ'ল। তাদের মধ্যে যা সবচেয়ে প্রবল এবং ভবিষ্যতের কাব্যকে যা সবচেয়ে বেশি প্রভাবান্বিত করেছে, তা হচ্ছে সুর্রেয়ালিজম। আঁদ্রে ব্রেতঁ অবিসংবাদিত ভাবে এই যজ্ঞের প্রধান হোতা। সুর্রেয়ালিজম শব্দটি প্রথম উচ্চারণ করেন গীইওম আপোলিনেয়ার তাঁর নাটক 'তিরেজিয়ার স্তনে'র প্রসঙ্গে। কিন্তু ব্রেতঁ শব্দটিকে ব্যবহার করেন সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে। আপোলিনেয়ারের কাছে সুর্রেয়ালিজম ছিল আত্মার সংস্পর্শে বাস্তবের এক ঘনীভূত সমৃদ্ধি—চাকার প্রসঙ্গে তাই উরুর সুর্রেয়ালিষ্ট ব্যাখ্যা তাঁর মনে এসেছিল। সুর্রেয়ালিজম বলতে আঁদ্রে ব্রেতঁ বুঝেছিলেন শুদ্ধ মনের এমন একটি স্বাভাবিক ক্ষমতা য়ার দ্বারা মানুষ বাক্যে হোক, লেখায় হোক অথবা যে কোনো চিন্তা-পদ্ধতিতে হোক, নিজেকে যথার্থ ভাবে প্রকাশ করতে চায়। তিনি নিজেই বলেছেন,

যদিও স্বপ্ন ও বাস্তব আপাতদৃষ্টিতে দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থা, তবু আমি বিশ্বাস করি তাদের অনিবার্য সংমিশ্রণে, যার ফলে বাস্তব বা রিয়্যাল হ'তে পারবে স্যুর্‌রিয়াল।

ব্রেতঁ এবং আপোলিনেয়ারের কবিতাতেই তাঁদের এই নতুন জীবন-দর্শনের সুস্পষ্ট স্বাক্ষর। আপোলিনেয়ার এক জায়গায় বলছেন,

আমরা আমাদের দিতে চাই অভিনব এক বিপুল ব্যাপ্তি
ফুলের অর্থ যেখানে ফুলকে অতিক্রম ক'রে
তার কাছে ধরা দেবে যে তাকে খুঁজে পায়
কত যে রঙ অশ্রুত অপূর্ব আগুনে দেখেছি
স্বপ্নময় কত যে অলীক
যাদের শুধু বাস্তবের জীয়ন-কাঠি দিয়ে একবার ছুঁইয়ে দিতে হবে

আঁদ্রে ব্রেতঁর লেখায় দৈনন্দিন ও অতিপরিচিতকে কেন্দ্র ক'রে একটি অনির্বচনীয় বেদনার প্রকাশ। তিনি বলছেন, মুখের ওপর এমন একটি আচ্ছাদন ফেলে দাও যাতে দেখতে পাবে আরো ভালো। আরেক জায়গায় বলছেন, নিসর্গ-শোভার সর্বত্রই যে পর্দার পর পর্দা ফেলা রয়েছে—আমরা প্রতীক্ষা করছি তার একটির পর একটির উন্মোচন। এবং ফাতা মরগানার মধ্যে :

বলো তো আমাকে
যাত্রার পথে কী ক'রে রক্ষা করা যায় সেই কষ্টকর মানসিক সাম্য
যা মানুষ খুশীমত ধ'রে রাখতে পারে না
সেই গভীর অন্তরাল গাছপালায় আচ্ছন্ন
অন্য সকলের থেকে যে পৃথক অদ্ভুত অদৃশ্য ভাবে
আমরা একদিন তাকে জীবনের যথার্থ কোণটিতে
আবিষ্কার করব ব'লেই তো সে রয়েছে

স্যুর্‌রেয়ালিষ্ট আন্দোলনে যাঁরা সাড়া দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে প্রধান হচ্ছেন লুই আরাগঁ, আর্তো, আঁদ্রে ব্রেতঁ, রনে ক্রভেল, রবের দেনো, পল এলুয়ার, লঁ্যাবুর, নাভিঈ, পেরে, স্যুপো, ত্রিস্তঁা জারা ও ভিত্রাক। ১৯৩২ সালে আরাগঁ স্যুর্‌রেয়ালিস্টদের ত্যাগ ক'রে কম্যুনিস্ট-পন্থী হন

এবং তখন থেকে তিনি এমন কিছুই লেখেননি যা মার্ক্সীয় দর্শনের আলোকে আলোকিত নয়। এলুয়ারও কিছুদিন পরে আরাগঁকে অনুসরণ করেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, প্রগতিশীল বিপ্লবাত্মক লেখক ও শিল্পীদের একটি সংঘ ধীরে-ধীরে গঠিত হয় ভাইয়ঁা-কুতুরিয়ের-এর পরিচালনায়। কিন্তু এ-সব কথা পরে আসছে।

স্যুর্‌রেয়ালিস্টদের যুগে, যখন সোবিয়েৎ রাশিয়ার বিপ্লব সারা জগতের চোখের সামনে আশা, আনন্দ ও বিস্ময়ের জ্যোতি তুলে ধরেছিল, তখন স্যুর্‌রেয়ালিস্টরা জান্তে হোক, অজান্তে হোক, এই বিপ্লবের প্রতি তাঁদের সমস্ত সহানুভূতি দেখিয়েছেন, কখনো লেখার মধ্যে দিয়ে, কখনো সোজাসুজি সুপরিস্ফুট আচরণের মধ্যে দিয়ে। এমনি ক'রেই যা ছিল প্রথমে সিম্বলিস্ট বা স্বপ্নের আধার, ধীরে-ধীরে তার রূপান্তর ঘটল স্যুর্‌রিয়াল বা স্বপ্ন-মিশ্রিত বাস্তবে, শেষে তার পরিণতি হ'ল আজকের রিয়্যাল বা পুরোপুরি বাস্তবে। কিন্তু এই পরিণতি যে সকলেই সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ ক'রেছে, এমন নয়—অনেকে ছিটকে বেরিয়ে পড়েছে। তাদের কথা আগে বলি।

মাক্স্ জাকব এবং জঁা কক্তো কিম্ভূতকিমাকারের উপাসক—যার কোনো অস্তিত্ব নেই, যা একেবারে কল্পনা-প্রসূত, সেই রূপকথার রাজ্য নিয়ে এঁদের কারবার। এবং ফ্রান্সের আজ এমনি ভাগ্য যে অনেক লোকের মতে জঁা কক্তোই নাকি সবচেয়ে প্রিয় কবি বর্তমানের। কক্তোর লেখার মধ্যে দিয়েই তাঁর এই অদ্ভুত মনের পরিচয় দেওয়া ভালো। বলছেন,

একলাই থাকব বেশ আমার এই চাহনি নিয়ে
এই কাগজপত্তর যন্ত্রপাতি
আর আমার পাগলামি নিয়ে

এবং আরেক জায়গায়,

চোখ আধো-বোঁজা
একটি মাত্র দাঁত উঁকি মারছে
হাসির তীর থেকে
শীত-শীত করে
কী এক মোহে ঘুমিয়ে আছি বহুকাল

কিন্তু এই মোহে ঘুমিয়ে থাকার গ্লানি তো আছে—জীবনে বিশ্বাস না থাকলে বাঁচা যায় না। এঁরা তাই সহজ ক্যাথলিসিজমের পথ বেছে নিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে শার্ল পেগি আর পল ক্লোদেল এর নাম উল্লেখযোগ্য। ক্লোদেল বলছেন,

> তুমিই ধন্য হে ঈশ্বর, আমাকে রক্ষা করেছ
> পৌত্তলিকতা থেকে, তোমারি কৃপায়
> আজ তুমি ছাড়া কাউকেই আমি বন্দনা করি না—
> আইসিস অথবা ওসিরিস, ন্যায়, প্রগতি, সত্য,
> দৈব, মনুষ্যত্ব, প্রকৃতির নিয়ম, আর্ট, সৌন্দর্য,
> কিছুরি অস্তিত্ব আমার কাছে নেই।

পেগি বলছেন শার্ত্রের নোৎর দামের প্রসঙ্গে,

> এই প্রান্তরের তীরে, সুন্দরী লোয়ারের এই বাঁকটিতে
> আমাদের জন্ম হ'ল তোমারি জন্যে,
> এবং এই যে বালুর নদী, এই মহিমার নদী,
> এ শুধু তোমার ভাবসৌম্য বদনটিকে চুম্বন ক'রেই ব'য়ে চলেছে।

প্রতিবছর মে-মাসে এখানে পাঁতকোতের (pentecoste) সময় হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী পারীর নোৎর দাম থেকে শার্ত্রের অভিমুখে পায়ে হেঁটে রওনা হয়। এই তীর্থ-যাত্রার উদ্বোধন করেন শার্ল পেগি—তাঁর যে-কবিতাটি উদ্ধৃত করলাম, সেটি এই যাত্রা নিয়ে লেখা। তবু যা আশ্চর্য, প্রতি-বছর এই তীর্থ-যাত্রী যুবক-যুবতীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। সনাতনপন্থী পরিবারে ধর্মগত একটা ঐতিহ্য আছেই এবং এদেশে বিশেষ ক'রে সেই সব ক্ষেত্রে ধর্মের প্রকোপটা অসাধারণ বেশি কারণ ধর্ম যে এদের ডিক্টেটার, সে কোনো 'অথবা'র ধার ধারে না। কিন্তু সেই পরিবারগত ধর্মের কথা নয়, দুটি যুদ্ধে মানুষের বিশ্বাস-আশা-ভরসা-আকাঙ্ক্ষা সমস্ত ধূলিসাৎ হ'য়ে গেছে। বিশেষত ফ্রান্সে এবং ইউরোপের আরো কয়েকটি দেশে অবস্থাটা সত্যিই ভয়াবহ। শিক্ষিত তরুণ মন, যারা সহজে শান্তি পেতে চায়, একটা বিশ্বাস আঁকড়ে ধ'রে কোনোরকমে বেঁচে যেতে চায়, তাদের পক্ষে খ্রীষ্টবাদী হওয়াই নান্যেব পন্থা। সোর্বনের দেয়ালে-দেয়ালে একদিকে যেমন

রাজনৈতিক দলের পোস্টার, সভা-সমিতি-আন্দোলনের কথা, অন্যদিকে এবং একই সঙ্গে তেমনি বড়-বড় অক্ষরে লেখা—যীশু খ্রীষ্টই আমাদের একমাত্র আশা।

সাম্প্রতিক কাব্য-জগতে আরো একদল আছেন যাঁদের সেন্টিমেন্ট নিয়ে কারবার, চিরাচরিত ভাব, অনুভূতি, প্রেম, একটি তুমি, ফুল, পাখি, চাঁদ, নদীর তীর, স্নিগ্ধ হাওয়া ইত্যাদিই উপজীব্য। এঁদের মধ্যে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে যিনি সর্বপ্রধান, সব চেয়ে সুললিত ও গীতিমুখর, তিনি নিঃসন্দেহে জুল সুপেরভিয়েল্। তাঁরো লেখার একটু নমুনা দিই :

> চেয়েছিলাম একটি পপলার
> অনতিদূর নদীর তীরে,
> চেয়েছিলাম একটি নদী
> যার তীরে তোমাকে বসাব—
>
> তুমি আর তুমি, কে এই তুমি,
> কাকে নিয়ে এত কথা উদ্বেল হ'ল ?
> আধখানা উত্তরই তার জানি,
> আর আধখানা যে স্বাধীন,
> আপন খুশীতে ওঠা-নামা করে।

'প্রগতিশীল'দের বাদ দিলে মোটামুটি এই গেল চলতি কালের ফরাসী কবিতার ধারা। 'প্রগতিশীল'রা অধিকাংশই মার্ক্সপন্থী, এবং তাঁদের নিয়ে আশা করবারও যথেষ্ট কারণ আছে। অবশ্য বাড়াবাড়ি সর্বত্রই আছে, এখানেও তার ব্যতিক্রমের অভাব নেই। আগামী দিনের কবিতা কেমন হবে, তার ভাষা, রীতি, ছন্দ, ছবি, শব্দ-ভাণ্ডার, এই সব নিয়ে সময়ে-সময়ে অনেক অদ্ভুত ও হাস্যকর আলোচনা চোখে পড়ে। কবিতার প্রসঙ্গে কোনো মার্ক্সপন্থী কী বলেছেন, অথবা শব্দ-ভাণ্ডার বাড়াবার জন্যে কবিতার মধ্যে টপোগ্রাফি, ব্যারোমিটার, হেলিকপ্টর, রাডার, ডায়েলেক্টিক, এ্যাটম প্রভৃতি কথার আমদানি প্রসঙ্গ এবং এ-ধরণের আরো কত কী-যে মার্ক্সবাদী পত্রিকায় নজরে পড়ে তার ইয়ত্তা নেই। কেউ-কেউ আবার এতদূর যান

যে বলেন, র‍্যাঁবো, রাবলে, ভিক্তর উগো প্রভৃতিকে আবর্জনার মধ্যে ফেলে দেবার সময় এসেছে! (দ্রষ্টব্য—গত বছরের নভেম্বর মাসের La nouvelle critique-এ জাক দুবোয়া-র প্রবন্ধ)।

কিন্তু যথার্থ যাঁরা কবি ও খাঁটি অর্থে প্রগতিশীল, তাঁদের লেখা পড়লে শ্রদ্ধায় মাথা আপনি নুয়ে আসে। চরম দৃষ্টান্ত তার আরাগঁ এবং এলুয়ার। এই দুজনই আজকের ফরাসী কাব্যের একটা মস্ত বড় দিনের একচ্ছত্র অধিপতি। আরাগঁ কবিতা লেখেন না অনেকদিন এবং এলুয়ারের মৃত্যু ঘটেছে, তবু তাঁরা শুধু শ্রদ্ধেয় ও অহরহের আলোচ্যই নন, তাঁদের পিতা ব'লে সম্বোধন করেন এই সব জাক দুবোয়া, আলঁ্যা গের‍্যাঁ, জাঁ জুরফ্রু. জাক রুবো, তেয়ো কেরে প্রমুখ কবিরা। এবং এই দুজনের আলোচনাতেই এ-পক্ষের কবিতার সম্পূর্ণ আলোচনা সম্ভব, কারণ এঁদের বাদ দিলে তার কোনো অস্তিত্ব নেই, শুধু তার কেন, সাম্প্রতিক ফরাসী কবিতারই কোনো অস্তিত্ব নেই।

আরাগঁ অথবা এলুয়ার, এই দুজনের যে-কোনো একজনের কথা পাড়লে আরেকজনের কথা আপনা থেকেই এসে পড়বে—কারণ একজনের জীবন, চিন্তা-পদ্ধতি ও লেখা আরেকজনের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত, যদিও প্রকাশের রীতিতে একজনের সঙ্গে আরেকজনের আকাশ-পাতাল তফাৎ। দুজনেই নিজের নিজের বৈশিষ্ট্যে জাজ্বল্যমান।

এলুয়ার আশ্চর্য কবি, যত পড়া যায়, ততই মুগ্ধ হ'তে হয়। সারল্য ও আন্তরিকতা যে কতদূর যেতে পারে, তার এত বড় দৃষ্টান্ত জানি না আর কোথায় আছে। তাঁর কবিতা পড়তে বসলে কখনো অভিধান ছুঁতে হয় না, এ-যেন সেই শিশুর লেখা যে-শিশু গাছকে গাছ ব'লেই চিনেছে, এখনো বৃক্ষ বলতে শেখেনি—তবু কী গভীরতা, কী দৃঢ়তা বিশ্বাসের, আশার কী মরণজয়ী স্বাক্ষর এই শিশুতে। এলুয়ার যখন স্যুররেয়ালিস্টদের দলে ছিলেন, তখনো তাঁর সারল্য ও আন্তরিকতা সমানই ছিল। তখনকার দিনের তাঁর একটি কবিতা শোনাই,

> তোমায় বলেছি এই কথা মেঘের হ'য়ে
> সমুদ্রে নিদ্রিত গাছের হ'য়ে

> প্রতিটি ঢেউয়ের হ'য়ে বলেছি
> পাতার আড়ালের পাখির কথা
> পাথর ছড়ানো শব্দে হাতের পরিচিতিতে
> সেই চোখ যা সহসা মুখ কিংবা নিসর্গ হ'ল
> যে-নিদ্রার পরে আকাশ ফিরে পেল তার রং
> তাদের সকলের হ'য়ে বাষ্পমথিত রাত্রির হ'য়ে
> পথের বেসুরো ধ্বনি খোলা জানালা আর
> নতুন ক'রে চেনা কপোলের হ'য়ে
> তোমাকে বলেছি এই কথা তোমারি চিন্তার হ'য়ে
> বলেছি তোমারি কথা

পরে এলুয়ারের পরিণতি। একজায়গায় আরাগঁ সম্বন্ধে বলছেন, যত কবিদের আমি চিনি, তাঁদের মধ্যে আরাগঁরই যুক্তি সমস্ত দানবদের বিরুদ্ধে, এমন কি আমার নিজের বিরুদ্ধেও; তিনি আমাকে দেখিয়েছেন ঠিক পথ এবং তা' তিনি আজও তাদের সকলকেই দেখাচ্ছেন যারা কখনো বুঝতে শেখেনি যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা মানেই সুস্থ জীবন-আদর্শের জন্য লড়াই করা, যে-জীবন অন্তহীন আশায় পুষ্পিত ও প্রকৃত বিশ্বপ্রেমের দ্বারা উদ্বোধিত। এবং আরাগঁ বলছেন এলুয়ারের সম্বন্ধে, একদিন পিয়ের দুপঁকে নিয়ে লোকে পাগল হ'য়েছিল, আজকে এসেছেন এলুয়ার।

র‍্যাঁবোর সঙ্গে এলুয়ারের এত মিল, অথচ এত অমিলও! একই গীতিপ্রবণ মন, প্রকাশের রীতিও বহুজায়গায় ঠিক একই খাতে চলেছে, যদিও একজনের আমির সঙ্গে আরেকজনের আমির একটা মস্ত বড় পার্থক্য আছে—এলুয়ারের আমি সর্বজনীন। আত্মকেন্দ্রিক গ্লানির সমুদ্রে একজনের মাতাল তরণী বানচাল হ'ল, নরকে-নরকে দীর্ঘ দিন যাপন ক'রে বেড়ালেন, আরেকজন দৃঢ় বিশ্বাসের পথে, সরল মানবতার পথে সমস্ত অন্ধকারকে লাথি মেরে গেয়ে উঠলেন,

> আমার জন্ম এক বীভৎস পথের প্রান্তে
> শুধু খেয়েছি হেসেছি স্বপ্ন দেখেছি আর সঙ্গমে মরেছি

বেঁচেছি যেমন ক'রে বাঁচে অন্ধকার
তবু সূর্যের গানও গাইতে শিখেছি

এইখানেই যথার্থ এলুয়ার। এ-যেন সেই সনাতন আদাম, যার আষ্টেপৃষ্ঠে শয়তানের সাপ—তবু আজো সে অপাপবিদ্ধ, সঙ্গী সমস্ত অন্যায়-অবিচার-অত্যাচারকে ঐ লাথি মারবার জন্যেই উদ্যত। এলুয়ারের আরেকটি কবিতা দিয়ে তাঁর আলোচনা শেষ করি,

রীতির এমনি উত্তাপ মানুষের
আঙুরকে তা মদে পরিণত করে
আগুন জ্বালিয়ে তোলে কয়লা হ'তে
চুম্বন হ'তে নতুন মানুষের জন্ম দেয়

সে-রীতি এমনি কঠিন মানুষের
হাজার যুদ্ধ সত্ত্বেও হাজার
দুঃখ ও মৃত্যুভয় পেরিয়েও
নিজেকে ঠিক রাখে সে

রীতির এমনি মাধুর্য মানুষের
জলকে সে আলোতে রূপান্তরিত করে
স্বপ্নকে করে বাস্তব
শত্রুকে করে ভাই

একই সেই রীতি নতুন ও সনাতন
শিশু-হৃদয়ের তলদেশ হ'তে
চরম পরিণতির পথে নিজেকে
কেবলি পূর্ণতর ক'রে চলেছে

আরাগঁর নাম ছেলেবেলা থেকে শুনে এসেছি। তাঁর সম্বন্ধে এখানকার সাধারণ শিক্ষিত সমাজের ধারণা, এমন কি কোনো-কোনো সাহিত্যিক মহলের এইরকম মত যে তাঁর এবং এলুয়ারের মতবাদে হাজার সাদৃশ্য থাকলেও দুজনের প্রধান তফাৎ এইখানে, এলুয়ার মূলত কবি, আরাগঁ মূলত রাজনৈতিক। বাস্তবিক, আরাগঁ লেখা ছেড়েছেন বহুকাল, এখন

তাঁরই সম্পাদিত Lettres Francaise-এ মাঝে-মাঝে শুধু প্রবন্ধ লেখেন সাহিত্য-সংক্রান্ত রাজনীতি নিয়ে অথবা রাজনীতি-সংক্রান্ত সাহিত্য নিয়ে। তবু যতদিন তাঁর কবিতায় চোখ বোলানো ছেড়ে তাঁকে অনুবাদ করতে না বসেছি ততদিন বুঝতেই পারিনি কেন এই রাজ্যসুদ্ধ লোক আরাগঁকে নিয়ে পাগল, কেন এলুয়ারের মত কবি আরাগঁকে তার গুরু ব'লে স্বীকার করেছেন, কেন শিল্পাচার্য পিকাসো এলুয়ারের সঙ্গে গলা মিলিয়ে আরাগঁর স্তুতিগানে উচ্ছ্বসিত, কেনই বা আঁদ্রে জিদ হঠাৎ একদিন লিখে বসলেন, যাই বল, আরাগঁ অতুলনীয়, আরাগঁ যথার্থই প্রতিভাবান, আজ সকালে কাস্‌সুতে এই কথাই আমি বলেছি।

আরাগঁর একটি কবিতার খানিকটা অংশ উদ্ধৃত করছি। অনুবাদ যতই অসমর্থ হোক, একথা বুঝতে কারুরই কষ্ট হবে না,—যে আরাগঁর কোনো লেখা এর আগে পড়েনি, তার পক্ষেও নয়,—যে আরাগঁর কবিতার ওপর কোনো ভূমিকার প্রয়োজন হয় না। তাঁর প্রতিটি পঙ্‌ক্তিতে, প্রতিটি শব্দচয়নেও প্রতিভার স্বয়ং-সম্পূর্ণ জ্যোতি। কবিতাটি লেখা ১৯৩৯-৪০ সালে বিগত যুদ্ধের বিভীষিকার পটভূমিতে—পারী হস্তগত শত্রুর দ্বারা, কিংকর্তব্যবিমূঢ় জনগণ, প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে যথাসময়ে তবু বসন্ত, মাঠে-মাঠে লীলা আর গোলাপের ছড়াছড়ি, সেই রঙে রঙ মিলিয়ে পাশাপাশি প'ড়ে আছে শহীদের তাজা রক্ত, এদিকে অসহায় উন্মত্ত জনতা ঘামে, ভিড়ে, ঠেলাঠেলিতে, শুধু পালাবার জন্যে, বাঁচবার জন্যে ব্যস্ত।

পুষ্পাকুল হায় ঋতু পরিবর্তনের
মে-মাস নির্মেঘে গেলে জুন রক্ত-ছুরিকা-চিহ্নিত
ভুলব না কোনোদিন এই লীলা এই গোলাপেরে
ভুলব না যারা আজ বসন্তের আড়ালে আহৃত

ভুলব না কোনোদিন এই ক্রূর অকরুণ মায়া
সূর্য আর কান্না আর ভিড় আর সন্ত্রস্ত মিছিল
গাড়ীতে প্রেমের রঙ্গ বিকলাঙ্গ কিছু উপহার
বেলজিয়মের স্মৃতি বাতাসে আতঙ্ক পথে অনাবিল

মুখর মৌমাছিহীন জয়ের স্পর্ধায় কলহের ইতি
রক্তে-রক্তে মেঠো ফুলে চুম্বনের ব্যাপ্ত পরিচয়
মরণ-যাত্রীরা ঠায় দাঁড়িয়েছে স্তব্ধ ঘেঁযে-ঘেঁযে
ঘিরেছে লীলায় গন্ধ খ্যাপা এই লোকারণ্যময়

তবু এসব তো গেল কিছুদিন আগের কবিতা। অতি-আধুনিক অবস্থাটা বোঝা মুস্কিল। তবে এটা বুঝতে কিছু কষ্ট হয় না যে পাঠক-গোষ্ঠী আর কবিতা পড়তে চায় না। আপাতত এক অর্থে কবিতার বিরুদ্ধে আন্দোলন চলছে। তবু এইটুকু দেশে দশহাজার কবি, প্রকাশকরা বই ছাপতে চায় না, পত্রিকার সম্পাদকরা উদীয়মানদের প্রেরিত পাণ্ডুলিপি ফেরৎডাকে চালান দেয়, যার পয়সা আছে সে নিজের বই নিজে ছাপে। উপন্যাস ও ছোটগল্পের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কবিতা নাকি এগোতে পারছে না—বদ্ধ জলার ঘূর্ণিপাকে প'ড়ে চরকি-বাজী খাচ্ছে। একজন কবিকে জানি, তার কবিতা কেউ পড়ে না, ছাপতেও চায় না—সন্ধেবেলা সেন্-এর তীরে শান-বাঁধানো এবড়ো-খেবড়ো রাস্তায় প্রেম ক'রে বেড়ায় আর বলে, আমার প্রেমিকা যদি জানতে পারে যে আমি কবি, তক্ষুনি আমাকে বয়কট ক'রে দেবে। অথচ ছেলেটি বেশ লেখে। কবিতা-পত্রিকাও এখানে একাধিক আছে, কী ক'রে চলে, কে জানে! কলকাতার বড়োবাজার-মার্কা গলিতে তাদের আপিস, পোড়ো বাড়ি, দিনের বেলাতেই সর্বক্ষণ আলো জেলে রাখতে হয়, কাঠের গুদামের পাশ দিয়ে সরু সিঁড়ি উঠে গেছে, ঘরের মধ্যে সম্পাদকের সামনে কয়েকজন ক্ষীণকায় তরুণ তাঁদের পাণ্ডুলিপি নিয়ে গদগদ দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন—ধুতি-চাদরটি পরিয়ে দিলে বাঙালি কবিদের সঙ্গে তাঁদের বড় একটা পার্থক্য থাকবে না।

অবশ্য কপালে থাকলে যদি একবার একটা আরাগঁ অথবা এলুয়ার হ'য়ে যাওয়া যায় তো আলাদা কথা। তখন কবিতার বই যেচে ছাপবে প্রকাশকরা বই-এর দোকানের মালিক রাস্তার ধারের কাঁচের জানালায় লেখকের ছবি টাঙিয়ে দেবে, বই বিক্রীও হবে—তবে লোকে পড়বে কিনা বলা শক্ত। এক পরিবারকে জানি, তাঁদের বাড়ি গিয়ে দেখি সুদৃশ্য টেবিলে

থরে-থরে এলুয়ারের রচনাবলী সাজানো রয়েছে—সেগুলোর দিকে আঙুল দেখিয়ে কর্তা বললেন, মস্ত বড় কবি। একটা কবিতা আমি খুঁজছিলাম, জিজ্ঞেস করলাম কোন বই-এ পাওয়া যাবে। ভদ্রলোক খানিকটা ভেবে বললেন, তা তো বলতে পারি না, অল্পই পড়েছি, সব বুঝি না, আধুনিক কবি কিনা—তোমার ইচ্ছা হয়, তুমি কয়েকদিনের জন্যে গোটাকতক বই নিয়ে যেতে পার। ব্যাপারটা মুহূর্তেই আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। এরা কবিতা পড়ে না—কারণ এলুয়ারকেও যে বুঝতে পারে না, তার বুদ্ধি বর্ণপরিচয়ের প্রথমভাগ পর্যন্ত পৌঁছায়নি। অথচ সেই একই পরিবার বাল্মীকি-প্রতিভার কোন গানে বিদেশী কোন গানের ছাপ রয়েছে, তা একবার শুনলে ব'লে দিতে পারবে।

অর্থাৎ চলতি কালের ফরাসী কবিতার প্রসঙ্গে আমাদের আরাগঁ এবং এলুয়ারে এসেই থামতে হ'ল। তাঁদের প্রতিভাকে সর্বান্তঃকরণে নমস্কার ক'রেও শেষে এইটুকু বলি, মানুষ যেখানে অনন্ত একলা, যেখানে একজনের সঙ্গে আরেকজনের অকূল-অপারের দূরত্ব, সেখানেও সে বিরাজ করে, সেখানেও তার কথা, ভাষা ও সুরের প্রয়োজন হয়। প্রতিটি জিনিষেরই দুটি রূপ আছে, এক রূপ তার আকাশের, এক রূপ নিভৃত অন্তরের—এক জায়গায় সে সর্বজনীন, সম্পূর্ণের একটি অংশ মাত্র, অন্য জায়গায় সে একান্তভাবে আপনার, নিজেই নিজের প্রভু। এ-দুয়ের মধ্যে যে বিরোধ, সেটা অপাত মাত্র। সার্থক-সমাজ-ব্যবস্থা দুজনকেই গ্রহণ করবে। বলা-বাহুল্য উল্টোটাও মানি—কেবল মাত্র আত্মকেন্দ্রিক চেতনায় সর্বনাশ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে না-পারায় নপুংসকত্বের ঘোষণা ও জীবনের যথার্থ দিক হ'তে পলায়নবৃত্তি গ্রহণ করা।

জলরং

আলাউদ্দিন আল আজাদ

সহসা অবাক লাগে ছিপছিপে নদী আর উবু জনপদ
কাঁপে কার থরথর সজোর ঘোড়ার খুরে, বনঝোপগুলি
কানখাড়া স্নেহাতুর হরিণশিশুর মতো, খড়ের বাসায়
কোকিলের বলাবলি, কেন এত গান জমে গলায়-গলায়
হৃদয়ের ঢেউ ছুঁয়ে? নিশীথ রাতের তারা যায়, ফেটে যায়,
কাকের ডিমের মতো পরিমিত বেদনায়, দালানের পিঠে
হতবাক হয়ে ঝরে চাঁদের রূপালি খোসা। বাতাসের শর
ছুঁড়ে যায় দুই হাতে, এখনো জানে না কেউ এ-কোন্ সৈনিক
এল, নিরীহ দিগন্ত থেকে সমুদ্রের পথে, রক্তিম চিবুকে
তার, অভিসারী কামনার দৃপ্ত অঙ্গীকার। মৃদু সোরগোল
ওঠে আজ চারিদিকে, পালায় পালায় বুঝি শীতের ডাকাত
কলোনী-মিছিল ছেড়ে, পোষাকের পাড় ছেড়ে, অবরোধ ছেড়ে
নেকড়ে পালের মতো, ক্ষুরধার নখরের গর্ব নেই আর
কেননা শুনেছে তারা বাস্তবিক বসন্তের বিজয়ী ভাষণ:

'ছাউনি ফেলার পালা হ'ল শেষ, নগরবাসীরা
জ্বলুক এবার
লাল টুকটুক
আগুনের রং তোমাদের মুখে।
চা'য়ের পেয়ালা হোক সরোবর নিবিড় কাকলি বাদামি জলের
টেবিল-টেবিলে কথার মঞ্চ সরল হাসির মুক্তা ঝরুক
এপার-ওপার সকল হৃদয়ে রামধনু-সেতু বাঁধা হোক ফের,
হাতে হাত আর কাঁধে কাঁধ রেখে ভোরের জন্যে নীরবে দাঁড়াও।

সাহসী ঘাসের শিখরে-শিখরে বিঁধে ঝরে যাবে কুয়াশার হাড়
তরুণীর গাঢ় চাহনির মতো সূর্যের রেণু গায়ে মেখে নাও।
রৌদ্র-বেলায় উলংগ করে ছেড়ে দাও সব শিশুদের এনে
তাদের শঙ্খ-শরীরে লাগুক শিশির-মেদুর বালুকার স্বাদ,
কিশোর-কিশোরী বেরিয়ে পড়ুক দূর মোহনায় শামুক খুঁজতে:
বুড়িদের ঠোঁট বেয়ে ঝরে যদি সোহাগী পানের টলটলে রস
বাধা দিও নাক', রেশমী খোঁপায় দাও না পাখার দুষ্টু হাওয়া
খুলে গেলে চুল বুড়োদের বুকে জাগবেই, আহা, একদা-র দোলা
এনেছি আবার ফুলের পেয়ালা, নগরবাসীরা
নামুক এবার
লাল টুকটুক
আগুনের রং তোমাদের মুখে।
ফুলের পেয়ালা উপচে এনেছি মদির গন্ধ স্বরের বর্ণ
থামাও আলাপ চুপচাপ এই অমৃতের সুরা পান করে নাও,
তারপর হাঁটো পথ ভুলে-ভুলে, সবুজের ঢলে ভিজুক কাপড়।
কী যেন কী নেই, মনে পড়ে নাকি? ভুলে গেছ সেই অনন্য নাম?
খোঁজ করে দেখ ফুরায়নি আজো হারানো প্যাডের হলুদ কাগজ
বালিশের নিচে হয়তো এখনো ব্যাকুল একাকী দু'টি নীল খাম।'

*

বিছানায় উঠে বসি, দুরুদুরু হৃৎপিণ্ড, এ কি পরিহাস!
স্বপ্ন নয় স্বপ্ন নয়, যেন এক পরিচিত চুলের ছায়ায়
কেঁপেছিল ঝলমল জানালার জোছনায় উতলা মশারি।
সময়ের অপমানে যেই মেয়ে একদিন নিয়েছে বিদায়
নতমুখে, অবিকল তাহারি গভীর শ্বাস আমার কপোলে
কবোষ্ণ ছোঁয়ায় বোনা, ইশারায় বলয়িত মোমের আঙুলে

নেড়ে গেছে নিরিবিলি কবিতার শাদা খাতা। হায়রে ফাল্গুন,
এখনো ছাড়নি তুমি পুরাতন প্ররোচনা, এখনো ছাড়নি!

অবশেষে রাত্রি ভোর। জীবিকার অন্বেষণে জনতার স্রোতে
ভেসে চলি প্রাণপণে, গাণিতিক প্রয়াসের ঘন স্বেদ জমে
অবসন্ন লোমকূপে। তবুও অবাক লাগে, যেদিকে তাকাই
বিকেলের লালমেঘে, বিদিত বিদিশা বনে, খামারের ঘাসে
হারিয়েছে যেই মেয়ে জলরঙে আঁকা হয়ে আছে তার মুখ॥

কোনো বন্ধুকে লেখা

বটকৃষ্ণ দাস

সে যদি হঠাৎ আসে এই ম্লান ভাদ্রের বিকেলে
যখন বর্ষণ শেষ, গাছে-গাছে নিবিড় পাতার
ফিসফাস, এবং আকাশে আধো আলো-অন্ধকার,
জানালায় ভিজে হাওয়া, উদাস নির্জন এই মন,
তখন সে যদি আসে হঠাৎ দুয়ারখানি ঠেলে!

অথবা হঠাৎ তার কাঁকনের মৃদু কনকন
শুনে যদি চেয়ে দেখি: বনের পাখির মতো ভিজে
সে এসে দাঁড়িয়ে আছে আসমানী রঙের শেমিজে,
হাসির গোধূলি ঠোঁটে, দুচোখে কথার ঝিলমিল,
কপোলে জলের ফোঁটা, এলোচুলে একরাশ যুঁই!

হয়তো ব'লবে তুমি: সত্যের কপাটে দিয়ে খিল
মিথ্যার বারুদে গড়া কল্পনার রঙিন হাউই
জালানো আমার পেশা। হয়তো সে কথা ঠিক, প্রিয়।
নির্বোধ ইচ্ছার স্তূপে জীবনের ফাঁক ভ'রবে না,—
তবুও সত্যের চেয়ে মিথ্যা শ্রেয়, মিথ্যা বরণীয়।

কারণ, সত্যের মানে: সে আর কখনো আসবে না।
তবুও জীবন চায়—সে আবার এখানে আসুক;
যাকে আমি হারিয়েছি,—সে আবার ভ'রে দিক বুক।
যদিও অলীক আশা, মিথ্যা সব, সাগরের ফেনা,
সত্যের করাতে তবু হৃদয়কে কে দেয় যৌতুক?

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-র 'সংবর্ত'

অরুণকুমার সরকার

আজ পর্যন্ত বাংলা কবিতার প্রধানতম দুর্বলতা এই যে অধিকাংশ সময়েই তা নিরবয়ব-হৃদয়বৃত্তির প্রকাশ মাত্র। এদিক থেকে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-র কাব্য অন্যতম ব্যতিক্রম; বিশুদ্ধ চিন্তাবস্তুই তাঁর কাব্যাবেগের মৌল উৎস। যে-নৈরাশ্য তাঁর ভাবনা-বেদনার সঙ্গে ওতপ্রোত, তিরিশের অন্যান্য কবিদের মতো, তা ব্যক্তিগত ব্যর্থতার আত্মবিলাপ নয়, বিচার-বিশ্লেষণ এবং দর্শন অনুশীলনেরই পরিণাম। ফলত তাঁর কাব্য যতটা এ্যাটিট্যুড্ বা মুডে-র প্রকাশ, তার চাইতে ঢের বেশি বুদ্ধিগ্রাহ্য; এবং এইখানেই তাঁর সিদ্ধি যে স্বকীয় রচনারীতিকে ন্যায়শাস্ত্রের নিয়মানুগ রেখেও তিনি কদাচ আবেগের মুণ্ডপাত করেননি।

তাই সুধীন্দ্রনাথ যা বলতে চেয়েছেন তা অস্পষ্টভাবে বুঝে, চাই কি সময় সময় বুঝতে না পেরেও, তাঁর কবিতা যা হয়ে উঠেছে তা হৃদয়ঙ্গম তথা উপভোগ করা সম্ভব। কিন্তু তত্রাচ তাঁর সঙ্গে আমরা সম্পূর্ণভাবে একমত হতে পারি না যখন তিনি বলেন, 'মালার্মে-প্রবর্তিত কাব্যদর্শই আমার অন্বিষ্ট : আমিও মানি যে কবিতার মুখ্য উপাদান শব্দ : এবং উপস্থিত রচনা-সমূহ শব্দপ্রয়োগের পরীক্ষা-রূপেই বিবেচ্য।' 'সংবর্তে'র মুখবন্ধ থেকে উদ্ধৃত এই উক্তি, আমার ভয় হয়, কর্মক্ষেত্রে সুধীন্দ্রনাথের কবিতার দ্বারা সমর্থিত হয়নি। মালার্মে, যতদূর জানি, মোটামুটি এই কথাই বলেছেন যে যেহেতু গান হয়ে ওঠাই কবিতার কৈবল্য, অনির্বচনীয়কে, অর্থাৎ, বস্তুর অন্তঃসারকে, প্রকাশ করার প্রয়োজনে সত্যিকারের কবিতা অনতিব্যক্ত হতে বাধ্য। সুতরাং কবির পক্ষে ব্যাকরণ-লঙ্ঘন দূষণীয় তো নয়ই, বরং আভিধানিক অর্থকে পরিহার ক'রে শব্দগুলোকে ভেঙেচুরে গানের উপাদান ক'রে তোলাই তাঁর লক্ষ্য হওয়া উচিত। কেননা, ভাবনার দ্বারা নয়, মালার্মের মতে শব্দের দ্বারাই কবিতা লেখা হয়ে থাকে।

পক্ষান্তরে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যাই বলুন না কেন, কথা নিয়ে মাতলামি করা

তাঁর স্বভাবের ত্রিসীমায় নেই। তাঁর কবিতা চিন্তারই আবেগরূপ; এবং যেহেতু শব্দ ব্যতিরেকে চিন্তার প্রকাশ শিবেরও অসাধ্য, সেই কারণেই কথার প্রতি তাঁর আসক্তি। কথা এবং শব্দ দিয়ে অভাবনীয় অচিন্ত্যনীয়কে অস্পষ্টতার আলো-আঁধারিতে প্রত্যক্ষ করা, আর যার হোক, তাঁর অভ্যাস নয়। অর্ধস্ফুট পেলব মৃদু শব্দ তিনি প্রায় ব্যবহারই করেন না; সমাসবদ্ধ যুগ্ম ভারী ওজনের শব্দের দিকেই তাঁর ঝোঁক। পরিণামে, তাঁর কবিতায় যে ধ্বনির সম্মোহন সৃষ্ট হয় তা কখনই তাঁর উপলব্ধিকে ছাপিয়ে ভিন্ন পরিবেশে পাঠককে উপস্থিত করে না, বরং তাঁর বক্তব্যের দিকেই আমাদের অধিকতর আকৃষ্ট করে; অর্থাৎ, ভাবায়, ভাসিয়ে নিয়ে যায় না। ফলত সুধীন্দ্রনাথের কবিতার বাক্যগঠনরীতি শুধু যে অবিকল গদ্যের ব্যাকরণ মেনে চলে তা-ই নয়, মাত্রাবৃত্তে তাঁর অসামান্য দখল সত্ত্বেও, বোঝা যায় পয়ারই, বিশেষ ক'রে ১৮ মাত্রার, তাঁর মেজাজের অনুকূল, যেহেতু সেখানেই দুরূহ চিত্রকল্প এবং বক্তব্যকে আয়ত্তে আনা সম্ভব। তাই আলোচ্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে যে পাঁচটি রচনা, অর্থাৎ, 'পথ', 'যযাতি', 'জেসন্', 'উজ্জীবন' এবং নাম কবিতাটি, আমার বিবেচনায় সমধিক মূল্যবান, সে-গুলি পয়ারেই রচিত।

আর উচ্ছ্বাসের প্রতি সুধীন্দ্রনাথের অনীহা এতই প্রকট যে সর্বদা স্বরবর্ণের, বিশেষত অ-কার আ-কারের, অনুপ্রাসই তাঁকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে। এই, সম্ভবত অবচেতন, আকর্ষণের তাড়নায় সময়-সময় তাঁকে প্রায় মোহাচ্ছন্ন ব'লে মনে হয়। 'সংবর্তে'র প্রত্যেকটি কবিতাই আমার উক্তিকে সমর্থন করবে। 'অঙ্গুলি তুলি, দেখায় অলখ নিষাদে', 'অনিকেত অভিসারে', 'অসম্ভৃত অমা', 'অন্যোন্যসম্বল আজ ত্রিভুবনে আমরা দুজনে', 'অভিশাপে প্রস্তরিত অর্ধনারীশ্বর···অকস্মাৎ অব্যাহতি পাবে', 'অস্পৃশ্য অম্বরে তবুও অদৃশ্য তুমি', 'আজ আনে আচম্বিতে অতিশ্রুতি অন্তরায় প্রত্যাশিত আকাশবাণীতে', 'অস্মিতার অসম্ভব দাবী', 'অবিবেকী অন্তর্যামী; স্ত্রীপুরুষ অন্যোন্যনির্ভর', 'অনিকাম অবসাদ', 'অপমৃত ভগবান; অস্তাচলে রক্তাক্ত অঙ্গার', 'অন্ধতম ভ্রাতিব্রজ', 'অসাধ্য সাম্রাজ্যরক্ষা, অব্যর্থ প্রলয়···তারও অব্যাহতি নেই অপঘাত থেকে', 'অনুপূর্ব মানুষের অভ্যুদিত চিত্তের প্রসাদ', 'অশক্ত বা

অসম্পৃক্ত অধিদৈবতের', 'অবাধ, অগাধ, অপার নীরে', 'অসীম অমায় সহসা স্বরাট অনুপ্রভা' ইত্যাদি অনুপ্রাস, স্বাবলম্বী স্বরবর্ণের ব'লেই, সঙ্গদোষে উচ্ছ্বাসী হয়ে ওঠে না, বরং একটা বলিষ্ঠ ভাবমণ্ডলের সৃষ্টি করে। উদ্ধৃতির সংখ্যা ইচ্ছে করেই বাড়িয়েছি এই জন্য যে কৌতূহলী পাঠক এর থেকে বুঝতে পারবেন সুধীন্দ্রনাথ কর্তৃক প্রযুক্ত কোনো শব্দকেই এককভাবে উপেক্ষা করা যায় না, তারা অতিশয় অভিমানী, এমনকি অনুপ্রাসের যূথবদ্ধতা সত্ত্বেও: এবং অ-কার আ-কারের পরিবর্তে ব-কার ম-কারের অনুপ্রাস ব্যবহৃত হলে ধ্বনির ধূম্রজাল ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকত না।

সুতরাং 'সংবর্তে'র ভূমিকায় সুধীন্দ্রনাথ যাই লিখুন, নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটি পঙ্‌ক্তিতেই তাঁর জীবনদর্শন এবং কাব্যাদর্শ—উভয়ই অধিকতর পরিস্ফুট হয়েছে :

আমি বিংশ শতাব্দীর
সমান বয়সী ; মজ্জমান বঙ্গোপসাগরে ; বীর
নই, তবু জন্মাবধি যুদ্ধে যুদ্ধে, বিপ্লবে বিপ্লবে
বিনষ্টির চক্রবৃদ্ধি দেখে, মনুষ্যধর্মের স্তবে
নিরুত্তর, অভিব্যক্তিবাদে অবিশ্বাসী, প্রগতিতে
যত না পশ্চাৎপদ, ততোধিক বিমুখ অতীতে।
কারণ ভূতের নির্বন্ধাতিশয়ে তথা ভবিষ্যের
নিষেধে অধুনা ত্রিশঙ্কু, এবং সে-খণ্ড বিশ্বের
মধ্যে দ্বৈপায়ন আমরা সকলে, জানি কি না জানি,
নাস্তিরই বিবর্তবাদ। এমনকি উপস্থিত হানি
সম্ভবত অবাস্তব স্খলিত সে-পদ্যের মতো,
যাতে রেণু, বেণু, কদাচ ধের্যুও, মিলে, ক্রমাগত
অভিভাবে আত্মোপলব্ধির অভাব লুকিয়ে রাখে,
এবং অলীক ভেবে, উচ্ছ্বসিত স্বপ্নরচনাকে
যখন করেছি ত্যাগ, সেকালে স্বকপোলকল্পিত
সর্বনাশে হাহুতাশ অবৈধ ও সাফল্যবর্জিত।

একদা সুধীন্দ্রনাথের নামের সঙ্গে 'নাস্তিক' বিশেষণটা কে উচ্চারণ করেছিলেন মনে নেই। যিনিই ক'রে থাকুন, আমার মতে, নিদারুণ ভুল

করেছিলেন। বস্তুত সুধীন্দ্রনাথের মতো এমন ঘোরতর আস্তিক, বাঙালি কবিদের মধ্যে, আমি অন্তত আর খুঁজে পাইনি। তাঁর প্রাক্তন রচনাবলীর কথা মনে রেখেই এ কথা বলছি। সেখানে তিনি মৃত্যুভীত, সর্বদা ভবিতব্যভারাতুর। কিন্তু তা আপাতভাবেই। কেন না, কে না-জানে জীবনকে সব থেকে গভীরভাবে যে ভালোবাসে, কালচেতনা তাকেই উৎপীড়ন করে বেশি? সুধীন্দ্রনাথের নৈরাশ্যবাদের মূল কারণই হল আস্তিকতা। একদিকে, তাঁর মনে, সুস্থ সুন্দর মানবসমাজের কল্পরূপ, অন্যদিকে, বহির্জগতে, সম্মিলিত নরকযাত্রা; এতদুভয়ের অন্তর্দ্বন্দ্বই তাঁর কবিতার নির্যাস। সুধীন্দ্রনাথ যদি সত্যসত্যই নাস্তিক হতেন, তাহলে, বলাই বাহুল্য, জগদ্ব্যাপার তাঁকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করত না। কিন্তু, সম্ভবত ইয়ুঙ্-কথিত 'কালেকটিভ্ আন্‌কন্‌সাস্' যার প্রেরণা, সেই 'পথ' নামক কবিতাটি পাঠ করলেই বোঝা যায় যে-অস্থিতি, যে-জঙ্গমতা মানুষের মগ্নচেতন উত্তরাধিকার, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তারই সচেতন অংশভাগী। মানুষের ক্রিয়াকর্ম, সাম্রাজ্যের উত্থানপতন, ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর সদাজাগ্রত কৌতূহল এই জন্যই যে তাঁর চেতনায় এক সুপরিকল্পিত রাষ্ট্রভাবনা মূর্ত রয়েছে :

নির্বিকার স্বপ্নের নিভৃতে,
বিয়োগান্ত নাটকের উদ্যোগী নায়ক, আমি পাতি
যৌবরাজ্য,—ব্যোমযান, কামান, পদাতি
যে-রাষ্ট্রের অঙ্গ নয় ; ন্যায়, ক্ষমা, মিতালি, মনীষা
যার মুখ্য অবলম্ব, জিজীবিষা
সামান্য লক্ষণ।

প্রাক্‌সামরিক পৃথিবীতে চিন্তাশীল মানুষের সামনে পথনির্ণয়ের সমস্যা কিছু দ্বিধাগ্রস্ত ছিল না। তখন একদিকে ছিল ক্ষয়িষ্ণু ধনতন্ত্রবাদের অন্তিম আত্মরক্ষার প্রয়াস এবং সমাজদেহে তজ্জনিত দুষ্টক্ষত; অন্যদিকে ছিল বিশ্বজোড়া গণবিপ্লবের প্রস্তুতি এবং সোভিয়েট রাশিয়ার বরাভয়। স্বভাবতই সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তখন মনেপ্রাণে শেষোক্ত দলে যোগ দিয়েছিলেন। তদানীন্তন বিপ্লবীদের উদাত্ত কণ্ঠে কতবার আবৃত্তি শুনেছি :

কবিতা

আশ্বিন ১৩৬০

তার স্বাধিকার আগে ফিরে দিতে হবে
নতুবা নগর. তথা প্রান্তর,
ভ'রে রবে বাসী শবে।
অশক্য পিতা ;   বন্দীর কণ্ঠলগ্ন
মাতা বসুমতী ব্যভিচারে আজ মগ্ন ;
ক্ষাত্র শোণিতে অবগাহি, জামদগ্ন্য
তবু পাতিবে না স্বর্গরাজ্য ভবে।
স্বীয় শক্তিতে হবে যোগ দিতে
শুদ্ধির তাণ্ডবে ॥

কিন্তু ১৯৩৮ আর ১৯৪৫-এর মধ্যে মাত্র সাত বছরের ব্যবধান হলেও এটুকু সময়েই কল্পান্তের বিপর্যয় ঘটে গেছে। যুদ্ধে জয় হয়েছে, নাট্‌সীবাদের বিনাশ, তা-ও, কিন্তু পুনরুজ্জীবিত জাতিবিদ্বেষে যুদ্ধজয়ের উত্তম ফুরিয়ে গেছে: সামনে আর এক মহাসমর, অনুবিদারণের দুঃস্বপ্ন। সবথেকে মারাত্মক আঘাত হেনেছে আদর্শের ভিত্তিভূমি, সমস্ত প্রতিশ্রুতিকে চুরমার ক'রে সেখানেই একনায়কত্বের বজ্রমুষ্ঠি দৃঢ়তর হয়েছে, পরমত-অসহিষ্ণুতা সীমা ছাড়িয়েছে, পরিহাসের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে ব্যক্তিস্বাধীনতা। তাই ১৯৩৮-এ যিনি তাণ্ডবে যোগ দেবার উন্মত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন, ১৯৪৫-এ তাঁর মুখেই শুনতে পাচ্ছি :

তবু জানি যবে জয় হবে বলেছিলে
চাওনি তখন তুমিও এ পরিণাম :
শূন্যে ঠেকেছে লাভে লোকসানে মিলে,
ক্লান্তির মতো শান্তিও অনিকাম।
এরই আয়োজন অর্ধশতক ধ'রে,
দু-দুটো যুদ্ধে, একাধিক বিপ্লবে,
কোটি-কোটি শব পচে অগভীর গোরে,
মেদিনী মুখর একনায়কের স্তবে!
নির্বাণ নভে গৃধ্র, রাহুর গ্রাস ;
তুমি অনিকেত নির্বাক নাস্তিতে

কবিতা

বর্ষ ১৮, সংখ্যা ১

কে জবাব দেবে, নিখিল সর্বনাশ
কোন্ অবরোহী পাতকের শাস্তিতে?

ফলত 'সংবর্ত' এক ব্যক্তিস্বাধীনতায় বিশ্বাসী, বিবেকী দ্বিধায় বিচলিত, আধুনিক মানুষের আদর্শগত স্বপ্নভঙ্গের কাহিনী। সুধীন্দ্রনাথ একক নন। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে দ্বীপের মতো বিচ্ছিন্ন, কিন্তু, আমার বিশ্বাস, ধীরে-ধীরে ক্রমবর্ধমান, এক নৈরাশ্যবাদীদের ভ্রাতৃসংঘ গড়ে উঠছে। তাঁরা সংশয়ী কিন্তু ভগ্ন-উরু নন, পুরাতন বিশ্বাসের পরিমার্জনাকালে নূতন মূল্যবোধের সন্ধানী এবং অন্তর্বর্তীকালে আপাতত্রিশঙ্কু। তত্রাচ তাঁরা, সুধীন্দ্রনাথের মতোই, ইতিহাসে ব্যক্তির অবদানকে স্বীকার করেন, বিশ্বাস করেন যে ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহে 'ব্যষ্টিসংকল্পের ঝোঁকে' 'কখনো বিলম্ব ঘটে, কদাচিৎ দ্রুতি।' সুধীন্দ্রনাথের মতোই তাঁরা নাট্‌সী জার্মানীকে ঘৃণা করেন কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে অনুভব করেন যে-জার্মানী গ্যেটে, হেল্ডার্লিন, রিল্কে, টমাস মানের, তা তাঁদেরও স্বদেশভূমি। এই বোধ আস্তিক্যের ; এবং সেই জন্যই ভাবীসমাজের স্বপ্নবীজ। কিন্তু সাম্প্রতিক পৃথিবীতে তা দিবাস্বপ্ন জেনেই, বুদ্ধিজীবীরা নানা আখ্যায় আজ আত্মগোপন ক'রে আছেন। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যেমন, 'সংবর্তে'র মুখবন্ধে, ক্ষণবাদী বৌদ্ধ ব'লে প্রচার করেছেন নিজেকে। 'নিরপেক্ষ কালের প্রবাহে' কেবলই 'পুনরাবৃত্তি' এ-কথা বহুবার ঘোষণা করলেও, বহির্জাগতিক ঘটনাপ্রবাহ প্রতীতি বা প্রতিভাসের ভাঙাগড়া মাত্র,—এ-ধারণা তাঁর রচনার দ্বারা কতটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা নিঃসন্দেহেই তর্কসাপেক্ষ। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ স্পষ্টত প্রমাণ করতে পেরেছেন যে বৌদ্ধদের মতোই শুক্লকর্মে তাঁর আস্থা অটুট আছে, এখনো, এই পরিবেশেও, যখন :

জাতিভেদে বিবিক্ত মানুষ
নিরঙ্কুশ একমাত্র একনায়কেরা। কিন্তু তারা
প্রাচীর, পরিখা, রক্ষী, গুপ্তচর ঘেরা প্রাসাদেও
উন্নিদ্র যেহেতু, তাই ভগ্ন সেতু নদীতে নদীতে,
মরু নগরে নগরে। পক্ষান্তরে অতিবেল কারা

তথা সংক্রমিত মেরু ব্যক্তির ধ্বংসাবশেষে : দ্বেষে
পুষ্ট চীন থেকে পেরু ; প্রতিহিংসা মানে না সিন্ধুর মানা।

উপরি-উদ্ধৃত অংশটিতে অন্তর্মিলের যে অভিনবত্ব দেখানো হয়েছে, সাবধানী পাঠক নিশ্চয়ই তা লক্ষ্য করেছেন। মানুষ : নিরঙ্কুশ ; একনায়কেরা: ঘেরা ; যেহেতু : সেতু; নগরে : পক্ষান্তরে, মেরু : পেরু ; ধ্বংসাবশেষে: দ্বেষে, ইত্যাদি অন্তর্মিলগুলি সম্বন্ধে সজাগ থাকলে, আমার মনে হয়, কাব্যাংশটির পাঠ সহজতর হবে। বস্তুত 'যযাতি' কবিতাটি শুধু যে প্রকরণের দিক থেকেই আশ্চর্য তা-ই নয়, সঙ্গে-সঙ্গে পয়ারের চরমোৎকর্ষ তো বটেই, বাংলা কবিতায় শ্রেষ্ঠ বিমূর্তনার অদ্বিতীয় উদাহরণ। এবং উল্লিখিত কবিতা-পাঠে এ-ধারণাও আমাদের মনে বদ্ধমূল হয় যে শব্দসম্পদে সুধীন্দ্রনাথ কুবেরতুল্য। শব্দ যেহেতু বস্তু এবং চিন্তারই প্রতীক, তাই শব্দাধিকারীর পুঁজির অঙ্ক থেকে তাঁর মানসিক ব্যাপ্তিকেও জরিপ করা যায়। সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় শব্দগত দুর্বোধ্যতা নিয়ে যাঁরা হা-হুতাশ করেন, আমার মতে, আত্মানুশীলনে মনোযোগী হওয়াই তাঁদের কর্তব্য। আধুনিক ইংরিজি কবিতা, ধরা যাক ডাইলান্ টমাসেরই, বোঝবার জন্য যে-পরিমাণ পরিশ্রম আমরা ক'রে থাকি, বাঙালি কবির ক্ষেত্রে তা প্রযুক্ত হবে না কেন? বাংলাকবিতার উৎসধারা রবীন্দ্রনাথে এসে বিক্ষুব্ধ তরঙ্গমালায় পরিণত হলেও, তার উৎপত্তি আরো সুদূরস্থানে। এ-কথা মনে রাখলে, সুধীন্দ্রনাথ-ব্যবহৃত শব্দাবলীকে অচেনা মনে হবে না। এবং কবিতায় যারা ভাবালুতার চেয়ে বেশি কিছু আশা করেন, নিম্নোদ্ধৃত পঙ্‌ক্তিটির মর্মোদ্ধারের জন্য ঈশোপনিষৎ* হাতড়াতেও তাঁরা ইতস্তত করবেন না :

কারণ তখন বায়ু অনিলে মেশে না, অবস্কর
ভস্মান্ত হয় না, অনুব্যবসায়ী ক্রতু
বোঝে সন্তাপেও ব্যাপ্ত ব্রহ্মাণ্ডের বীতাগ্নি বেপথু।

তাই শাব্দিক দুর্বোধ্যতার জন্য সুধীন্দ্রনাথের কবিতা সম্পূর্ণভাবে উপভোগ

করতে পারলাম ব'লে কবির প্রতি আমার কিছুমাত্র অভিযোগ নেই, নিজের স্বল্পবিদ্যায় আপাতত লজ্জিত হ'য়ে থাকলাম।

কিন্তু 'সংবর্ত'-যে মহাকাব্যের লক্ষণাক্রান্ত, আমার এ-অনুভবের কথা না জানিয়ে আলোচনায় দাঁড়ি টানতে পারছি না। সুধীন্দ্রনাথের বিষয়বস্তু ইতিহাস এবং যুদ্ধ ব'লেই এ-কথা বলছি না, সৎ পাঠকমাত্রই সম্ভবত স্বীকার করবেন যে সত্যসত্যই এই কাব্যের নেপথ্যনায়ক ধীরোদাত্তগুণান্বিত।

---

*বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরম।
ওঁ ক্রতো স্মর, কৃতং স্মর, ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ॥

সমালোচনা

সময় ও সাহিত্য। কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত। প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী। কলকাতা।

সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধপুস্তক এ-পর্যন্ত বাংলাভাষায় যা রচিত হয়েছে তার অধিকাংশই হয় পূর্বনির্ধারিত ভাবধারার অনুলিখন নতুবা একদিকদর্শী সিদ্ধান্তের অতিউচ্ছ্বাসী স্বমতগর্বিত প্রতিষ্ঠা। আধুনিক এবং যুক্তিযুক্ত পরিপ্রেক্ষিতে সাহিত্যবিচার আমাদের দেশে নিতান্ত দুর্লভ এবং সেইদিক থেকে 'সময় ও সাহিত্যে'র অন্তর্গত প্রবন্ধাবলী মূল্যবিচারের অপেক্ষা রাখে। এই গ্রন্থের রচনাসমূহ যুগদৃষ্টির সমধর্মী, আলোচনা শিক্ষিত মনের উপজাত। পূর্বতন ও নবীন ভাবাদর্শের সমন্বয়সাধনে লেখকের উৎসাহ; এবং যদিও তার প্রকাশ অনেকস্থলেই আড়ষ্ট, অর্ধস্ফুট, তথাপি এই পক্ষপাতহীনতাই তাঁকে লক্ষ্যে উপনীত হতে সহায়তা করেছে।

'কবিতার কথা', 'কাব্যবিচার'—এই দু-টি প্রবন্ধই উপরিলিখিত উক্তির সমর্থক। এইস্থলে পুরাতন আদর্শের প্রতি যে-পরিমাণ সহানুভূতি দেখি, আধুনিক বিশ্বাসও সেই তুলনায় সামান্য উপেক্ষিত নয়। অধিকাংশ স্থানেই তিনি অবশ্য নবীন সমালোচক এবং কবির মতকেই নিজের স্বপক্ষে উপস্থিত করেছেন, তথাপি কদাচ তাঁর মৌল বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত চিরন্তন সত্যের প্রতিকূল নয়। কাব্যবিচারে মৌলিক হবার আকাঙ্ক্ষায় তিনি অভিনবত্বের আশ্রয় গ্রহণ করেননি, চমকপ্রদ বিচার-বিবেচনাহীন বক্তব্যের গোলকধাঁধায় পাঠককে বিভ্রান্ত করার প্রয়াস পাননি।

আধুনিক ইংরিজিকাব্যের উল্লেখযোগ্য আলোচনা শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত-র পর বাংলাভাষায় আর কেউ করেছেন বলে মনে পড়ে না। শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্করের প্রবন্ধগুলি যদিচ যথেষ্ট আলোচনার অবকাশ রাখে, তবু তাঁর চিন্তা সর্বতোভাবে উপেক্ষণীয় নয়। বিশেষ ক'রে এলিয়টের ওপর তাঁর আলোচনা অন্তত তাদের নিকট মূল্যবান যে-সমস্ত বাঙালী পাঠক ইংরিজি সমালোচনা-সাহিত্যের সঙ্গে যথেষ্ট পরিচিত নন। যাঁরা পরিচিত তাঁদের

কাছে অবশ্য কিরণশঙ্করের প্রবন্ধ নতুন কথা বলবে না, বস্তুত তাঁর আলোচনা ইংরিজি থেকে ধার করা, অনেকস্থলেই ইংরিজি চিন্তার বাংলা ভাষান্তর। 'কাব্যনাট্যের ভূমিকা', 'সমালোচনার পদ্ধতি',—উভয় প্রবন্ধই ইংরিজি সমালোচকদের দৃষ্টির প্রতিফলন। তথাপি বাংলাভাষায় এ-ধরণের আলোচনার প্রয়োজন অবশ্যই আছে।

অরুণকুমার সরকার

প্রাপ্ত

কয়েকটি সনেট।	শুদ্ধসত্ত্ব বসু। দেড় টাকা।
পাখনা।	বটকৃষ্ণ দাস। দু টাকা।

আগামী কোনো সংখ্যায় আলোচনা প্রকাশিত হবে।

কবিতার পুরনো সংখ্যা

কবিতার প্রায় সব পুরনো সংখ্যাই বর্তমানে নিঃশেষিত। কাজেই পুরনো সম্পূর্ণ সেট সংগ্রহ করা এখন আর সম্ভব না। কিন্তু অন্তত পক্ষে মুদ্রণব্যয় কুলিয়ে যাবে এই আশ্বাস পেলেই আমরা নিম্নলিখিত সংখ্যাগুলি পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা করতে পারি। কবিতার এগুলি বিশেষসংখ্যা, মূল্যবান প্রবন্ধের সংকলন হ'য়ে প্রকাশিত হ'য়েছিল। এবং তার অধিকাংশ প্রবন্ধই এখনো কোনো গ্রন্থাকারে পাওয়া যায় না। অন্ততঃ সুবৃহৎ রবীন্দ্র-সংখ্যাটির পুনর্মুদ্রণ বিশেষভাবেই কাম্য। নতুন ক'রে ছাপালে সংখ্যাগুলি যাঁরা পেতে চান তাঁরা দয়া ক'রে চিঠি লিখে আমাদের জানাবেন। শুধু এই সংখ্যাগুলির অভাবে যাঁরা কবিতা বাঁধাতে পারছেন না তাঁদেরও তৎপর হ'তে অনুরোধ করি। যথেষ্ট পরিমাণে আগ্রহ না দেখা গেলে পুনর্মুদ্রণের এই সংকল্প আমরা ত্যাগ করব। বিভিন্ন সংখ্যার সূচী পত্র লিখলে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

কবিতা ভবন

Printed by Purvasa Ltd., 54 Ganesh Chandra Avenue, Calcutta-13
Published quarterly at Kavitabhavan, 202 Rashbehari Avenue, Calcutta 29.
Yearly 4/- or 6s, 6d, a $ 1. 50. Editor and Publisher: Budhadeva Basu.

কবিতাভবন প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসুর বই

গল্পসংকলন

লেখকের বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন ধরনের আঠারোটি ছোটো এবং বড়ো গল্প। ছোটোগল্পের কারুশিল্পে বুদ্ধদেব বসুর প্রকৃষ্ট পরিচয় এই বইয়ে পাওয়া যাবে। রয়্যাল আকারে বোর্ডে বাঁধাই। উপহারের উপযোগী। ৫৲

সাড়া

বিখ্যাত প্রথম উপন্যাস। পরিমার্জিত সুদৃশ্য সংস্করণ। ৩৷৹

বিশাখা

একটি করুণ মধুর রসোজ্জ্বল প্রেমের কাহিনী।
মনোরম প্রচ্ছদ। ২৷৹

স্বতন্ত্র দুটি ছোটোগল্প

একটি সকাল ও একটি সন্ধ্যা ৷৹

একটি কি দুটি পাখি ।/৹

প্রতিভা বসু-র উপন্যাস

সেতুবন্ধ ২৷৹

কবিতাভবন
২০২ রাসবিহারী এ্যাভিনিউ
কলকাতা ২৯

KAVITA — Vol. 18, No. 1, OCTOBER, 1953

পূজার
প্রীতি-অভিনন্দন

ও
শুভেচ্ছা
গ্রহণ করুন

টাটা আয়রণ এণ্ড স্টীল কোং লিমিটেড

Published quarterly at Kavitabhavan, 202 Rashbehari Avenue, Calcutta 29, India. Yearly Rs. 4/-, or 6s. 6d, or $ 1. 50. Distributor in the U.S.A., B. De Boer, Magazine Wholesale, P. O. Box 761, Hoboken, N.J.

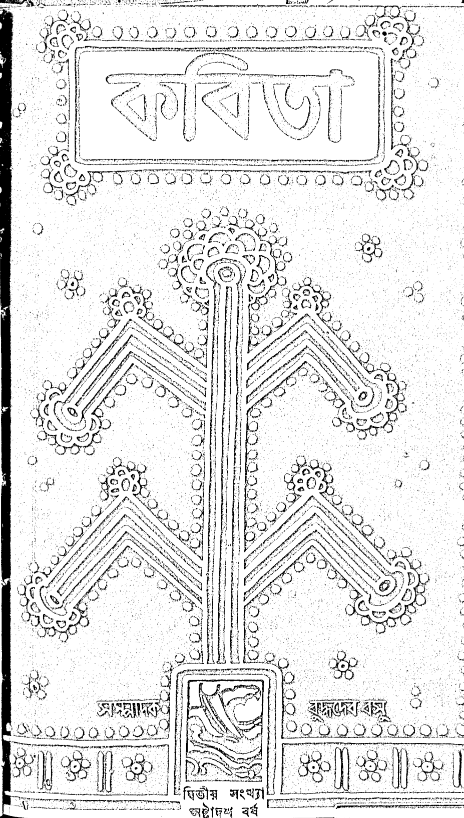

কবিতা

পৌষ ১৩৬০

অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে, যুগান্তর চক্রবর্তী, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, সুস্মিতা সরকার, হরপ্রসাদ মিত্র, অরুণ ভট্টাচার্য, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় শামসুর রাহমান, পূর্ণেন্দুবিকাশ ভট্টাচার্য, প্রণব মিত্র, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, নরেশ গুহ, Jessica Lewis, জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু

বিদেশী কবিতা অবলম্বনে

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু

প্রবন্ধ

মার্কিন প্রবাসীর পত্র : অমিয় চক্রবর্তী

সমালোচনা

নিমাই চট্টোপাধ্যায়

কবিতা

ত্রৈমাসিক পত্র

আশ্বিন, পৌষ, চৈত্র ও আষাঢ়ে প্রকাশিত। * আশ্বিনে বর্ষারম্ভ, বছরের প্রথম সংখ্যা থেকে গ্রাহক হ'তে হয়। বার্ষিক চার টাকা, রেজিস্টার্ড ডাকে পাঁচ টাকা, ভি. পি. স্বতন্ত্র। ষান্মাসিক গ্রাহক করা হয় না। * চিঠিপত্রে গ্রাহকনম্বরের উল্লেখ আবশ্যক। ঠিকানা পরিবর্তনের খবর দয়া ক'রে সঙ্গে-সঙ্গে জানাবেন, নয়তো অপ্রাপ্ত সংখ্যা পুনরায় পাঠাতে আমরা বাধ্য থাকবো না। অল্প সময়ের জন্য হ'লে স্থানীয় ডাকঘরে ব্যবস্থা করাই বাঞ্ছনীয়। * অমনোনীত রচনা ফেরৎ পেতে হ'লে যথাযোগ্য স্ট্যাম্পসমেত ঠিকানা-লেখা খাম পাঠাতে হয়। প্রেরিত রচনার অনুলিপি নিজের কাছে সর্বদা রাখবেন, পাণ্ডুলিপি ডাকে কিংবা দৈবাৎ হারিয়ে গেলে আমরা দায়ী থাকবো না। * সমস্ত চিঠিপত্রাদি পাঠাবার ঠিকানা:

কবিতাভবন

২০২ রাসবিহারী এভিনিউ,
কলকাতা ২৯

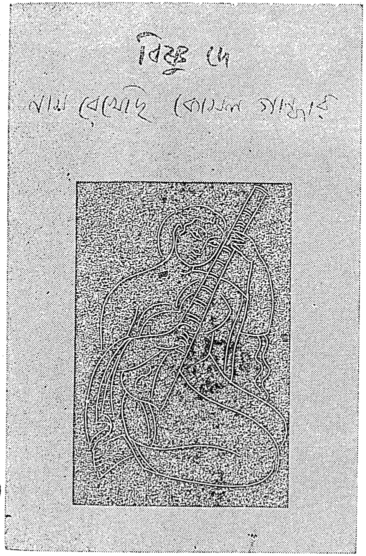

বিষ্ণু দে-র 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার' গ্রন্থে তাঁর কাব্যপ্রতিভার আশ্চর্য বিবর্তন লক্ষণীয়। সিগনেট প্রেসের বই। দাম আড়াই টাকা।

সিগনেট বুকশপ

১২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট | ১৪২-১ রাসবিহারী এভিনিউ

আরামে ভ্রমণের
জন্য
ডানলপ
TRADE MARK

সুন্দর
কেশগুচ্ছ..
বেঙ্গল কেমিক্যালের
ক্যান্থারাইডিন হেয়ার অয়েল
কেশমূল সতেজ রাখে ও কেশের শ্রী বৃদ্ধি করে
বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা·বোম্বাই·কানপুর

শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে
বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত
আধুনিক বাংলা কবিতা
আধুনিক বাংলা কবিতার শ্রেষ্ঠ সংগ্রহ। প্রায় ৬০ জন কবির শ্রেষ্ঠ কবিতার সঞ্চয়ন। মূল্য ৫৲

*

সুধীরচন্দ্র সরকার সম্পাদিত
কথাগুচ্ছ
গল্প সংগ্রহের ঐতিহাসিক ও অবিস্মরণীয় প্রকাশ। তৃতীয় সং। মূল্য ৭৲

*

রাজশেখর বসু
বাল্মীকি রামায়ণ ৬॥০
কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস কৃত মহাভারত ১০৲

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়
এই মর্তভূমি ৩॥০

বিমল মিত্রের
ছাই ৪৲

সুবোধ ঘোষের
জতুগৃহ ৩॥০
গঙ্গোত্রী ৪৲
তিলাঞ্জলী ৪৲
ফসিল ২॥০

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের
প্রাগৈতিহাসিক ২॥০

অন্নদাশঙ্কর রায়ের
নতুন করে বাঁচা ১৷৹
পথে প্রবাসে ৩॥০

এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিঃ
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট : কলিকাতা ১২

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়ের
কবিতার বই
অবতামসী, আবার রাত্রি

উপহারের উপযোগী সুন্দর বাঁধাই ও মনোহর প্রচ্ছদ। দাম দু' টাকা।

কবিতাভবন
২০২, রাসবিহারী এভিনিউ,
কলকাতা ২৯

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত
নতুন কবিতার বই
স্বর ও অন্যান্য কবিতা ১॥০

প্রবন্ধের বই
সময় ও সাহিত্য ৩৲

*

আনন্দ বাগচীর
প্রথম কবিতার বই
স্বগত সন্ধ্যা ১॥০

সম্প্রতি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে
সপ্তম খণ্ড
পঞ্চদশ খণ্ড
ষোড়শ খণ্ড

রবীন্দ্র রচনাবলী

মোট এই খণ্ডগুলি বর্তমানে পাওয়া যায়—

ক. কাগজের মলাট সংস্করণ। প্রতি খণ্ডের মূল্য আট টাকা—
১ ৭ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩
১৪ ১৫ ১৬ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬

খ. সাধারণ কাগজে ছাপা, রেক্সিনে বাঁধাই। প্রতি খণ্ডের মূল্য এগারো টাকা—
১ ৭ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩
১৪ ১৫ ১৬ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬

গ. মোটা কাগজে ছাপা, রেক্সিনে বাঁধাই। প্রতি খণ্ডের মূল্য বারো টাকা—
৭ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫
১৬ ২১ ২২

রবীন্দ্র-রচনাবলী পাবার সহজ উপায়॥ আপনি কোন্ কোন্ খণ্ড সংগ্রহ করেছেন বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগে (৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা ৭) চিঠি লিখে তা জানিয়ে, স্থায়ী গ্রাহক হয়ে থাকা। ক খ গ কোন্ রকমের বই আগে কিনেছেন তা জানালে সেই রকম বই দেবার চেষ্টা করা হবে। কোনো খণ্ড প্রকাশিত বা পুনর্মুদ্রিত হলেই গ্রাহকদের চিঠি লিখে জানানো হয়। গ্রাহক হবার জন্য অনুরোধপত্রই যথেষ্ট, কোনো দক্ষিণা বা অগ্রিম মূল্য জমা দিতে হয় না।

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়. ২ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলকাতা

কবিতা-র বিশেষ সংখ্যার সূচী

বৈশাখ, ১৩৪৫ : (প্রবন্ধ সংখ্যা)

১. সাহিত্যের স্বরূপ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২. কবিতার কথা : জীবনানন্দ দাস। ৩. বাংলা মিলের দুরূহ তত্ত্ব : অজিত দত্ত। ৪. বাংলা কবিতা : সমর সেন। ৫. স্বগত : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। ৬. কাব্যের বিপ্লব ও বিপ্লবের কাব্য : আবু সয়ীদ আইয়ুব। ৭. কবি ও তার সমাজ : বুদ্ধদেব বসু। ৮. সম্পাদক-সমীপে : বিষ্ণু দে। ৯. আধুনিক বাংলা কবিতা : লীলাময় রায়। ১০. কবিতার অনুবাদ : হমফ্রি হাউস। ১১. কবিতা ও অনুবাদ : হুমায়ুন কবির॥ (পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৪)

কার্তিক, ১৩৪৭ : (প্রবন্ধ সংখ্যা)

১. আধুনিক বাংলা কবিতা (বিখ্যাত সংগ্রহগ্রন্থের সুদীর্ঘ আলোচনা) : অতুলচন্দ্র গুপ্ত। ২. রবীন্দ্র-রচনাবলী (৪র্থ খণ্ড, নদী, চিত্রা, বিদায় অভিশাপ, মালিনী, বৈকুণ্ঠের খাতা, প্রজাপতির নির্বন্ধ, ভারতবর্ষ ও চারিত্র পূজার আলোচনা) : বুদ্ধদেব বসু। ৩. ঝর্ণাছন্দের কাব্য (সমর সেনের ‘গ্রহণ’ কাব্যগ্রন্থের দীর্ঘ আলোচনা) : অমিয় চক্রবর্তী। ৪. প্রেমেন্দ্র মিত্রের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ (‘সম্রাটের’ আলোচনা) : সমর সেন, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। ৫. নতুন বই (রবীন্দ্রনাথের ‘ছেলেবেলা’) : বুদ্ধদেব বসু॥ (পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬০)

আষাঢ়, ১৩৪৮ : (রবীন্দ্রসংখ্যা)

১. সাহিত্য-বিচার : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২. রবিকাকার গান : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৩. রবীন্দ্রপরিচয় : প্রমথ চৌধুরী। ৪. পূর্বস্মৃতি : ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী। ৫. আমাদের ছাত্রাবস্থা ও রবীন্দ্রনাথ : অতুলচন্দ্র গুপ্ত। ৬. বাক্‌পতি রবীন্দ্রনাথ : সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। ৭. রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি : ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ৮. রবীন্দ্র-উপন্যাসের ভূমিকা : নীহাররঞ্জন রায়। ৯. রবীন্দ্রনাথের ছবি : যামিনী রায়। ১০. ভবিষ্যতের রবীন্দ্রনাথ : প্রমথনাথ বিশী। ১১. রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি : অমিয় চক্রবর্তী। ১২. রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবন : অন্নদাশঙ্কর রায়। ১৩. রবীন্দ্রনাথ ও মানবধর্ম : হুমায়ুন কবির। ১৪. রবীন্দ্রকাব্যের দৃশ্যপট : বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ১৫. রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প : জ্যোতির্ময় রায়। ১৬. রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতা : দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। ১৭. রবীন্দ্রনাথের ছন্দ : অজিত দত্ত। ১৮. রবীন্দ্রনাথের নাটক : প্রভু গুহ ঠাকুরতা। ১৯. সুরকার রবীন্দ্রনাথ : হিমাংশুকুমার দত্ত। ২০. রবীন্দ্রনাথের গান : বুদ্ধদেব বসু। ২১. আরোগ্য (কবিতা) সুধীরচন্দ্র কর। ২২. রবীন্দ্রনাথ (কবিতা) : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ২৩. রবীন্দ্রনাথের নতুন বই (রোগশয্যায়, আরোগ্য : বুদ্ধদেব বসু। তিনসঙ্গী : জ্যোতির্ময় রায়)। ২৪. সাহিত্যের মূল্য : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর॥ (পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১৬)

(এই সংখ্যাগুলির পুনর্মুদ্রণ প্রয়োজন)

কবিতা

পৌষ ১৩৬০

অষ্টাদশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা

ক্রমিক সংখ্যা ৭৬

ফনের দিবাস্বপ্ন

(মালার্মে-র ফরাসী অবলম্বনে)

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

ওই অপ্সরীরা, মন চায় ওদের চিরায়ু দিতে॥

কী স্বচ্ছ ওদের কান্তি, আবহের পুঞ্জিত গ্লানিতে
ভাসে যেন উর্ণাজাল॥

ভালোবেসেছিলুম তবে কি
স্বপ্নকেই ?

প্রর্তক, প্রাক্তন রাত্রি, সাঙ্গপ্রায়, দেখি,
সূক্ষ্ম শাখা-প্রশাখায়, অবশিষ্ট বাস্তব বনানী
জানায় নির্জনে যাকে জয়শ্রীর অর্ঘ ব’লে মানি,
তার আখ্যা অনুরাগ গোলাপের স্বভাবদোষেই॥

তবু ধরো……

সে-বরকিশোরীদের পরিচয় এই
হয় যদি যে তারা তোমারই ইন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞান
পরিণত সচিত্র পুরাণে ! বিনির্গত ওই ধ্যান
আপাতকুমারী প্রথমার, সাশ্রু নির্ঝরের মতো,
ইন্দ্রনীল, হিম নেত্র থেকে : পক্ষান্তরে ক্রমাগত

দীর্ঘশ্বাসে দ্বিতীয়া কি স্মরণে আনে না দ্বিপ্রহরে
উত্তপ্ত হাওয়ার স্পর্শ রোমশ শরীরে ! কিন্তু জ্বরে
মূর্ছাপন্ন স্নিগ্ধ অহনার পরাবর্তী চেতনাকে
পিষে পিষে মারে যে-নিস্তব্ধ অবসাদ, সে-বিপাকে
আমার বাঁশিই শুষ্ক কুঞ্জে দ্রব সুর ঢালে ; আর
একমাত্র বায়ু রেখারিক্ত চক্রবালে প্রেরণার
প্রকট, কপট, শান্ত প্রাণ যা আমার বেণুরবে
প্রত্যুৎপন্ন, পরিকীর্ণ নির্জলা বৃষ্টিতে, তথা নভে
অধুনা পুনরারূঢ় ॥

সিসিলির নিস্তরঙ্গ হ্রদ
যার তটে তটে আমি সবিতার প্রতিযোগা মদ
ধর্ষণে করেছি ব্যয়, হতবাক্ তুমি বিকসিত
স্ফুলিঙ্গের নিচে, বলো—"এখানেই ছিলুম ব্যাপৃত
"আমি প্রতিভাপালিত কাঁপা নল কাটায়, যখন
"দূরের শ্যামল উৎসে সমর্পিত দ্রাক্ষার হিরণ
"জন্তনিভ শুভ্রতার অবিচল ঊর্মিতে উতলা
"হয়েছিল আচম্বিতে : কিন্তু যেই বাঁশরীর গলা
"ফুটেছিল বিলম্বিত আলাপে, অমনই পাখসাটে
"মরালের ঝাঁক শূন্যে মিশে গিয়েছিল, না বিরাটে
"জলকন্যকারা ফিরেছিল ডুবসাঁতারেই......"

জলে
জড়জগৎ প্রখর প্রহরের তাম্র তাপে : স্থলে,
জলে, অন্তরীক্ষে অপর্যাপ্ত সেই কৌমার্যের লেশ
নেই, এমনকি নেই শিল্পসার সে-বড়্জের রেশ,
যার অনুসন্ধানেই পলাতকাদের রূপকার
হারিয়ে ফেলেছে আজ ; আদি উন্মাদনায় আবার

নিজেকে জাগিয়ে তবে, পুরাতন আলোকের বানে
দাঁড়াব একেলা, ঋজু, হে পদ্মিনী, অপাপের ভানে
তোমাদেরই অন্যতম ॥

যে-মূক চুম্বনে থেমে যায়
অম্ললাপী অধরের প্রলাপরটনা, স্বস্তি পায়
বিশ্বাসহন্ত্রীরা, ততোধিক রহস্যনিগূঢ় ক্ষত—
অমর্ত্য দন্তের সাক্ষ্য—অথচ আমার অনাহত
বক্ষে স্বাক্ষরিত ; কিন্তু থাক বাক্যব্যয় ! সমুদার
যুগল বেতসই শুধু হেন মন্ত্রগুপ্তির আধার :
বিবিক্তির মর্মবাণী, পরিণত তারই দীর্ঘ সুরে,
নীলিমাকে স্বধর্ম ভোলায় ; প্রতিবেশে যায় ঘুরে
রূপসীর মাথা, আত্মগত সঙ্গীতের নায়িকা সে
ভাবে আপনাকে, যদিও প্রকৃতপক্ষে, প্রতিভাসে
প্রত্যঙ্গ ঊরুর কিম্বা পৃষ্ঠাদির রূপান্তর ক'রে,
বিশ্রম্ভের আস্থায়ী-অন্তরা যেমন অমর ম'রে,
তাকে মেনে সার্থক তেমনই একতাল ওঙ্কারের
প্রতিধ্বনিপ্রহত অভাব ॥

তবে ফুটে ওঠো ফের,
হে যন্ত্রস্থ পলায়ন, পিশুন সিরিংস্, পুনরায়
স্ফূর্তির প্রয়াস পাও ইতস্তত বিতত জলায়
যেথা তুমি আমারই প্রতীক্ষা-রত ! আমি জনরবে
অলজ্জিত, কাটাব অমেয় কাল দেবীদের স্তবে ;
কৃতবিদ্য প্রতিমাপূজায়, একাধিক বৈদেহীর
মেখলা খসাব : যেমন সন্তাপ ভুলে আমদির

বিবর্তবাদেই, আঙুরের শোণিতপ্রসাদ ত্বকে
ফুৎকার ভরেছি, এবং প্রচুর হেসে, অপলকে,
মাতাল তৃষ্ণায়, সারা বেলা তাকিয়ে থেকেছি, তুলে
ধ'রে মহাকাশে ভাস্বর নির্মোক ॥

স্মৃতির পুতুলে

এসো, হে অপ্সরীবৃন্দ, প্রাণবায়ু ফুঁকি। "নলবন
"চিরে চিরে, আমার চাহনি বিঁধেছিল অতুলন
"তাদের গ্রীবায় যার জ্বালানিবারণে দিগ্বধূর
"দল ঝাঁপ দিয়েছিল লহরীতে, নির্লিপ্ত, নিষ্ঠুর
"শূন্যে আরণ্যক আর্তনাদ হেনে; এবং অচিরে
"কুন্তলের মুক্ত ধারা হীরকের মথিত মির্মিরে
"বিভাব হারিয়েছিল! আমি ছুটেছিলুম সে-দিকে;
"কিন্তু পা, উচট লেগে, থেমেছিল যেখানে, সখীকে
"বাহুক্ষেপে বেঁধে, সখী (সম্ভাবিত অনৈক্যে আহত)
"অঘোরে ঘুমিয়েছিল। আমিনি বিয়োগ করগত
"সে-অদ্বৈতে; ছায়াবিড়ম্বিত এই গোলাপবিতানে
"নিয়ে এসেছিলুম তাদের, যাতে দিনেশের টানে
"বীতগন্ধ ফুলের মতোই, আমাদের উচ্ছ্বসিত
"রতিপরিমল উবে যায় দিবাশেষে"। বলাৎকৃত
কুমারীর ক্রোধ, উলঙ্গিনী উন্মত্ত রভসে শুচি,
পিপাসিত অধরের তপ্ত স্পর্শে যেন বররুচি
বিদ্যুতের স্খলিত বিলাস ভালোবাসি, ভালোবাসি
আমি আতঙ্কের সংবৃতি শরীরে—হোক তা উদাসী
প্রথমার পদান্তে বা দ্বিতীয়ার দুরুদুরু বুকে:
উভয়ে সমান তারা নষ্ট অনভিজ্ঞার অসুখে,

একজন আত্মহারা যদিচ ক্রন্দনে ও অপরে
মাত্র বাষ্পাকুল। "আমার মহাপরাধ, দৈব বরে
"যে-চুম্বন একাকার তথা আলুথালু, জয়োল্লাসে—
"যেহেতু তাদের ভয় ভেঙেছিল আমারই প্রয়াসে—
"সে-সহযোগের জোট আমি চেয়েছিলুম ছাড়াতে।
"কারণ উদ্দীপ্তকাম জ্যেষ্ঠার সংক্রাম কনিষ্ঠাতে
"দেখা দূরে থাক, অগ্রবর্তিনীর গভীর আহ্লাদে
"যেই নিবাতে গেলুম আমার দীপক হাসি, সাধে
"আর সাধ্যে তৎক্ষণাৎ বিবাদ বাধাল বিধি: শ্বেত
"পালকের মতো অলজ্জ, সরল অনুজা সঙ্কেত
"থেকে পলাল সে-সুযোগে, আমার অঙ্গুলি ছিনিয়ে;
"সঙ্গে সঙ্গে, গদ্গদ নির্বন্ধে কান পর্যন্ত না দিয়ে,
"কৃতঘ্ন শিকার খণ্ডাল শিথিল কণ্ঠাশ্লেষ" ॥

যাক

যা যাবার; অনাগত সুন্দরীরা ভরাবে এ-ফাঁক,
জড়িয়ে আমার শৃঙ্গে কেশপাশ, আরামে তরাবে:
স্বসমুখ আদিরসে অলিদের মুখর করাবে
আমার বাসনা—স্ফুট, নীলারুণ, সুপক্ক ডালিম;
এবং যে-পরিপ্লুতি আমাদের শিরায় রক্তিম,
তার নিত্য নির্বিশেষে ধার্য নয় কে বসন্তসেনা।
কুঞ্জকে ছোপায় যবে ধূসরিত গোধূলির হেনা,
তোমার উৎসব, এট্না, নির্বাপিত পাতায় পাতায়
অন্তরিত হয় সে-সময়ে, আসে অমায়িক পায়
স্বয়ং ভীনাস্, পেরিয়ে লাভার প্রস্থ, অকস্মাৎ
নীরবের বজ্রনাদে ঘটে খিন্ন বহ্নির নিপাত।
ধরি ভুজে অপ্সরীরাজ্ঞীকে ॥

হা, শান্তি অনপনেয়......

কিন্তু বাক্যবিমুক্ত হৃদয়, তথা গুরুভার দেহ
হার মানে শেষে মধ্যাহ্নের উদ্ধত মৌনের কাছে :
আর নয় দেবনিন্দা ; স্মরণের আনাচে কানাচে
তন্দ্রা জমে ; পাতি শয্যা তবে রুক্ষ বালুতে এ-বার,
এবং সুরার জন্মপত্রে যে-গ্রহ প্রবল, তার
নিচে শুই, যথারীতি মুখ খুলে !

যমলা, বিদায় !
আমাকে সে-ছায়া ডাকে, তোমাদের লুপ্তি যে-দ্বিধায় ॥

ভাষ্য

অর্ধছাগ, অর্ধদেবতা, রোমক পুরাণের ফন্, ভারতীয় কিন্নরদের মতোই সঙ্গীতবিলাসী। কিন্তু তারা গায়ক নয়, বেণুবাদক ; এবং হয়তো তাই, যেমন আমাদের মুরলীধর, তারাও তেমনই লাম্পট্যের প্রতিমূর্তি। কারণ তাদের অগ্রনায়ক প্যান্-এর অনুধাবন থেকে বাঁচার অন্য পথ না পেয়ে, সিরিংস্-নামক অপ্সরী একদা বেতসের রূপ ধরেছিল ; এবং উক্ত নলেই ফন্-সম্রাটের প্রথম বাঁশি নির্মিত। অবশ্য মালার্মে-র মৃত্যু মনোবিকলনের প্রাগ্বর্তী। তাহলেও অলোকসামান্য অনুব্যবসায়ের আশীর্বাদে তিনি প্রায় এক শতাব্দী আগে—যখন তাঁর বয়স ছিল পঁচিশের নিচে, তখনই—অনুমান করেছিলেন যে সৌন্দর্যবোধ রিরংসার উদ্‌গতিমাত্র ; এবং সেই জন্যে ফন্-এর দিবাস্বপ্নে প্রত্যক্ষ উরু ও পৃষ্ঠ ধ্বনিসর্বস্ব কবিতার একতাল ওঙ্কারে পরিণত। নন্দনতত্ত্বের আর কোনও ব্যাখ্যায় আস্থা রাখলে, শোণিত আঙুরের নির্মোকে

ফুৎকার ভ'রে সারাদিন সে-ভাস্বর গুচ্ছের দিকে তাকিয়ে, তৃষ্ণানিবারণ তার সাধ্যে কুলত না ; এবং বৌদ্ধ না হয়েও, সে কায়মনোবাক্যে মন্ময় শূন্যবাদ মেনে নিয়েছিল ব'লেই, সন্ধ্যার তন্দ্রাবেশেও তার আত্মশ্লাঘা ফুরয়নি, তার সর্বশক্তিমান অহঙ্কারের অগ্নিগিরি ভীনাস্-কে গ'ড়ে, আবার আপনার বজ্রনির্ঘোষ মৌনে তলিয়ে গিয়েছিল। নায়িকাযুগলের প্রসঙ্গেও অনুরূপ মন্তব্য সম্ভব ; এবং পৃথক ভাবে তাদের মধ্যে বাঁশরী ও প্রেরণা, বেদনা ও ভাবনা, ইত্যাদির যোগাযোগ দেখি বা না-দেখি, প্রাকৃত অদ্বৈতের ব্যবচ্ছেদই নায়কের স্বীকৃত মহাপরাধ।

পক্ষান্তরে মালার্মে প্রতীকী কাব্যের পুরোধা ; এবং প্রতীকের সঙ্গে রূপকের প্রভেদ আকাশ-পাতালের চেয়েও বেশী। অর্থাৎ প্রতীক স্বতঃসিদ্ধ রূপের কৈবল্য আর রূপক ময়ূরপুচ্ছধারী দাঁড়কাক ; এবং মালার্মে কবিতাকে রিক্তগর্ভ সঙ্গীতের মর্যাদা দিয়েই থামেননি, পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতের বিশেষ বর্ণমালা কাব্যরচনায় অনুকরণীয় নয় ব'লে, তিনি একাধিক বার আক্ষেপ করেছিলেন। উপরন্তু তিনি জানতেন যে সমসাময়িকদের মধ্যে তিনিই একমাত্র খাঁটী কবি ; এবং আজীবন তিনি যেহেতু অধ্যাপনার দ্বারা অগত্যা গ্রাসাচ্ছাদনের দাবি মিটিয়েছিলেন, তাই বোধহয় লোকশিক্ষার নামে তাঁর গায়ে জ্বর আসত। অবশ্য গদ্য টীকায় কবিতার মর্মোদ্‌ঘাটন যে পাপের পরাকাষ্ঠা, এ-বিশ্বাস তাঁর নয়, তাঁর স্বনামধন্য শিষ্য ভালেরি-র। কিন্তু তাঁর কাব্য নিকামত রহস্যঘন ; এবং সেই প্রাণস্বরূপ রহস্যের রক্ষায় তাঁর জটিল চিত্রকল্প অবিচ্ছেদ্য, তাঁরা ভাষা ব্যঞ্জনামূলক শব্দের ধাতুগত প্রয়োগে দুরূহ, তাঁর অভিপ্রায়, ব্যাকরণ মানলেও, অন্বয়ের শাসন মুক্ত। তৎসত্ত্বেও মনে রাখা দরকার যে অন্তত প্রথম সংস্করণে "ফন্-এর দিবাস্বপ্ন" আবৃত্তির জন্যে লিখিত ; এবং জীবদ্দশায় সে-সাধ পূরতে না পেরে, কবি যদিও নিরন্তর সংশোধনে অভিনেয় কাহিনীকে শেষ পর্যন্ত ধ্যেয় স্বগতোক্তির পর্যায়ে তুলেছিলেন, তবু যে-বৈনাশিক এ-নাটকের মুখ্য পাত্র, তার অনন্য নির্ভর ঘটনাপরম্পরা, অথবা ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ—উজ্জ্বল ও অবশ্যস্বীকার্য হলেও, প্রতীক, যার ও-দিকে অনিশ্চয় আর এ-দিকে বেদনাপ্রভব কল্পনা।

অন্ততপক্ষে আমরা যারা দর্শক, উত্তম পুরুষের অন্তরলোকে আমাদের প্রবেশ স্বভাবত নিষিদ্ধ; এবং তার হাব-ভাবে দৃষ্টি রেখে, তথা উক্তিতে কান পেতে যত রকম বিবরণ লেখা সম্ভব, তার একটা এই: ফন্‌-দের শ্রীক্ষেত্র সিসিলি-র এক উপবনে একজন মধ্যবয়সী ফন্‌, মধ্যাহ্ননিদ্রায় বিভোর হয়ে, দেখছিল অপ্সরীধর্ষণের সুখস্বপ্ন, কিন্তু দিনের তাপ বাড়তে, সে আর ঘুমতে পারলে না; এবং জাগতেই, তার চক্ষে পড়ল শূন্য কুঞ্জের বাস্তব ডাল-পালা। তখন যদিও না-মেনে উপায় রইল না যে তন্দ্রা আসার আগে পারিপার্শ্বিক গোলাপের গন্ধ তার মানসে যে আমোদ জাগিয়েছিল, তাতেই ফুটে উঠেছিল স্বপ্নাস্ত বরমাল্যের আকাশকুসুম, তবু কল্পনাবিলাসকে একেবারে অসার বলতে তার আত্মরতিতে বাধল; এবং ফলে, উৎপ্রেক্ষার চরমে পৌঁছে, সে ভাবতে চাইলে যে নিকটে কোনও নির্ঝরের শব্দ, বা শরীরে হাওয়ার তপ্ত স্পর্শ, নায়িকাযুগলকে মনে আনেনি, বরঞ্চ তাদের ভাবানুষঙ্গেই জলকল্লোল ও বায়ুহিল্লোলের উৎপত্তি। কিন্তু এ-বিশ্বাসও টিকল না—আবার চোখ মেলতেই, বোঝা গেল যে, সুন্দরীদ্বয় দূরে থাক, তার প্রতিবেশে জল হাওয়ার চিহ্নও নেই, রুক্ষ নাস্তিতে অভিব্যাপ্ত শুধু বাঁশির দ্রব সুর আর বাদকের দিব্য প্রেরণা, যা, কামিনী কেন, অপ্‌ ও মরুতের মতো আদিভূতেরও উদ্ভাবক। এমনকি অমায়িক জেনে, দিগন্তের রৌদ্রবিকচ হ্রদে তাকাতেও ভেসে উঠল কেবল অভিজ্ঞান; এবং সঙ্গে সঙ্গে অতলে তলাল সত্য-মিথ্যার ব্যাবহারিক ব্যবর্ত।

কারণ সে যেমন না মেনে পারলে না যে সে আদ্যন্ত একা, তেমনই বুকে দংশনের দাগকেও তার অস্বীকার্য ঠেকল; এবং তার পরে সে বুঝলে যে উভয় উপলব্ধি কার্য-কারণের সূত্রে সম্বদ্ধ। অর্থাৎ শিল্পসামগ্রী ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার নৈর্ব্যক্তিক অভিব্যক্তি; এবং যে-নির্মম অনুপ্রাণনায় রূপকারমাত্রেই নিঃস্ব, তাতে সম্ভবত প্যান্‌-প্রপীড়িত সিরিংস্‌-এর অবরোহী অভিসম্পাত সক্রিয়। কিন্তু প্রকৃতির পরিহাস এমনই নিষ্ঠুর যে উক্ত আত্মবলিদানের দুঃখ প্রতিহিংসাপরায়ণ সিরিংস্‌-কেই নিবেদ্য; এবং হয়তো তাই, মুখে মাইডাস্‌-এর নাম না আনলেও, নায়ক ইঙ্গিতে সে হতভাগ্যের উল্লেখ করেছে।

অবশ্য ফ্রিজিয়া-রাজ, প্যান্‌-অ্যাপলো-র সঙ্গীতপ্রতিযোগে প্রথমের প্রতি পক্ষপাত দেখিয়ে, শেষোক্তের শাপে যে লম্বকর্ণ হয়েছিলেন, তা তিনি নিজে রটাননি; এবং তাঁর নাপিত সে কথা শুনিয়েছিল কেবল মাটিকে। কিন্তু যত্নে বোজানো গর্তে ফুটে উঠেছিল বেতস; এবং হাওয়ার দৌত্যে রাজার লজ্জা পৌঁছেছিল প্রজার কানে। অতএব লোকাপবাদখণ্ডনের ব্যর্থ চেষ্টায় সময় না কাটিয়ে, ফন্‌ অতঃপর মন দিলে মানসীদের প্রকাশ্য বস্ত্রহরণে, এবং যখন বলাৎকারের সুযোগ এল, তখনও সে শিকারসমেত বনান্তরালে লুকল না, সাক্ষী ডাকলে দ্বিপ্রহরের সূর্যকে। সেই অবৈকল্য সত্ত্বেও, চূড়ান্ত সিদ্ধি কেন তার ভাগ্যে জুটল না, সে-প্রশ্নের উত্তর সে আপনার মধ্যেই পেলে; এবং মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্তকল্পে যে-সোহংবাদে শেষ পর্যন্ত সে চোখ বুজলে, তার ভাষ্য লিখে গেছেন শঙ্করাচার্য।

অবশ্য অদ্বৈতবাদে মালার্মে-র গুরু শঙ্কর নন, হেগেল্‌। কিন্তু অনেকে যেমন ভাবেন যে শঙ্কর প্রচ্ছন্ন বৈনাশিক, তেমনই হেগেল্‌-এর বিচারে বিশুদ্ধ সত্তা আর নির্বিকার নাস্তি তুল্যমূল্য; এবং তাঁর শিষ্য মালার্মে-র কাছেও তাই একর্ষির হিরণ্ময় পাত্র মোহময়। তবে ক্রোচেও হেগেল্‌পন্থী; এবং তিনি ভাব ও ভাষার প্রভেদ মানেননি। সুতরাং "ফন্‌-এর দিবাস্বপ্ন"-এ ঈশোপনিষদের রহস্যারোপ হাস্যকর; এবং হয়তো তার চেয়েও বেশী পণ্ডশ্রম উক্ত ফরাসী কবিতার বঙ্গানুবাদ। কারণ কবি হিসাবে মালার্মে শুধু বিভিন্ন এমনকি বিপরীত আবেগের আস্রবণ, অথবা অস্‌মোসিস্‌, ঘটিয়েই ক্ষান্ত নন, তাঁর নিরবচ্ছিন্ন চিত্রকল্প যে-রকম বহুলাঙ্গ বাক্যের মুখাপেক্ষী, তার অনুকরণ স্বভাবনিগ্রহ বাংলায় একেবারে অসম্ভব; এবং স্বয়ং অল্‌ডাস্‌ হাক্‌স্‌লি বর্তমান কবিতার ইংরেজী তর্জমায় ও পরিবর্জন পরিবর্তন—এ-দুটো দোষের কোনওটা এড়িয়ে যেতে পারেননি। অবশ্য রজার ফ্রাই-এর অনুবাদ আক্ষরিক। কিন্তু শাল্‌ মোরঁ-র টীকাব্যাতিরেকে তা প্রায় অবোধ্য; এবং মোরঁ আর মালার্মে-র শ্রেষ্ঠ জীবনীকার আঁরি মঁদর-এর মধ্যে একমাত্র যোগসূত্র বোধহয় অবিমিশ্র সমালোচনার প্রবর্তক আল্‌বের তিবোদে-র প্রতি তাঁদের গভীর অবজ্ঞা, যদিও গুরুভক্ত ভালেরি আবার শেষোক্তের পৃষ্ঠপোষক। পক্ষান্তরে,

প্রতীক ব'লেই, মালার্মে-র কাব্য সম্পর্কে নানা মুনির নানা মত অনিবার্য, এবং তিনি কার্যতও দেখিয়ে গেছেন যে কবির সঙ্গে যে-ফুলের কারবার তার বর্ণ নেই, গন্ধ নেই, আকার নেই, আছে কেবল প্লেটো-পরিকল্পিত রূপ।

পাগলা জগাইয়ের গান

অমিয় চক্রবর্তী

"স্পষ্ট বেসুরে একা বসে গান গাই
ক্ষুব্ধ তানসেনি তানে তা-না-না-না,
কেননা প্রত্যক্ষ দেখতে পাই
(তোমরাও দেখো, নয় তো চক্ষু কানা)
গানের বক্তব্য প্রধানত আজ
চতুর্দিকের সঙ্গে বিদ্রোহ ;
পুরোনো সাম্রাজ্যের বরকন্দাজ
যখন নতুন মন্ত্রীর সমারোহ
স্বাধীন স্বদেশের বুকে গুলি চালিয়ে
বাদামী ধনিকের তন্ত্রে রাখে বজায়,
একটু স'রে এসে (দূরে পালিয়ে)
খানিকক্ষণ অন্তত থাকি মজায় ;
প্রসিদ্ধ ঘরানা এখনো আছে জানা
তাই দিয়ে গাই তা-না, না, না ॥

"ত্যাগরাজ বা নতুন যদু ভট্টের
শাক্‌রেৎ না হয়েও ক্লিষ্ট প্রাণে
যেটুকু ঠাট আছে তাতে শঠ্যের
উত্তর দিতে পারি খরতানে।
যদিও কণ্ঠ যায় ভিমিতে শুকিয়ে
ভাঙা বাংলার কথা ভেবে ভেবে :
সীমান্তের নদীপেরিয়ে রোজ লুকিয়ে
পাসপোর্ট-হারা দল আসে নেবে,

ষ্টীমারে রাস্তায় হা-ঘরে হয় মরে,
কলকাতার শান-বাঁধা ফুটপাথে
অন্তিম অধিবাসী ঘুরে পড়ে
মোটর বিলাসীর আস্তানাতে—
তখন কালো-বাজারির রক্তচোখ দিলে হানা
নির্লজ্জে গাই তা—না—না—না ॥

"যে-আশ্চর্য দেশে সুথনীল শরতে
আপনিই সানাই বাজে আকাশে
তারি শুকনো মাটিতে, শূন্যের পরতে-পরতে
ভিখারীর কান্না জাগে বাতাসে।
ভিক্টোরিয়া মেমরিয়াল একদিকে
অন্যত্র দেখো কালিঘাট :
রুচির ধর্মের মোক্ষ নাও শিখে
স্বয়ং স্বর্গীয় বুকে কবাট।
অথচ কোটি লোক তারি মধ্যে হাঁটে
একটিও কথা কয় না বিরোধে,
ধার্মিক তিলক কাটে ললাটে
অধার্মিক এড়িয়ে চক্ষু মোদে ;
বলির নরস্ব-বধ চলেছে একটানা
ঊর্ধ্বে তাই মাথা নেড়ে বলি তানানানা ॥

"এমন সময় যারা স্বভাবত
রচত কবি-গান, দোহা, হেঁয়ালি
নিতান্ত অস্তিত্ব সুখের অভাবত
নিভেছে তাদের বাক্য-দেয়ালি।

ময়নামতীর সেই দূর কাহিনী
নব্যের ঘরে ঘরে ফিরে মেশানো,
বৈদিকে আধুনিকে প্রাণবাহিনী
সুফি-বৈষ্ণবী গেঁথে মন নেশানো
ছিল আমাদেরো গান-বাঁধা দখলে ;
নতুন দুনিয়ার আলো নিয়ে বাঁচি,
তবু ভাঙা তবলা বাজিয়ে দেখ সকলে
মরিয়া হ'য়ে জানাই বেঁচে আছি—
অন্তত সামনে এলে দৈবজ্ঞ জাত-মানা
তুড়ি দিয়ে গাই তা—না, তা-না-না-না ॥

"তারো বেশি, দল বাঁধতে নাচতে জানি,
মূর্হার রাজ্য পেরোই কিম্বদন্তী ;
চীন-পশ্চিম-আফ্রিকার তাজা বাণী
দ্রিম দ্রিম বাজাই বৈজয়ন্তী—
গান্ধীর শান্তি-অক্ষৌহিণী মন্ত্রে
রুধি বোমার দুর্বল উপাসক,
অখণ্ড হিন্দ্-পাকিস্তানি যোগ তন্ত্রে
ঠেকাই সাম্প্রদায়ী ভিন্নের পোষক।
এসো যোগ দাও জগাইয়ের যাত্রায়
আউল বাউল কীর্তনী কোরানি;
নরোত্তম পালায় মাতো অতি মাত্রায়
মূর্খ ভক্তের মাথা-ঘোরানি—
জাগিয়ে পাড়া জগা পাড়ি দেবে অঠিকানা
ততক্ষণ ঠারে ঠোরে গায় না-তা, না-তা, তানানানা ॥"

যামিনী রায়ের এক ছবি

(পটলের জন্য)

বিষ্ণু দে

কেবলই কি লয় কাটে? জাগে মরণের মরুভূমি?
মাথার রুপায় ঢাকে হৃদয়ের সূর্যঘটে সোনা?
সদা ভয় কে যে যায় সে কি আমি অথবা সে তুমি,
তাই রাত্রি হিরণ্ময় তাই দিনগুলি জোড়ে বোনা?

আকাঙ্ক্ষার সূর্যোদয়ে মেলে না কি সন্ধ্যার আরতি?
তোমার আমার গানে প্রেম-মৃত্যু বিবাদী মূর্ছনা
একাকার, কৈলাসে যেমন এক উমা আর সতী—

এ দ্বন্দ্ব ব্যাপ্ত যে সারা জীবনেই, গঙ্গা আর গোবি।
চোখে কানে ভ'রে দেয় ঘ্রাণে-ঘ্রাণে প্রকৃতি সুন্দর,
অথচ সমাজে জীর্ণ স্ববিরোধে অপ্রাকৃত ক্ষতি,
অথচ কুৎসিত গ্রাম শহরের জীবন বর্বর!
প্রকৃতি বৃথাই গায়, মানুষের ক্ষোভের নির্ঝর
চোখের ধূসরে আঁকে যামিনী রায়ের এক ছবি।

ত্রিকালের তিনতালে গড়ো তুমি একটি ভৈরবী।

প্রাণশিল্প

যুগান্তর চক্রবর্তী

খোঁপায় দেবো কী ফুলটি
—শিমুল, শিমুল, শিমুলটি,
কালোয় লাল আগুন জ্বলে
কোথায় পাই এ-তুলটি!

ও মেয়ে, ও মেয়ে,
তোর এলানো চুল ঝড় হ'ল যে
হাতের তাপ পেয়ে!

সাজাই কিসে ও অঙ্গ
—তরঙ্গ সে, তরঙ্গ
অতল তার চূড়ায় নাচে
সমুদ্রের কী রঙ্গ!

ও মেয়ে, ও মেয়ে,
আমি প্রতিটি দিন স্বচ্ছ হই
সেই সাগরে নেয়ে!

অধরে দেবো যে সৌরভ
ফুলেরও নেই সে গৌরব,
কথায় কাঁপা স্বপ্নে ফোটে
তারার নীল কী উৎসব!

ও মেয়ে, ও মেয়ে,
আমি মনের সাত পাপড়ি খুলি
স্পর্শ তার পেয়ে!

মন যে দেবো, কোথায় মন
দিনের দাহে কী মন্থন,
রাত্রে তাই পাথর ভেঙে
একটি মুখ গড়ার পণ।

ও মেয়ে, ও মেয়ে,
সেই ভুবন আমি দেখি যে তোর
চোখের দিকে চেয়ে॥

ভাদ্রপদা

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

কেন আর বিলসিত কর বা হৃদয়
কেন এই করুণা বা দয়া?
যা দেবার একদিন তিক্ত ব্যথাময়
প্রেমে দিয়ে গেছি অনশয়া।

তুমি শুধু নিতে জানো দাও না কিছুই
কবে কোন্ যুগ থেকে সুরু!
আমার কী সাধ্য আছে তোমারে যে ছুঁই?
সর্বদাই বুক দুরু দুরু।

চিঠিতে কি মুছে যাবে ললাট-লেখন
আখরের স্রোতে যাবে ধুয়ে?
আমি কি জানিনে মনে তোমার এখন
শান্ত মন কী শয়নে শুয়ে?

কী চাও এ চিঠি দিয়ে, প্রণামী আবার?
মৃত দিন জাগে কি কখনো!
আমি আর মেঘ নই নিয়ে জলভার
বিদ্যুতে থাকো তুমি মগ্ন।

অভিনয় তৌর্যত্রিক : ঝড়ের আগে

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

সাজবেই বুঝি বিকেলের মেয়ে
পরদা দুলছে গ্রীন রুমের
এখনো ক'দিন দেরি আছে বুঝি মন্‌সুনের ?
জ্যৈষ্ঠ-শেষের এত উত্তাপ
পোড়ায় না আদি রক্তের পাপ
প্রথাভীরুতায় মিছে পরিতাপ
স্মরগরলের খণ্ডনের।
এখনো রয়েছে যতটুকু আলো
তা' দিয়ে বানাও অঙ্গলেপ
অঞ্জলি ভ'রে যত সোনা ধরে
আরো যতখানি উব্‌ছিয়ে পড়ে
সে-নির্ঝর
রূপ-বিলেখনে বিচিত্র জলদর্চি মেঘ
তা' দিয়ে বানাও অঙ্গলেপ
স্পন্দিত আলো অস্ত আকাশে
সগু গা-ধোয়া শ্লথ বেশ-বাসে
হানুক ঝড় ;
দিগন্তছুট ঝড়ের বেগ আনত হোক
পড়ুক অঙ্গে ইভার আদিম অভিক্ষেপ
দেহ-যষ্টির শাড়ি-বেষ্টনে উন্মীল হোক
অনন্তর।
উড়ে চ'লে গেল ডানা মেলে তার প্রয়াণ
রাখবে কি কোনো নিত্যকালীন অভিজ্ঞান

বিশদ কিংবা দুরধ্যয়
বাঁধা এ মঞ্চে মালঞ্চ মধু জাগায় ভ্রম
সে-অভিনয়—
সে অভিনয়ের যে-সব ক্রম
শুরু ক'রে দিয়ে বাঁধা-ধরা খাতে
গান গেয়ে ওঠে এ সাজঘর।

এখন যদি বা আসেই ঝড়, আসুক ঝড়, দুঃখ কী ?
এখন যদি বা ভিজে মাটি ছাড়ে ঘ্রাণাতিরেক।
তা' নিয়েই এসো বোশেখি মেঘ
তা' দিয়েই বাঁধো মেঘেলা চুল
তা' দিয়েই হানো অমিতবেগ
স্বপ্ন-স্বর।
স্পন্দিত আলো ডুবে শেষ হ'লো
বেধে গেল কী যে হুলুস্থূল
কেঁপে কেঁপে ওঠে এ-সাজঘর।

এখন তাহ'লে ঝিমানো স্নায়ুতে আসুক ঝড়
বল্‌বো তবু তো বিকেলের মেয়ে
করেছিলো কত মায়াবী সাজ
গন্ধ-ছিটানো পরদা দুলেছে গ্রীনরুমের
পাদ-প্রদীপের সম্মুখে ভেঙেছে কুমারী-লাজ।

এখন সে-সব মণ্ডপ-ভাঙা
নিবেছে সে-বাতি গ্রীন্‌রুমের
অভিনয় পালা শেষ হয় যদি
শুরু হোক লীলা মন্‌সুনের !

স্কেচ

সুস্মিতা সরকার

মেয়েরা দু হাতের আঁজলা ভরে
ক্লান্ত মুখ ধুয়ে নিলো
কান্নায় ভেঙে পড়ার মতো।
পুরুষেরা তর্জনীর আঁকশিতে
ক্লান্ত ঘাম ঝাড়লো
একটু হাঁ-করা বিরক্ত মুখে।
একটা রুগ্ন কুকুর ধুঁকতে ধুঁকতে
রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছে
স্নিগ্ধ ছায়ার কুণ্ডলীর মধ্যে।
কিন্তু ঐ অতোটুকু পাখিটার শরীরে
চলনে-বলনে একটুও ক্লান্তি নেই
ডাল থেকে ডালে উৎসাহিত পায়ে
লাফিয়ে চলেছে—
অফুরন্ত।

দুটি কবিতা

হরপ্রসাদ মিত্র

পিয়াল

বেড়াতে বেগুনি ফুল
ঘন লতা সবুজ, সজল।
ঘোলাটে আকাশে দুটি
হাত রেখে দাঁড়ালো পিয়াল।
ঘরেতে এসেছে উড়ে
প্রকৃতির অবোধ চড়ুই।
কথায় অধরা এই
সাধারণ শ্রাবণ-সকাল।

রূপকে, রেখায়, রঙে
ছিলো মনে অশেষ খেয়াল।
সহজে অশেষ কথা
বলো তুমি সবুজ পিয়াল!

জোনাকি

কালো হাওয়াময়
ভাসে নীল টিপ
ভিজে ঘাস-বন
ছুঁয়ে উড়ে যায়।
ওরা কি-যে চায়
ওরা কি-যে পায়!

এলো আকাশের
মাঠে তারাফুল।
নীচে অকারণ
নীল কুয়াশা—
জ'লে নিভে যায়।
ওরা কি-যে পায়!

ওগো ছোটো প্রাণ,
এ কি অগণন
ক্ষণ-রঞ্জন
আনো বাতাসে?
দেখো তারাফুল
হাসে কতোকাল
কালো আকাশে!

ময়ূরাক্ষী

অরুণ ভট্টাচার্য

জল দাও, জল দাও।

সমস্ত পৃথিবী ভরে দুঃস্বপ্নের অনাত্মীয় স্মৃতি
দূর মাঠে শস্যক্ষেত্রে রৌদ্রের নিষ্ঠুর ভালোবাসা
গৈরিক মাটীর গন্ধ, অতিদূর মহুয়ার বনে
কাকচক্ষু আকাশের ছায়া। তারপর
রাত্রি ভোর, শূন্য মাঠে, মাটীতে, নদীতে
একটানা বিলম্বিত স্বর:
জল দাও, জল দাও।

ওপারে নিস্তব্ধ গ্রাম, ঘরে ঘরে মানুষের ছবি,
হ্রস্ব দীর্ঘ জীবনের অন্ধকার পটভূমিকায়
দু-একটি উলুখড়, ভাদ্রের নদীর স্রোতে দুরন্ত, চঞ্চল।
তারপর, আশ্বিনের শেষে
যখন পালকমেঘ লঘুপক্ষ বাতাসের টানে
দূর থেকে দূরে ভাসে,
ইন্দ্রনীল ময়ূরাক্ষী আকাশের নিচে
স্থির হয়ে নিঃসাড়ে ঘুমায়,
তখনো গভীর রাত্রে কারা যেন সমস্বরে বলে:
জল দাও, জল দাও।

এখন প্রহর শেষ। চৈত্রের আড়ালে,
দূরান্তের রাঙামেঘ মাটীকে প্রণাম করে,
যদিও বাতাসে কার কান্নার জোয়ার।
মাঠে মাঠে ছিন্ন শাখা দুপুরের উদাস ছায়াতে,
মন্থর বসন্তসন্ধ্যা অনর্থক ঘুরে ঘুরে মরে।
বুঝি না অস্পষ্ট ভাষা, মনে হয় ক্ষীণ প্রতিধ্বনি :
জল দাও, জল দাও।

জানি না হৃদয় ভরে এতদিন কী বেদনা ছিল,
জানি না জীবনে কেন এ-তৃষ্ণার ছলছল ঢেউ
সারাদিন মনে জাগে,
ফাল্গুনের দুর্বিনীত ক্ষণে
এ কি এ উদ্দাম সুখ, শরীরে কী তৃষ্ণা অহরহ,
সমস্ত নিঃশ্বাসে যার দুরারোগ্য জরা—
দাক্ষিণ্যে সুরভিস্নিগ্ধ ফুলের প্রহার।
নদীতে চাঁদের ছায়া, পাণ্ডুর আকাশে,
ওপারের মাঠবন চাষীদের ক্ষেতের দুধারে
আষাঢ়ের স্বপ্ন ছিল, যে-স্বপ্নের অর্থ আছে জলের লেখায়,
যে-লেখা জলের দাগে কোনোদিন মুছবে না আর,
কোনোদিন মুছবে না জেনে,
তারা যেন আজো বলেছিল :

জল দাও, জল দাও ॥

বাঁচলে পরেই

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

বাঁচলে পরেই বাঁচে মনের সুর কি ?
সরাইখানার হাওয়াখানা উল্লাসে ভরপুর কি ?
অনেক দ্বিধা কাটিয়ে ওঠা, অনেক মনের দ্বন্দ্ব
জীবনসভার বিচারখানায় জমছে ভালো-মন্দ
—এমন সময় কারুর কথা পড়ছে মনে আজ কি ?

শিউলি-ফোটা সকাল আর চন্দ্রবিহীন রাত্রি
ভাবনাগুলো ফিরছে যেন ক্লান্ত বরযাত্রী।
প্রহরশেষের শেষ-সীমানায় কাঁপছে ভীরু তারা
চুকিয়ে দিলেই পৃথিবীর এই এতোদিনের ভাড়া
—ভাবছো মনে থাকলো বাকি আর কী !

থাকলো তবু অনেক কিছুই থাকলো হাসিকান্না।
থাকলো পাওয়ার থাকলো চাওয়ার নিভৃত ঘরকন্না।
জন্ম আছে মৃত্যু আছে আছে আশাভঙ্গ
জোয়ার-ভাটার অস্থিরতা দুরন্ত তরঙ্গ
—তাই তো বলি চাইলে ছুটি আজকে ছুটি পাও কি ?

অতি-পুরাতন বৃষ্টি

শামসুর রাহমান

মেঘে-ঢাকা রাত্রি নয়, ভরা দুপুরেই
যখন পরীর মতো গান গেয়ে ওরা আসে এই
বাংলার আকাশ থেকে নিচে
দিগন্তের নীলে ঘাসে দক্ষিণের শান্ত বিলে শহরের পিচে
(ওরা বৃষ্টি অতি-পুরাতন)
দূরের ধূসল পথে নেমে আসে নিমেষে যখন
আমারো প্রাণের ভাষা সুর হয়ে ঝরে
এ মাহ ভাদরে।
আবার তোমাকে পাই হৃদয়ের সৃজনী উত্তাপে :
সমস্ত শরীর হয় দীপ্ত শিখা, অন্ধকারে কাঁপে।

মেঘে-ঢাকা এই ভরা দুপুরের কাছে
হয়তো তোমার কিছু রহস্যনিবিড় কথা আছে
শুধাবার, তাই চোখে অপার বিস্ময়
অরণ্যের মতো কাঁপে, মনের নিঃশব্দ লোকালয়
দূরগামী উত্তরমেঘের
নিত্যপথে ভাষা পায় বেদনার ব্যাপ্ত আনন্দের।

যে-পথে হাঁটিনি আমি কোনোদিন সেখানে এখন
স্তব্ধতার সুরে সুরে নেমেছে বর্ষণ
শ্রাবণের। পথের যে-কোনো একা পাখি-ডাকা গাছ
মহাশ্চর্য মেঘ হয়ে যায় যেন বৃষ্টির ধোঁয়ায়!

পাতায় পাতায়
পরীর দেহের আভা, হাওয়াদের নাচ।
কখনো যাবে না চেনা কে ছিল ঘুমিয়ে
না-দেখা পল্লীর
মাটির দেয়াল-ঘেরা দূর ঘরে স্বপ্ন মুড়ি দিয়ে
এমন বৃষ্টির
আচ্ছন্ন দুপুরে মিশে। পাশে তার কেউ
ছিল না কি জেগে একা রমণীর ঘুমের সৌরভে?

যখন প্রাণের নীল ঢেউ
জেগে ওঠে, কথা বলে, রক্তের আশ্চর্য কলরবে
বৃষ্টির দুপুরে, মনে পড়ে
বর্ষার মতন গাঢ় চোখ মেলে তুমি আছো দু'দিনের ঘরে।

পরদিন রৌদ্রের সকালে
চোখ খুললেই দূরে ভোর লাগা শিরীষের ডালে
পৃথিবীর মুগ্ধ ছবি; মনে থাকবে না
এই চির-চেনা
আপন মাটিতে কাল নেমেছিল আবার আষাঢ়,
আর্তি দু'টি হৃদয়ের—কারো মনে থাকবে না আর॥

কবি

পূর্ণেন্দুবিকাশ ভট্টাচার্য

(এক)

এই তো মরশুম সবুজ শাহীবাগে
রঙের ঝড় তুলে ফুলের দিনগুলি
গোধূলি হার মানে ওড়ায় রঙধূলি
এই তো মরশুমী ফুলের ফাগ লাগে

নাকি এ রোশনাই গোলাপী বসবার
কী মায়াজাল ছায় কাজলস্বর্ণায়
সোনালীলালনীলে শহেলী দিলদার
নাই কি নিদ তার দুচোখে নিদ তার।

(দুই)

রঙের বিদ্যুৎ দৃষ্টি ঝাপসায়
চেনে না রঙ্গিলা চেনে না কবিরে
রূপসী সরসীর নর্সিশস হায়
মুকুরমোহমনে পায় কি গভীরে

কবিরে চেনে তবু তারই সে রূপকার
সুদূর ছায়াপথ সুচির ধ্রুবতারা
রূপের তিমিরেই অরূপজ্যোতি তার
নিভৃত ধ্রুবতার॥

বলো না কতদিন এমন ক'রে

প্রণব মিত্র

বলো না কতদিন এমন ক'রে
ঘুরবো পথে পথে হাওয়ার গান শুনে
বলো না কতদিন এমন ক'রে।

গ্রীষ্ম যায় ঝ'রে, হেমন্তও
বাতাসে আর কোনো গান তো নেই
হায় গো সুর নেই নীলপাখির
হায় নিরুত্তাপ দিনান্তও

কত না দিন এলো কত না বার
চিহ্ন মেলে দিলো ঝরাপাতার,
পুরোনো পথ সে তো হয় না শেষ
হোলো না প্রশ্নেরা বিনিঃশেষ—
তবুও তোমাকেই চেয়েছি শুধু আর
বলো না কতদিন এমন ক'রে
ঘুরবো পথে পথে হাওয়ার গান শুনে
বলো না কতদিন এমন ক'রে।

যদিও জীবনেতে দুরাশা নেই
হয়তো নেই কোনো দুঃসাহস,
ভেবেছি বোড়ে চেলে কিস্তিমাৎ

করতে পারলেও করে কী ফল ;
তবু নিরুত্তাপ নয় জীবন—
কেননা তোমারি তো আগুন নিয়ে মেয়ে
জ্বলেছে রাতদিন জ্বল্‌ছে মন।

সূর্য যায় ঝরে হেমন্তের
হলদে শীত এসে পাতা ঝরায়,
একটু ওম-করা ঘরের কোণ
চাইতে চাইতেই কাটে জীবন—
ভাবছি অপলক তোমার কালোচোখ
তোমার তুলতুল রেশম চুল।
সূর্য ঝরে গেলে হেমন্তের
এখন আর কোনো গান তো নেই—
দেবে কি আশ্বাস একটি বিশ্বাস
একটি নিঃশ্বাস বসন্তের।

বলো না কতদিন এমন ক'রে
ঘুরবো পথে পথে হাওয়ার গান শুনে
বলো না কতদিন এমন ক'রে।

অন্বেষণ

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

খুঁজে খুঁজে মরি।
আবদ্ধ প্রাণের দ্বারে করাঘাত হেনে
ডাকি নাম ধরে'
প্রাণপণে জোরে জোরে,
দেয় না দেয় না সাড়া নির্মম প্রহরী।
হাওয়ায় চীৎকার ক'রে ডাকি
ফাল্গুন মন্থিত দিনে
বসন্তের পদক্ষেপ পথে চিনে চিনে ;
এমন কি কাঠফাটা জ্যৈষ্ঠের আকাশে
যখন প্রাণান্ত ডাকে তৃষার্ত চাতক,
মরা গাঙে মাছ খোঁজে বক,
আমার অস্থির ডাকে সুনির্মম সূর্য শুধু হাসে।

দিন যায় রাত যায় আচ্ছন্ন হৃদয়
খোঁজে তাকে, খোঁজে কাকে! কাকে খুঁজে-খুঁজে
হন্যে হ'য়ে পথে ঘোরে? চোখ আসে বুজে
প্রতীক্ষায় তন্দ্রাতুর, পউষের সঙ্কীর্ণ নির্দয়
শীতের কঠিন ছায়া সারা মনে প্রাণে
'সর্বনাশা জড়তার তীক্ষ্ণ ছায়া হানে
প্রত্যাশাকে চূর্ণ করে, দণ্ড দুই শীতের ছায়ারা
ঘুরে ঘুরে খেলা করে গাছে-গাছে তৃণদলে ঘাসে,
দু' দণ্ডের জন্যে জেগে স্নিগ্ধ হাসি হাসে

কৃষ্ণচূড়া, একেশিয়া গাছেদের শাখা,
বৈকালী বাতাস এসে সঙ্গোপনে রেখে যায় কোণে
শীতল আমেজ এক করুণার গন্ধ দিয়ে মাখা।

আর আমি খুঁজে মরি জীবিকার একটানা বিভ্রান্তির ফাঁকে
হৃদয়ের সুরটিকে ক্ষণস্থায়ী ক্ষীণ অবসরে
আলোর শিশুর মতো। দূরে তীব্র ভাঙা কণ্ঠে হাঁকে
জীবিকার জগন্নাথ, হিংস্র হাতে অমোঘ নিয়মে
ভাঙে আশা, ভাঙে প্রাণ, ভাঙে প্রেম মোহ,—
কুটিল হিংসায় দীর্ণ সহস্রের স্বপ্নিল আগ্রহ।

আমি তবু বার হই। তবু ভোর হ'লে একবার
মাঠে যাই, দূরে যাই, একেশিয়া গাছটির দিকে
বারেক তাকাই। আর কৃষ্ণচূড়া স্তবকের থেকে
তুলে নিই দু'টি ফুল,—তারপর ঘরে ফিরে এসে
আবার জমাই পাড়ি রুদ্ধশ্বাসে জীবিকার দেশে॥

তাতারসমুদ্র ঘেরা

নরেশ গুহ

ছড়ানো প্রাণের মেলা, জীবনের মুগ্ধ আনাগোনা :
এ সংসারে আনন্দের শত্রুতা সাধতে পারবো না।
কে মন্দ মানুষ, কেবা শাদা কালো,
তাকাও মুখ তোলো চোখে আলো জ্বালো,
প্রাণরঙ্গভূমি এই, শেষ বার চেয়ে দেখ মন,
তাতারসমুদ্র ঘেরা জননী বসুধা, উন্মোচিত ধুলোর প্রাঙ্গণ।
বিদেশী মাল্লার নৌকো ঘাটে ঘাটে, দেশান্তরী জাহাজের ভিড়,
মরুভূমি পার হ'য়ে ক্যারাভান অন্যদিকে ফেলেছে শিবির।
দোকানে বিচিত্র পণ্য, রকমারী মালা, বালা, কাঠের চিরুনী
রান্নার মাটির হাঁড়ি, সাজানো সঙ্গীন মতো দেখতে আখ।
        কিসের ডুগডুগি শুনি ?

চলো মেলায়, চলো মেলায়, বেলা এলায় মাঠে বনে,
রাঙা ধুলো তুলি বুলোয় প্রাণে মনে।

খুঁজবো না অন্য অপার্থিব ঊর্ধ্বে নীলিমার শূন্যে,
যা আছে এখানেই, আবর্তিত এই নরনারীর উদ্গত অদৃশ্য অশ্রুর পুণ্যে।
পাণ্ডাকে অচল সিকি সঁপে খুঁজব কি স্বর্গের সিঁড়ি ?
জুয়াড়ীর পাপচক্রে সর্বস্ব খুইয়ে কেন বাড়ি ফিরি।
উন্মনা শীতের রোদ, দূর থেকে বরং দেখি, ভাঙা দেউলের দরজায়।
গলাগলি পাড়ার মেয়ে দুটি ঘর যায়।
এর মধ্যে তুমি আমি সে
আরো অগণ্য অন্য, চিনিনে যাদের, পাইনে দিশে,
মন্দ, আধ-মন্দ, কী-জানি-কেমন, শাদা কালো বাদামী।

অশেষের লব্ধ বিস্ময়, বারবার মনে হয় হা—কোথায় আমি !
কেন এলাম ? কিসের টানে আসা ? কার কী রেস্ত ? কার খোঁজে
খাপছাড়া আড়াল লোকটি ঐ পথিক চোখ বোঁজে।
কোন প্রেমে ঐ বিকলাঙ্গ
ব্যস্ত ভিড় এড়িয়ে হঠাৎ তার যাত্রা করল সাঙ্গ।
জানি না, জানবো না। চলো, এক দান নাগরদোলায় দুলি।
অন্ধ ভিখিরীর ভরলো না হয়তো দিনান্তের স্বল্প আশার ঝুলি।
ডুম্ ডুম্ নাগারা পিট্‌ছে দুআনা টিকিটের সার্কাসতাঁবু ;
পানউলীর সঙ্গে নিভৃত ঠাট্টায় রত পামশু পরা বাবু।
দুদণ্ড দাঁড়িয়ে দেখি, শুকোয় না পটুয়ার তুলি।
উদাসীর ধুনি জ্বলছে, পাশে সিঁদুর লেখা বিমর্ষ মড়ার খুলি।
এর মধ্যেই পকেট কাটছে কেউ, (মূলধন বাড়ায়),
সুখের জংশনে যাবে দ্রুত ট্রেনে, কম ভাড়ায়।

জানি এই শেষদেখা, দেখে তাই চোখ ফেরে না, এমন। আশ্চর্য
মর্ত্য জীবনের পারম্পর্য।
উত্তমের নিকোনো আঙিনা, অধমের নোংরা গন্ধ গলি,
খোলা চোখের সময় পাই যেন দেখতে সকলই।
মা-মরা শিশুর শুকনো মুখে সন্ধ্যায় কেনা শস্তা বাঁশী
শুনতে শুনতে শেষ যেন ঘাটে আসি।
কিংবা যাই পাহাড়ী পাকদণ্ডী বেয়ে দূরে
কুয়াশায় মিশতে, প্রাণরঙ্গভূমির মেলা ঘুরে।
অথবা নামি পাতালের সিঁড়ি বেয়ে তলায়
প্রত্যক্ষ করতে আঁধারের বিখ্যাত কারুকলায়।
তখনো চলবে—জানব—দেশ দেশান্তরী আনাগোনা।
সাধ নেই, সাধ্য নেই, এ মিলনআনন্দের শত্রুতা সাধতে পারব না।

TWO POEMS

SADIST TIME

I have waited this chameleon day
beneath the willow that grows
beside the pool...I do not see its long silk
tassels mirrored within,
nor sky bowl filled with blue...
nor dragon fly wheeling across
glass surface.
All I see is your image.

How long one day is,
how slow sadist hands of Time move !
Do you hear each ampere beat ?
It is my heart pulsing hours
for your return.
The sun has fallen behind the hill sixty
beats ago...and fragrance of your nearing
numbs cadence of reason.

When the willow shades us you will see
my face bend to yours
in the pool's reflection.

FLEDGED

Excuse wantoning of my eyes
unveiled to life's light...
I have beheld thy bronzed thighs
and my heart fledged in flight.

Take my unfingered breasts, my lord,
they lean to your cupped hands...
I have unbraceletted my limbs
dancing a thousand sarabands!

JESSICA LEWIS

মার্কিন প্রবাসীর পত্র

অমিয় চক্রবর্তী

কবিতা-সম্পাদকেষু,

দূর প্রবাসে বাংলা কবিতার বই নিয়ে বসেছি। কাব্যের চুল-চেরা বিচারের পক্ষে এটা অনুকূল অবস্থা নয়। মন-কেমনি হাওয়া, যাকে এরা বলে নস্টাল্‌জিয়া, তর্কবুদ্ধিকে উড়িয়ে দেয়। তার উপর নরেশচন্দ্রের এই প্রথম কবিতার বই বিশেষভাবে চিত্র-প্রতীকী,—মনে হয় নীল জলের বহু ওপারে আনন্তিক বাংলার সেই হৃৎভূমি দেখা দিল যেখানে গাছে গলিতে, চেনা সংসারের অসংখ্য নিবিড়তায় আমরা চিরদিনের অধিবাসী।

'দুরন্ত দুপুর' খুলে চোখে পড়ল কলকাতা। কলের জল, পাশের বাড়ি, গ্যাসের আলো, আর 'দ্বিতল রেলিঙে ঝোলে সদ্যস্নাত......শাড়ির' আঁচল যাকে রবীন্দ্রনাথ বলতেন আমাদের ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ, ঘরে ঘরে ওড়ানো নিশান। তারপর চায়ের পেয়ালা, নতুন বই, আভা-বদলানো বাংলার আকাশ, নাগরিক দৈনন্দিন। তাছাড়া মাছি, পিঁপড়ে, পাড়ার বস্তির ঈষৎ উল্লেখ আছে। যদিও এই বাস্তবিক প্রসঙ্গে ভিড়ে-ভারাক্রান্ত কলকাতার জায়গা হয়নি; সদাগরি আপিস মিল অনাহার অত্যাচার সংগ্রাম সংঘাতের দূরধ্বনিও শোনা যায় না। নতুন যুগের উদ্ধত প্রতিহত জনশক্তির কাব্য এ নয়। জ্ঞানবিজ্ঞানের যৌবনী ঢেউ বৃহৎ ইতিহাসের পটে আলোড়িত হ'য়ে এই সংকলনের কবিতায় পৌঁছয় নি। বহুলোকের কলকাতা শহরে এসে ঠেকেছে অলৌকিকের একফালি আলো: তারি সঙ্গে ঘরোয়া বাছাই-করা ঘটনার সংমিশ্রণে এই গীতিকাব্য। 'পাথরে-বাঁধা শহরে ফুটপাতে' কৃষ্ণচূড়ার অজস্র লাল ভ'রে উঠল এও যেমন আকস্মিক, তেমনি ডাকবাক্সে নতুন চিঠি, সিঁড়িতে চটির শব্দ, ঢক ঢক কুঁজোর জল খাওয়া ইত্যাদি

কলকাতার বাঙালি জীবনের নিত্য আনুষঙ্গিক হয়েও আশ্চর্য। 'শঙ্খ শাদা' কঠিন দেয়ালের গায়ে বসানো যামিনী রায়ের ছবি শিল্পের ঠিক একই পর্যায়ে পড়ে না, কিন্তু দুরন্ত দুপুরের 'হৃদয়ের উষ্ণতায়' ঘাসের রং, ছিন্ন সুখ, হঠাৎ মেঘের সঞ্চরণ, 'কান্নার করাতে যত ধার' তারি সঙ্গে একত্র মিশেছে। চিরদিনের বাংলা। সব সুদ্ধ গলিতে বাজানো একটি বাঁশির সুর। কখনো শহরের কথা, কখনো গ্রামের ছবি ঐ বিষণ্ণ মধুর কড়ি-মধ্যমে থরথর করছে। হৃদয়মনের কাল্পনিক ছায়াচ্ছন্ন, কখনো রোদ্দুরের ঝলক-দেয়া। দূরত্বের বেদনায় বাঁধা কাছের ঘটনা। বইখানির নাম 'দুরন্ত দুপুর' না হ'য়ে 'দূরান্ত দুপুর' হলে আরো মানাতো। দুরন্ত অভিমানী মননের দিন অন্যত্র।

নরেশচন্দ্রের কবিতার ব্যাপক রাজ্য প্রাকৃতিক; রাঙা পাতায়, এক বর্ষার বৃষ্টিতে, মৌমাছির প্রসঙ্গে বিকীর্ণ। নাম থেকেই ভাব অনুমিত হয়। শান্তিনিকেতনে ছুটি, মাঘ শেষ হয়ে আসে, আঁকা বাঁকা বালি—ছোটো বড়ো প্রাকৃত কবিতা,—বিশেষ অর্থে। যুগল মেয়ে, দুই নদী, ভীরু মেয়ে, লগ্ন, শকুন্তলা, তুমি কি রেখেছ কথা ইত্যাদি অন্য শ্রেণীর; প্রাকৃতিকের চেয়ে মানবিক হৃদয়ান্বিত। তৃতীয় পর্যায়ের কাব্য আরো স্বাধীন কল্পনাচারী, নাম থেকে গন্তব্য ধরা দেবে না। যেমন—বানানো ভালো, ময়ূরভঞ্জ, ট্রেন, অজ্ঞাতশত্রু গান, আমার বন্ধুকে; একই প্রসঙ্গে নানা প্রসঙ্গ মিশেছে। আরো নাম যোগ করতে চাই ছোটোদের কাব্য থেকে : হাওয়ার হাঁস, কুমির ইচ্ছা, লাখো বছরের পুরোনো জমিতে। বিষয়ের দাবি অতি প্রধান না হওয়ায় লীরিকের মেজাজ এতে খুলেছে।

'বানানো ভালো' সুন্দর' ছোটো কবিতা। ছবির অনেকখানি অন্তর্দৃষ্টি-গোচর।

১. …চড়ার বালি
উত্তরে পুবে বাজে ঝঞ্ঝার খর করতালি

২. কত বর্ষার ধারে কেটে গেছে পুরোনো সে তীর

৩. চোখে স'য়ে যাওয়া বিবর্ণ রাত এ নয়, এ নয়

৪. সরাইখানার খোলা জানালার পাণ্ডু আলোয়
পেয়েছি আবার মন ভোলাবার বানানো-ভালোয়।

নানাবর্ণের সূক্ষ্ম সংসর্গিত কবিতা।

'ময়ূরভঞ্জ' কবিতায় অনতিপ্রকট দৃশ্য ও স্মৃতির অনুরণন; বর্ণনার চেয়ে বেশী।

১. বুনো বাংলোয় রাতে ঘুম নেই, উতলা মন

২. …সেই শালবন
কতো হাসাহাসি করল সেবার সুযোগ বুঝে।

৩. শত কবিতার ঘুমভাঙা ভোরে এনেছিল কচি আম

যদিও এই কবিতার শেষ লাইনে 'পর্যটক' কথাটায় খটকা লাগে; 'তলে'-র সঙ্গে 'ভুলে'-র মিলেও স্বস্তি নেই। মিলের প্রসঙ্গ পরে তুলব।

আখ্যায়িকা জড়ানো কবিতা 'ট্রেন', 'আমার বন্ধুকে'—স্বতন্ত্র উল্লেখযোগ্য। সুন্দর সমগ্র পদ এই দুই কবিতা থেকে পৃথক চয়ন ক'রে নেওয়া যায়, কিন্তু সব মিলে দীর্ঘ কবিতায় কবি এখনো সংহতির চেষ্টা করেন নি। ভাবের সূত্র সন্ধান করলে নিরাশ হতে হয় না, কিন্তু বিস্তৃতি ক্লান্তিকর। অথচ কবির পরিণত হাত এবং দৃঢ়তার সাক্ষ্য এই তৃতীয় পর্যায়ের মনন-প্রধান কবিতার নানাস্থানে দেখা দিয়েছে। নমুনা :

১. আমার সময় আজ। পৃথিবী আমারই
(আমার বন্ধুকে)

২. এই দৈব-দুর্দিনের সর্বস্ব আমার (,,)

৩. চিন্তার লাঙল আজো কপাল চেরেনি (,,)

৪. সাত পুরুষের ভিটেমাটি ফেলে পার হয়ে যাবে চাষী
সন্ধ্যার খেয়া :

(অজাতশত্রু গান)

'ট্রেন'-এর এই পদগুলি দৃষ্টান্তস্বরূপ মনে রাখবার—

১. দুরাশার সিঁড়ি তোলা অজানা ষ্টেশন

২. প্রকাণ্ড সূর্যের নিচে শ্রমে তিক্ত, জ্বরে মূর্ছাতুর
আকাশ পৃথিবী ভরা প'ড়ে আছে নির্বাক দুপুর।
আদিগন্ত রেলপথ—অনিশ্চিত অনন্ত সময়—
জীবনের লৌহচক্র অক্লান্ত ইচ্ছায় পার হয়।

['লোহার চাকা' অন্য কথার যোগে ব্যবহার করা যেত কিনা]

মুহূর্তের বনপথ, মুহূর্তের মাঠ,
জ্যোৎস্নায় কুঞ্চিতরেখা হ্রদের ললাট,
গোধূলিতে হাটফেরা মানুষের ভিড়
পার হ'য়ে মধ্যরাতে উদ্দাম নদীর
নির্জন পাড়ির পরে চিরতরে থেমে যাবে ট্রেন

[নির্জন পাড়িতে এসে থেমে যাবে ট্রেন (?)]

প্রশ্ন শুধাবে না কেউ—'কোথায় যাবেন ?'

[প্রশ্ন কেউ করবে না (?)]

প্রতিচ্ছবি না হ'য়ে কাব্যের প্রকৃতি এখানে ভেঙে বদ্‌লিয়ে রাঙিয়ে স্বাধীন রূপান্তরিত। স্বপ্রকাশের এই পথ।

২

হাওয়াই ডাকে অত্যন্ত মাশুল নেবে, তবু এই চিঠিতে সমালোচনার দুটো প্রসঙ্গ যোগ করব। ঘর-মননী প্রবাসী হয়েও যথারীতি বাংলা তর্কে নামবার লোভ জাগল। বেশী সময় নেবো না।

প্রথমত ছন্দ, মিল, প্রসাধন। মিলের দিক থেকে বলি—নদী, গতি ; বাজাই, বাঁচাই ; ভরে, গড়ে ; গায়ে, চায় ; বড়ো, করো ; জানত, অফুরন্ত ; ইচ্ছা, তুচ্ছ ; আজই, বাঁচি ; বনতলে, ভুলে ; পঙ্কিলতায়, পাতায় ; সেও, ঢেউ—ইত্যাদিতে মন সাড়া দেয় না। মিলের আকস্মিতা, বা মিলের হঠাৎ আশা-ভঙ্গ কোনোটারই চমক কবি জাগান নি। অর্ধমিল, এমন কি দূর প্রতিধ্বনিত, অর্ধস্ফুট এবং আপাত-যদৃচ্ছ অথচ জটিল শিল্পিত মিলের ব্যবহার কবিতায় চলবে, যদি তা বিশেষ নির্দিষ্ট সুনিয়ন্ত্রিত আঙ্গিকে দেখা দেয়। আধুনিক পশ্চিমী কাব্য অনেক দিন থেকেই পূর্ণাঙ্গী বা সম্পূর্ণ মিলের দাসত্ব কাটিয়ে উঠেছে, কিন্তু যথার্থ কাব্যে প্রত্যেকটি কবিতা স্বকীয় নিয়মানুযায়ী অন্তর্গূঢ় মিলে ও অমিলে বাঁধা ; ওয়েন থেকে অডেন পর্যন্ত এই সচেতন কারিগরির ব্যতিক্রম হয় নি। ইয়েট্‌স্ বা এলিয়টের তো কথাই নেই। এলিয়ট অনেকটা পাশ কাটিয়ে গেছেন কিন্তু ইয়েট্‌স্-এর অর্ধমিল কৌশলী নিয়মে বাঁধা।

ছন্দের বৈচিত্র্য 'দুরন্ত দুপুর'-এ তেমন জায়গা পায়নি। কবির কান সূক্ষ্ম সজাগ কিন্তু নূতন ছন্দ ও মাত্রার পরীক্ষায় তাঁর কাছে আরো সাহসিকতার দাবি করি। আধুনিক কাব্যে গদ্যপন্থী ছন্দ প্রবর্তিত হওয়ায় যথারীতি ছন্দের নূতনতর উৎকর্ষচর্চা প্রতিহত হয়েছে ; এমন কি, গদ্যছন্দের অনুকরণে গীতিকবিতায় নানা ব্যাধি দেখা দিয়েছে ; বাক্যের অন্যায্য ভিড় তার মধ্যে অন্যতম। পুরোপুরি গদ্যছন্দের স্বাধীনতা বেশি, যদিও শিল্পের নিয়ম এড়িয়ে কারো মুক্তি নেই। খাঁটি কবিতায় স্বাধীনতা অর্জনের উপায় কঠিন। পদ্যের অনেক অত্যাচার সহ্য করে কিন্তু কেবলমাত্র ভার চাপিয়ে তাকে নূতন ক'রে তোলা যায় না। পদ্য ও গদ্যছন্দের মিশ্রণ সম্ভব, কিন্তু এই পথ কণ্টকাকীর্ণ। লীরিক কবিতায় বাঁধা-ছন্দের বিচিত্র নূতনতর নৃত্যযোগ চলতে থাকুক।

কাব্যের প্রসাধনে বাক্যসাধনার দুরূহ চরম দাবি কবিকে মেনে নিতে হবে। কথাকে অত্যন্ত গভীরে বাজিয়ে নিলে তবে তার ধ্বনি স্পষ্ট হয়। শুধু কানে শোনা ধ্বনি নয়, বাক্যের অগণ্য সূক্ষ্ম শ্রুতি—তার overtone—

মনে ধারণ করা চাই। এর জন্যে চাই শিল্পের জ্ঞান এবং ধ্যান—যাকে বলা যায় শিল্পাগ্রহ—সংসর্গের নিবিড় আসঙ্গে ভরা বাক্যের শব্দ শুনতে হবে। তালের মেট্রনমে তা ধরা পড়ে না, অনিবিড় ঝঙ্কারে তা চাপা পড়ে, ললিত লঘু বাক্যে তাকে হারাই। আধুনিক বাংলা কবিতায় যেন অনুপ্রেরণা এবং অভ্যাস দুয়ের গূঢ়ত্ব আমরা না ভুলি, কথার আওয়াজ হারিয়ে কেবলমাত্র কথার শব্দ গেঁথে কবিতা লেখায় নিবৃত্ত হই। এই ক্ষেত্রে রচনার চপল ইচ্ছা চাতুর্য আমাদের শত্রু; রচনায় বিরতির ধর্ম আমরা ভুলতে বসেছি। দ্রুত চলতিকালের যোগ্য তরল বাক্যের আদান-প্রদানে কাব্য তৈরি হয় না। মগজে বিরল বাক্যের ঘনস্তর জমা হ'য়ে ওঠবার সময় থাকা চাই, যেখানে অবচেতনার জমিতে কথা নূতন হ'য়ে দেখা দেয়। বাক্যের সংস্কার ও নবীন সংসর্গ, সেই তন্ময়তা যা বাঙ্‌ময় অথচ অধিক, আমরা তারই শিল্পী। এখানে বলতে চেয়েছিলাম বিরল এবং সুসংযোজিত বাক্যের ওজন মেনে চলার কথা। সেই মাত্রা কী ভাবে রাখা যায়? গভীর তন্মাত্রবোধ এবং শিল্পের তীক্ষ্ণ বিচারশক্তিকে একত্র হৃদয়ে ধারণ করবার সমগ্রতা কাব্যজগতে দুর্লভ। অথচ শ্রেষ্ঠ কাব্যশিল্পের ঐ পথ, নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

ভাষার বিচারে আরো বহির্মুখী প্রসঙ্গ তুলব। আমার বক্তব্য এখানে ইঙ্গিতে জানাব,—দৃষ্টান্ত 'দুরন্ত দুপুর' থেকে তোলা।

হাওয়া দোলা দেবে তারে (তাকে?); কাহার খোঁপার গন্ধ (কার সে খোঁপার গন্ধ, বা অন্য কিছু—কাহার নয়); চোখ থুয়ে আকাশের নীলে (চোখ রেখে?)।

"সাধু" ভাষা যখন আধুনিক বাংলায় যথার্থই অসাধু এবং অচল, তখন দুয়ের মিশ্রণে বিশেষ সাবধান হওয়া দরকার। যেমন অতি মিষ্টত্বে দুষ্ট "কবিত্বপূর্ণ" বাক্যের ব্যবহার বাদ দিতে হয়, তেমনি নষ্ট-স্বাদ সুলভ সাহিত্যের অভ্যস্ত ভাষাকে শিকেয় তুলে রাখা ভালো। হয়তো পরে কাজে লাগবে। রবীন্দ্রনাথ যে-যুগের অগ্রণী সেই যুগের গতি আরো দূর পর্যন্ত মেনে নিয়ে আমরা যথাসম্ভব ডুবাও, শুকাও ইত্যাদিকে বর্জন ক'রে ডুবোও, শুকোও ব্যবহার করব। আমারে, তোমারে, নাই, মম, তব,—অবস্থাবিশেষে

অনিবার্য হলেও বর্জনীয় মনে করাই ভালো। যা মুখে বলি না তা কলমে লিখব না এরকম প্রতিজ্ঞার বিশেষ মূল্য আছে। কবিতায় জায়গার অভাবে নানা অভিসন্ধির শরণাপন্ন হতে হয় কিন্তু সংহতির দাবি অসতর্ক বাক্যের ব্যবহারে রক্ষা হয় না, শেষ পর্যন্ত বাধা পায়। অবশ্য এ বিষয়ে কোনো কড়া নিয়ম নেই কিন্তু কান ও মনের দুই খাড়া পাহারা যেন সজাগ রাখি। ভাষার ব্যবহারে সূক্ষ্ম চেতনার অভাব শিল্পচেতনারই অভাব।

খেলাচ্ছলেও 'কচি মুখে শাদা দাঁতে রোদের চিৎকার' চলবে কি না সন্দেহ। যদি ঐ পদ রাখতেই হয় তাহলে সমস্ত কবিতার ভঙ্গীও বদলানো দরকার। 'নগরে শিবিরে গ্রামে ধূ ধূ জ্বলে যায় সিগারেট, নারীর শরীর' অচল, কেননা সিগারেটের দগ্ধদশা এবং নারীদেহে অগ্নিকাণ্ড ট্রাজেডি বা ট্রাজি-কমেডির একই কোঠায় ঐভাবে ফেলা যায় না। ভুলে-যাওয়া দগ্ধ নগরীর ভয়ঙ্করতা এবং প্রকৃতির ঔদাসীন্য অথবা মনের তীব্র অযৌক্তিকতা কবি অন্যভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারতেন, তার জন্যে শিল্পের গাঢ়তা প্রয়োজন, ভাষার ইপ্সিত লঘুছন্দ সত্ত্বেও।

'আজই আজই আজই'—ত্রিস্থ ব্যবহারে বলার জোর কমেছে। একই স্থানে 'স্তব্ধ নিষেধ তনুমনময় উত্তাল তব তনুমনময়' বেশি বলেই অকিঞ্চিৎ। অত্যুক্তির দেশ এই মার্কিনে সাহিত্য-চর্চার ক্লাশে প্রায়ই নিবেদন ক'রে থাকি: শিল্পের ক্ষেত্রে ১+১=২ না হয়ে –৩ হতে পারে। হোক উপমা, হোক বাক্যের ব্যবহার, অনুপ্রাস—অধিক বাড়ালেই অভাব বাড়ে।

বিস্ময়চিহ্ন, প্রশ্নচিহ্ন কবিতায় বিকল্পে ব্যবহার্য। 'একই বাসনার জ্বালা!' 'তবু আঁখিতারা ভয়তন্ময়!' 'তার কোনো চিঠি পাই? যদি সে নিজেই থাকে?' চিহ্নহীন হলে আরো একান্ত হত, ভাষার একটু অদল বদল প্রয়োজন। ভাষার বিশেষ ব্যবহার ও ভঙ্গী অনিবার্য প্রশ্ন বা বিস্ময় জাগাবে এই কথা—চিহ্নের সাহায্য খঞ্জের যষ্টি। কবিতার লাইন স্বনির্ভর হলে ভালো, অবশ্য ব্যতিক্রম ঘটবে কিন্তু তাও মূলশিল্পের খাতিরে, বাহিরের কোনো মূল্য বিচারে নয়।

ভাষার প্রসঙ্গে বলতে হয় বাংলা কবিতার প্রধান বিপদ তার গানের

সুরত্ব—অর্থাৎ গানের কথা হিসাবে ব্যবহৃত কবিতা শ্রেষ্ঠ কাব্যের সমস্ত বাক্যশিল্পের বিরোধী হয়ে দেখা দেয়। গীতিকাব্যে গানের আমেজ লীরিকে লায়র-এর ধ্বনির মতো; অশ্রুত, অদৃশ্য ধ্বনিক পরিমণ্ডল। অসম্পূর্ণ রচনাকে পূর্ণতা দেবার উপায় এটা নয়। বৈষ্ণব কবিতা গীতিমুখর হয়েও এই দুর্বলতা হতে মুক্ত, এমন কি যথার্থ যা ধ্যানের গান, যেমন মীরার ভজন, কবিতা হিসাবেও সুদৃঢ়। বাংলা কবিতায় শাক্ত ও বৈষ্ণব গান, নিধুবাবুর টপ্পা, বাউল কীর্তন রামপ্রসাদী মাঝপথে চলেছে,—কখনো বা গানের বেশি ধার ঘেঁষে চলতে সুরের অতলে হারিয়েছে। অন্য বিচারে যেমন তার অন্ত অপরিমেয় মূল্য, কবিতার তৌলে ঐ সুরে-হারানো গানের কথা যথেষ্ট ভারের চেয়ে অনেক লঘু—সেখানে লোকসানের অঙ্ক। রবীন্দ্রনাথের গানও নানাপথচারী; তাঁর অনেক রচনা কথায় সম্পূর্ণ নির্ভরশীল নয়। তিনি নিজে বলতেন ঐ জাতীয় গানের কথা কথার প্রদীপ তৈরি, সুর না যোগ হলে আলো জ্বলবে না। যদিও তাঁর অনেক গানই কথার সম্পূর্ণ শিল্পে সৌকর্যে কাব্যের কোঠায় পৌঁচেছে। তাঁর পুরোপুরি কবিতা—এমন কি লঘুছন্দের লীরিক—বাক্য এবং ছন্দ প্রসাধনে বলিষ্ঠ তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু বাংলা গীতিকাব্যের রাজ্যে সুরের অপেক্ষায় অনিশ্চিত ও সদ্যঃপাতী কবিতা রচনার দৌর্বল্য সহজে ঘুচবে না। এই বিপদকে সম্পদ ক'রে তোলবার প্রতিভা চাই।

অপরপক্ষে অত্যন্ত গদ্যভাব এবং ভারি কথার সিমেণ্ট-করা পদ আধুনিক কাব্যের আরেক সমস্যা। অতিসৌখিনতার মোহ ত্যাগ করতে গিয়ে এবং সংহতি ও চিন্তা-ঘনতার মননশক্তি ফোটাবার ন্যায্য প্রেরণায় আধুনিক পূর্বী ও পশ্চিমী কবি অনেক সময় আলো হাওয়া খেলবার জায়গা রাখেন নি। দরজা জানালা বন্ধ ভারি কথার আবহাওয়ায় দম বন্ধ হয়, ভাবের কাঠিন্যে মাথা ধরে। এও দুর্বলতা, শক্তির পরিচয় নয়। মনে রাখতে হবে বাংলা কবিতায় এই মাথা-ভারি মস্ত কথার দৌরাত্ম্য সংস্কৃত ভাষার দুর্ব্যবহার হয়ে দেখা দিলেও এই মানসিক প্রতিক্রিয়া নকল সংস্কৃত এবং নকল পশ্চিমী। স্বয়ং মাইকেল মধুসূদন প্রেরণা এনেছিলেন পশ্চিম থেকে, বহু ক্ষেত্রে তিনিও

পর্বত-প্রমাণ সংস্কৃত বাক্য ব্যবহার ক'রে আধুনিক মনের দাবি মেটাতে চেয়েছিলেন। তাঁর সফলতা আশ্চর্য, সেখানে তিনি বাঙালি শিল্পী, বা, শিল্পী, কিন্তু তাঁর স্খলনও আমাদের সাবধান জানিয়ে গেছে। খাঁটি সংস্কৃত কাব্যে এই কৃত্রিম বাক্যবিড়ম্বনা নেই তা বলা বাহুল্য। বাংলা কবিতায় যে-শিল্পী গানের নির্ভরতা এবং স্থূল বাক্যের ঘনত্ব এই দুই খাঁড়ি এড়িয়ে চলবেন তিনি জিতবেন।

মানসিকতার প্রসঙ্গে বাংলা গদ্যেরও সতর্ক হবার সময় এসেছে। চেষ্টিত সংস্কৃত বা পশ্চিমী ভঙ্গীর ব্যবহার নূতন বিভীষিকা হয়ে দেখা দিল; সমালোচনায়, রসরচনায়, এমন কি অন্য ভাষার গদ্য বা পদ্যের বাংলা তর্জমায়। যাঁরা আজো লুপ্ত ভৌতিক বাংলার ধারা বেয়ে সাধু ভাষায় লেখেন তাঁদের কথা তুলব না; তাঁরা অতীতের মর্যাদা নষ্ট করেন, বর্তমানেরও। নূতন প্রতিভাশীল বাংলা লেখক যদি যথার্থ প্রাচীন সংস্কৃত বা আধুনিক পশ্চিমী গদ্যজগতে শিল্পের নিভৃত প্রয়োজনে প্রবেশ করেন তাহলে তিনি মুক্তি পাবেন, তাঁর ভাষা সহজ আত্মীয়তায় সাবলীল হয়ে দেখা দেবে। সংস্কৃত কথা বাংলার বিশেষ সম্পদ, সেই অক্ষয় খনি থেকে নতুন ক'রে বাক্য সংগ্রহ, সংযুক্ত বাক্যের উদ্ভাবন চলতে থাকবে। কিন্তু যেমন গুণী পশ্চিমী লেখকের হাতে ক্ল্যাসিকল ভাষার সঙ্গে অজস্র প্রাণবান বহুদেশীয় ভাষা নিত্য নূতন ঐশ্বর্যধারায় একত্র মিলে মূল ভাষাকে আশ্চর্য পুষ্ট ক'রেছে, তেমনি বাংলা ভাষায় আরবি, ফার্সি, এবং আধুনিক আন্তর্জাতিক জগতের নিত্যপ্রয়োজনীয় পশ্চিমী বাক্যের অধিকতর ব্যবহারে বাংলার সৌকর্য বাড়বে। কিন্তু সচল স্রোত থেকে এই ভাষা তুলতে হবে। তা না হলে আবার সেই ক্লিষ্টতা দেখা দেবে যার বিরুদ্ধে এই আয়োজন। বাংলা গদ্যে বা পদ্যে অত্যন্ত চক্রিত, ঘূর্ণিত, দীর্ঘায়িত এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ সাংস্কৃতিক শব্দের ঝড় এবং ভারি ইংরেজী বাক্য অতি আধুনিকদের মধ্যেও ভয়ঙ্কর ব্যাধির মতো প্রবেশ করেছে, সমুদ্রপার থেকেও সেই সব রচনা পড়লে মাথা ঘোরে। যা সহজে বলা যায় তা দুরূহ করলে বা অযথা বিদেশী ভাষা ব্যবহার করলে গভীরতা বা মানস্তাত্ত্বিক সূক্ষ্মতা বাড়ে না। নানা জ্ঞানের চেতনার উন্মেষ ও প্রয়োগের

উজ্জ্বল হৃদয়বান ভঙ্গী আছে, উৎকর্ষবান লেখক তার সন্ধান জানেন। যাঁরা পুরানো চালে বক্তব্যের অভাবকে সাধুভাষার ঘনঘটায় ঢাকা দেন—সাধারণত সেই সব রচনার সাব্-এডিটিং করলে সমস্ত প্রবন্ধকে দুই বা তিন পাঠ্য-প্যারাগ্রাফে পরিণত করা যায়—সেই সব জাত-মানা পৌত্তলিকদলের কথা ছেড়েই দিলাম। কিন্তু আজকের দিনে যাঁরা নূতন ক'রে নকল ক্ল্যাসিকল্ বা পণ্ডিতী মর্যাদা অর্জন করতে চান তাঁদের স্বরচিত গলার ফাঁসে তাঁদের রচনা কণ্ঠাগত। পদ্যেও এই দুরারোগ্য বিড়ম্বনা 'সাধু' ও 'অসাধু' দুই ভাষার রচনায় বিদ্যমান,—চোখে দেখেও বিশ্বাস করা শক্ত ক্রেঙ্কার ঝঙ্কার সহযোগে বা ভারি কথার স্তূপে কেউ পাঠককে এবং আপনাকে চাপা দিতে চান। এই সব রচনা কানের ভিতর দিয়ে মরমে পশবার পূর্বেই কর্ণপটাহ ছেঁড়বার সম্ভাবনা। অথচ শিল্পী রবীন্দ্রনাথ রাজপথ খুলে দিয়ে গেছেন, সেই পথে বিশ্বের জ্ঞান বিজ্ঞান, প্রাচীন ও নবতন শিল্পসম্ভার খাঁটি বাংলা ভাষায় চলাচল করেছে। গদ্যবাংলার মনীষী প্রমথ চৌধুরী 'ছিন্নপত্রে'র প্রবর্তিত উজ্জ্বল ধারায় বিচিত্র ঐশ্বর্য রেখে গেছেন; জ্ঞানের, শিল্পের, প্রসাদগুণের কোনো অভাব ঘটেনি। বাংলার খবরের কাগজে এখনো ভূতের কীর্তন, ভাষার কৃত্রিমতার দিক থেকে;—এর চেয়ে ক্লিষ্ট, নকল সাধু, গঙ্গার জল-মেশানো ইংরেজি মার্কিনি কাগজি ভাষার একত্র প্রমাদ কল্পনা করাও শক্ত। যাকে বলে, উজ্জ্বল ব্যতিক্রম—কাগ্জি ভাষায়—তা অবশ্য আছে। কিন্তু বেশি নয়। এই নকল বাংলার লেখকদের কিছু কলম বা বাংলা টাইপরাইটর স্বতন্ত্র ম্যুজিয়মে রাখা থাকুক—ভবিষ্যৎ ছেলেমেয়েরা শিক্ষা পাবে।

যাঁরা আধুনিক, যাঁরা, সূক্ষ্ম সংস্কৃতিবান, যাঁরা সচেতন শিল্পী তাঁরা যেন ভাষার জন্যে কেবলমাত্র সংস্কৃত অভিধান না উল্‌টিয়ে বা পশ্চিমী রচনাকে সম্পূর্ণ ভুল ভঙ্গীতে তর্জমা না ক'রে পাড়ার চারদিকে কান ও মন নিয়ে ঘুরে বেড়ান। প্রতিবেশী মুদী, ছুতোর, কামার, মাঝি, রংরেজিনি, কুমোর, মিস্ত্রী মজুরের কাছে তাঁরা ঝুড়ি ঝুড়ি মহার্ঘ কথা পাবেন। গ্রাম্য কলাশিল্পী, ঘরের মেয়ে, অভিজ্ঞ বুড়োমানুষের কথায় তেজ আছে, কল্যাণ আছে, প্রাণ আছে—তারা ছাপাখানার ভূতে-পাওয়া নয়, খাঁটি বাংলার মানুষ। দেখা

যাবে তার মধ্যে শত শত জাত-হীন কথা আরবি, ফার্সি, এমন কি পশ্চিমী সরস হয়ে মিশেছে। সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিতের পাঠশালায়, টোলে নানা স্তরের সংস্কৃত বা অর্ধ-সংস্কৃত ভাষা তুলে নিতে হবে, যা বদলিয়ে বা নূতন সহযোগে ব্যবহার করা যায়। তাছাড়া ইংরেজ মার্কিন দূত সর্বত্রই আছে, স্বাধীন ভারতে তাদের প্রতিপত্তি কমেনি, বেড়েছে বলেই শুনতে পাই—ইংরেজি বই এবং এদের ভাষার সংসর্গ যাবার নয়। কিন্তু বীরবলের মন কই, তাঁর হাল-খাতার বদলে দুর্বল পাণ্ডিত্যের লেজার-বই আজ বাঙালী সাহিত্যে ছড়ানো। বাংলার স্বাধীন মননশক্তি, আত্মপ্রকাশের খাঁটি বাংলা ভাষা এখনো পুরোপুরি দেখা দিচ্ছে না। মাটিতে শিকড় গভীর না হলে বিশ্ব-জগতের আলো হাওয়া কাজে লাগবে না,—বাংলা সাহিত্য আপন সরস ভাষার সন্ধান পেলে নানান আকাশে তার পত্রপল্লব বিশ্বজনীনতায় প্রকাশ পাবে।

কথার দৃষ্টান্ত দিই। শক্তি, শক্তিমান শুধু নয়, জোর জোয়ান দুই চলবে; চলতি কথায়, এবং গম্ভীর জ্ঞানের ভাষায়। বাংলায় থিসিস্ লিখতেও যেন আধুনিক বাঙালী পুস্তক, বই দুইই ব্যবহার করেন; মসী-র বদলে কালি তাঁর লেখায় বেশি কাজে লাগবে। অন্তঃপুর, অন্দর; সাফ, পরিষ্কার; প্রাচীর, দেয়াল; সভা, মজলিশ কোনোটাই কাব্য বা ইতিহাস দর্শনের গম্ভীরতম আলোচনায় ত্যাজ্য নয়। সবটাই নির্ভর করে লেখকের যথার্থ মাত্রাজ্ঞানের উপর, নূতন বা পুরোনো অভ্যাসের অনুবর্তিতায় নয়। বৈজ্ঞানিক কথা, ব্যবহারিক পারিবেশিক জীবনজীবিকা সংক্রান্ত কথা, দেশের নাম, নূতন উদ্ভাবিত জিনিসের বা বিদ্যার নাম পশ্চিম বা পূর্ব থেকে নির্ভয়ে নেয়া যায়, কবিতায় গদ্যে স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করা যায় যদি খাঁটি বাংলা মন এবং ভাষা আমরা না হারিয়ে বসি। রাষ্ট্রিক প্রসঙ্গে জাপানি ডায়েট্, ইংরেজি পার্লামেন্ট, ইরাণি বা তুর্কী মজলিশ, এমন কি 'আরব-এশিয়ান ব্লক' বাংলায় চলবে। রাশিয়ান ম্যুজিক, ইস্পানি বাস্ক বা ক্যাটালনিয়ন নির্ভয়ে বাংলা সাহিত্যে আগন্তুক। শুধু পুরোনো স্টেশন মোটর ইত্যাদি নয়, নূতন রেডিও (বেতারও), এরোপ্লেন (ও হাওয়াই জাহাজ), অ্যাটম বম্ব্ (এবং আণবিক

বোমা), বাংলা ভাষায় ব্যবহার্য। রেডার, টেলিভিশনের তর্জমা হয় তো ভালো, না হ'লেও ক্ষতি নেই। হিন্দী তর্জমাবাক্য হয়তো আরো বেশি কৃত্রিম হবে,—এ বিষয়ে বাঙালী সাহিত্যিকের বিচার মান্য, কোনো রাষ্ট্রিক প্রতিনিধি বা আপিসের হুকুম খাটবে না। বাঙালী কবি বলবেন কী ভাবে নিয়ন লাইট (বা নিয়ন আলো), নাইলন্ বা ডেক্রন্ তিনি কাব্যে ঢোকাবেন। রেশমের সঙ্গে সিল্কও লিখতে দোষ নেই। কেননা পাড়ায় পাড়ায় সিল্কের শাড়ি ছড়িয়েছে। হয়তো ইস্পাতের সঙ্গে ষ্টীলও চলবে, অ্যালুমিনম্ তো বটেই। হার্মোনিয়ম নামক বেসুরো অসুর যন্ত্র বাজিয়ে প্রাচীন ভারতীয় গান বধ করতে অনেক তথাকথিত উৎকৃষ্ট গায়কদের কিছুমাত্র বাধে না—তাঁদের তুরীয় অনুনাসিক কীর্তি দলীয় আহা ওহো সহযোগে চতুর্দিকে বিকীর্ণ হয়, অথচ হার্মনি বলতে দ্বিধা কেন। অর্কেষ্ট্রা চলবে, ঐকতানও; হয়তো অর্কিডের সংস্কৃত নাম চলা উচিত হলেও চলবে না। পুরোনো কথার নতুন ব্যবহার প্রশস্ত, কোনো ক্ষেত্রে একেবারে তাজা বিদেশী বা স্বদেশী কথা সোজাসুজি উৎকৃষ্ট সাহিত্যের দরবারে প্রবেশ করবে।

সতর্কতা ও সাহসের নিয়ত উদ্যম বাংলার নবীন সাহিত্যে কামনা করি। আমাদের কারো পক্ষেই হয়তো বলা সম্ভব নয় নূতন কোন কবির লেখায় যথার্থ সাম্প্রতিকতা সৃষ্টিশীল হয়ে দেখা দিয়েছে, কে সেই রবীন্দ্রযুগবাসী—অর্থাৎ বাঙালি লেখক—যার রচনায় ছন্দ ভাষা উপমার পরিধি বিস্তৃততর, যার শিল্প সার্থক প্রতিভায় প্রয়োগের উদ্ভাবনায় উত্তীর্ণ। 'দুরন্ত দুপুরে'র লেখক সেই নূতন উদ্দীপিত পথে এগিয়ে যাবেন তাঁর কবিতা পড়ে সেই আশা মনে জাগল।

স্বর্গ

বুদ্ধদেব বসু

১

সোনালি ছায়াপথ পেরিয়ে এসে
সোনার তারা দুটি থামলো,
রুপোলি রাত্রির খোঁপার কাঁটাগুলি
হিরের ফোঁটা হ'য়ে নামলো
হলদে সিল্কের শয্যায়।

সে-নীল প্রান্তরে শব্দ নেই,
ভাষার ব্যবধান লুপ্ত,
কেবল মন্ত্রের প্রবল বীজে
প্রাণের জাগরণ জ্বলছে,
দীপ্ত কয়লার ফুলকি।

সে-দূর প্রান্তরে নিশ্বাসের
ছন্দে ফুটে ওঠে মুখ,
জ্যোতির বেদনার নিথর নির্বাণে
ঝিলিক দেয় দিকপ্রান্তে
অগ্নিবলয়ের উল্কা।

তবু তো মনে পড়ে যখন ছিলো
সময় ছিলো অফুরন্ত ;
তখন জানতে কি, দগ্ধ দম্পতী,
অসীম মৃত্যুরে পেরিয়ে

আসবে স্বপ্নের সোনালি শয্যায়
যেখানে সময়ের চীৎকার
বন্দী জন্তুর কান্না যেন
ব্যর্থ প'ড়ে আছে বাইরে।

২

খুঁজিয়া পেয়েছি মন্দির
সন্ধ্যার মতো নির্জন,
রাত্রির মতো অপরূপ।

যেমন নদীর দুই তীর
অমাবস্যায় মিশে যায়,
অথচ হাওয়ার নিঃস্বন

অথচ স্রোতের কলতান
সেই আকাশেরে খুঁজে পায়,
যেখানে রক্তমাংসের

ইন্ধনে জলে চিন্ময়
সপ্তর্ষির সামগান,
জলে জন্মের বেদনায়

অন্তঃসত্তা বিশ্বের
লক্ষ তারার অশ্রুর
অবিচ্ছিন্ন আহ্বান:

তেমনি আমার মন্দির,
দেখা যায় কি না যায় তার
ছায়াচ্ছন্ন, গম্ভীর

অপ্রতিহত অভিসার।
শুনেছি বন্দী জন্তুর
চীৎকার উচ্ছৃঙ্খল,

দেখেছি কলির কুক্কুর
কুটিল দন্তে ছিঁড়ে খায়
দময়ন্তীর অঞ্চল।

তবু জানি আছে মন্দির,
প্রেমিক সেখানে ফিরে পায়,
হৃদয় সেখানে শঙ্খের

মতো বেজে ওঠে গম্ভীর,
স্মরণ সেখানে স্বপ্নের
সুন্দর ধূপে জ'লে যায়—

রেখে যায় শুধু সময়ের
সম্ভাবনার সীমানায়
এই তৃষ্ণার তলোয়ার,

প্রাণসন্ধ্যার মন্দির,
নিয়তির মতো ক্ষমাহীন
অনতিক্রম্য শান্তির।

[গেব্রিয়েলা] মিস্ত্রাল-এর "স্বর্গ" নামক একটি কবিতার ইংরেজি অনুবাদ কোনো অখ্যাত সংকলনগ্রন্থে দৈবাৎ আমার চোখে পড়ে। কবিতাটি একটি খাতায় টুকে নিয়েছিলাম—কেননা বইখানা ফিরিয়ে দিতে হবে—তারপর অনেক দিন ধ'রে তার 'ভাব' কিংবা 'আবহাওয়া'কে বাংলা ভাষায় প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি। এই চেষ্টার ফল কী-রকম দাঁড়িয়েছে সেটা দেখা

যাবে 'সোনালি ছায়াপথ' কবিতায়। এর মধ্যে কিছুটা আছে মিত্রালের দান, কিছুটা আমার নিজের কথাও প্রকাশ পেয়েছে সন্দেহ নেই। একে অনুবাদ বললে ভুল হবে, বরং বলা যেতে পারে একটি থেকে আর-একটি কবিতা জন্মেছে; সাহিত্যক্ষেত্রে এ-রকম ঘটনা আমাদের অজানা নয়।

প্রায় কুড়ি বছর আগে, ডি. এইচ. লরেন্সের একটি কবিতার অনুরণনে, দ্বিতীয় কবিতাটির প্রথম পংক্তি বা প্রথম স্তবক আমার মনে এসেছিলো। সেই পংক্তিগুলোকে প্রেতলোক থেকে উদ্ধার ক'রে এতদিনে রক্তেমাংসে রূপ দিতে পেরে তৃপ্তি পেয়েছি। বলা বাহুল্য, এতে লরেন্সের কিছুই নেই, সেই কবিতাটিও আমার আর মনে পড়ে না এখন; কিন্তু সেই অতীতের প্রতি কৃতজ্ঞ আছি ব'লে কথাটা এখানে উল্লেখ করতে ভালো লাগলো।]

একটি নক্ষত্র আসে

জীবনানন্দ দাশ

একটি নক্ষত্র আসে; তারপর একা পায়ে চ'লে
ঝাউয়ের কিনার ঘেঁষে হেমন্তের তারাভরা রাতে
সে আসবে মনে হয়;—আমার দুয়ার অন্ধকারে
কখন খুলেছে তার সপ্রতিভ হাতে!
হঠাৎ কখন সন্ধ্যা মেয়েটির হাতের আঘাতে
সকল সমুদ্র সূর্য সত্বরতাকে ঘুম পাড়িয়ে রাত্রি হতে পারে
সে এসে দেখিয়ে দেয়;
শিয়রে আকাশ দূর দিকে
উজ্জ্বল ও নিরুজ্জ্বল নক্ষত্রগ্রহের আলোড়নে
অঘ্রানের রাত্রি হয়;—
এ রকম হিরণ্ময় রাত্রি ছাড়া ইতিহাস আর কিছু রেখেছে কি মনে।

শেষ ট্রাম মুছে গেছে, শেষ শব্দ, কলকাতা এখন
জীবনের জগতের প্রকৃতির অন্তিম নিশীথ;
চারিদিকে ঘর বাড়ি পোড়ো সাঁকো সমাধির ভিড়;
সে অনেক ক্লান্তি ক্ষয় অবিনশ্বর পথে ফিরে
যেন ঢের মহাসাগরের থেকে এসেছে নারীর
পুরোনো হৃদয় নব নিবিড় শরীরে।

রচনাকাল: ১৩৪২
(কিছু পরিবর্তিত)

দিনের পর দিন

বুদ্ধদেব বসু

দোকান

ষোলো বছর আগে, প্রথম যখন এ-পাড়ায় এসেছিলুম, তখন এর আসবাব ছিলো অন্যরকম। ঘাস ছিলো তখন, ট্রাম-লাইনের চাতাল ভ'রে, আর পথের দু-ধারে ফাঁকা-ফাঁকা মস্ত জমি, আকাশের যেখানে-সেখানে নারকোলের ঝাঁকড়া মাথা, ফুটপাতে যেখানে-সেখানে ফাল্গুনের হলদে গুঁড়ো, আর মাঠে-মাঠে জ'মে-থাকা বৃষ্টি, পিছল জল, গ্যাসের আলোয় বেগনি-সবুজ কাচের মতো, স্বপ্নের আর বীজাণুর গর্ভধারিণী।

আর মশা। হয়তো জোনাকি। আর দূরত্ব। হাটবাজার প্রয়োজনের দূরত্ব।

এখন সব বদলে গেছে। যেখানে মাঠ ছিলো সেখানে পাঁচতলা বাড়ি, ডোবার কবরের উপর রেস্তোরাঁ। গাছ কম, ঘাস মরা, ট্রাফিকের দাঁত-ঘষা চীৎকারে সভ্যতার আশ্বাস। আর পথ চলতে ঝরা পাতা ব্যাঙের ছাতা থমথমে সন্ধ্যার বদলে, এখন দোকান, ঘেঁষাঘেঁষি দোকান, অনেক, অসংখ্য, বিচিত্র, মন্ত্রীদের বক্তৃতার মতো বর্ধিষ্ণু। খাবার দোকান, সাজের দোকান, শখের দোকান; মেয়েদের গয়না, ছেলেদের খেলনা, বড়োদের খেলনা;—কোনোটি ঝকঝকে রঙিন মলাটে বাঁধানো, কোনোটি পুরোনো কবির বইয়ের মতো ফুটপাতে, কোনোটি, না-দেখা কোনো ফাঁকের মধ্যে, ম্যাজিকের মতো গজিয়ে-ওঠা। এই বন্যার মুখে একাচোরা দেয়ালগুলো ভেঙে পড়ছে; যেখানে, জমিদারের বড়ো বাড়ির আব্রু বাঁচিয়ে, এতদিন ফুটপাত ছিলো নিরিবিলি, কখন সেখানে দেখা দিলো দোকান, গণতন্ত্রের হাস্যময় দাঁতের মতো সারি-সারি, দোকান।

আমি, যখন রাস্তায় বেরোই, দোকানগুলো দেখতে-দেখতে চলি। অলস সূর্যাস্ত, প্রেমে-পড়া ব্যস্ত কুকুর, সময়ের কোদাল-কোপানো রেখাবহুল জটিল

কোনো মুখ—এ-সব আমাকে উন্মন করে মুহূর্তের জন্য, কিন্তু দোকানগুলো ধ'রে রাখে আমাকে, মুগ্ধ করে, তাদের টান এড়াতে আমি পারি না।

অথচ আমি বড়ো দরের খদ্দের নই, কিংবা আমার এমনও কেউ প্রিয় নেই যার জন্য উপহারের ইচ্ছায় আমার চোখ অনবরত চঞ্চল। আমার প্রয়োজন কম, সাধ্য আরো কম, আর আমি যাকে ভালোবাসি তাকে আমি বলতে পারি না কোনোদিন।

যত সব উজ্জ্বল জিনিশ কাচের ঘরে উদ্ভিদের মতো অদ্ভুত, তাদের দিকে তাকাই না আমি; উৎসুক নারী, বলিষ্ঠ পুরুষ, যারা ঘুরে-ঘুরে সওদা ক'রে ফেরে, তাদের দিকেও না; আমি চেয়ে দেখি, চোরা চোখে যখন-তখন চেয়ে থাকি, দোকানিদের দিকেই।

হ্যাঁ, সকালে, বিকেলে, দুপুরে আমি দেখেছি তাদের, শীতে, গ্রীষ্মে, বর্ষায়; ফুটপাতে-ফুটপাতে মাসগুলির মৃতদেহ মাড়িয়ে, বছরগুলির প্রেতের ভিড় ঠেলে-ঠেলে, আমি লক্ষ্য করেছি দোকানিদের মুখ।

কী অতলস্পর্শ বিষাদ তাদের মুখে!

আপনি ভাবছেন তারা সাজিয়ে রাখে, জুগিয়ে যায়, গছিয়ে দেয়; হিশেব লেখে, টাকা গোনে, খুচরো মেলায়? কখনো আপনার মনে হয়নি আসল কথাটা? অপেক্ষা করে তারা, অপেক্ষা ক'রে থাকে: ঐ তাদের কাজ, তাদের পেশা, তাদের বৃত্তি।

কেউ আসবে ব'লে অপেক্ষা করে তারা, পরবর্তীর অপেক্ষা করে, একের পরে অন্য, একের পরে আবার, শেষ নেই, বিরামহীন—তাদের সমস্ত অস্তিত্ব এক দীর্ঘ, দীর্ঘ প্রতীক্ষমাণতার সমান্তরাল।

যখন খদ্দের সওদা ঝুলিয়ে চ'লে গেছে, অন্য জন এখনো আসেনি, তখন আমি দেখেছি তাদের; কাউন্টরে কনুই রেখে, হাতের গর্তে থুতনি, তাকিয়ে আছে পথের দিকে, দূরের দিকে, ভবিতব্যের প্রগতির দিকে, ঘণ্টাগুলির লম্বা-লম্বা শিকের ফাঁক দিয়ে অনন্তকালের আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে যেন।

আর তাই তো তাদের চোখ এমন বিষণ্ণ, এমন অতলস্পর্শ বিষণ্ণতায় বিহ্বল।

দেখতে পান না ঐ চোখে কোনো প্রতীক, ঐ অপেক্ষমান ভঙ্গিতে কোনো প্রতিমা? সুভদ্র পাঠক, আপনারও তো দোকান আছে একটি, আমারও আছে; প্রত্যেকে আমরা যে যার মতো দোকান খুলে বসেছি, ছোটো, বড়ো, পেখম-তোলা, ঝুলে-পড়া, কোনোটি দেয়ালির মতো দীপ্ত, কোনোটি ফুটপাতে ধূমল। আমরাও অপেক্ষা ক'রে আছি, অপেক্ষা ক'রে থাকি: ছোটো থেকে বড়ো হবার জন্য, বড়ো থেকে আরো হবার জন্য, কবে চাকরি পাবো, কবে ছেড়ে দিতে পারবো চাকরি, কবে যেতে পারবো সেখানে, কবে ফিরে আসবো আবার। দিনের পর রাত, রাতের পর দিন, ঋতুর পর ঋতু, অনবরত অপেক্ষা আমাদের, ক্লান্তিহীন, তৃপ্তিহীন, পুনরুক্তির চেতনাহীন; স্ত্রীর জন্য অন্ধকার অপেক্ষা, সন্তানের জন্য কৌতূহলী, শীত এলে গ্রীষ্মের জন্য, গ্রীষ্ম এলে বর্ষার; খ্যাতি, অর্থ, আরোগ্যের জন্য; পরিশ্রম, বিশ্রাম, পরিণাম, পরিণতি—হয়তো নিশ্চিতি, হয়তো অবসর, হয়তো হঠাৎ ভাগ্যের কোনো ইঙ্গিত—অন্ত নেই। আসবে কে, চিঠি পাবো কার, সন্ধ্যাবেলা ঘরে যখন আলো জলেনি হঠাৎ কার টোকা পড়বে দরজায়? কেউ আমরা বই লিখেছি, ভাবছি কবে ছাপা হয়ে বেরোবে, কেউ ভাবছি যদি কখনো লিখতে পারি; কেউ আমরা বাড়ি তুলছি কোঁটা-কোঁটা রক্ত-জমানো কঠিন ইটে, কেউ কাঁপছি পেনশনের আগে সেক্রেটারির ডেপুটি হবার সম্ভাবনায়। এমনি সবাই; যে যার মতো দোকান খুলে বসেছি, তাকিয়ে আছি পথের দিকে, দূরের দিকে, পরবর্তীর দিকে, আমাদের সমস্ত অস্তিত্ব এক দীর্ঘ, দীর্ঘ প্রতীক্ষমাণতার সমান্তরাল। কিন্তু আমরা কেউ জানি না, কেউ ভাবি না যে আমাদের এই অপেক্ষা আর-কিছুরই জন্য নয়; এই যে আমরা খুচরো গুনি, হিশেব লিখি, ব্যস্ত হই, জানলা সাজাই—এই সব অবিরল ঘণ্টাগুলির লম্বা-লম্বা শিকের ফাঁক দিয়ে মৃত্যুর দিকে তাকিয়ে আছি আমরা, অপেক্ষা ক'রে আছি মৃত্যুর জন্য—না, তাও নয়, মৃত্যু পার হ'য়ে অমৃতের জন্য অন্তহীন অপেক্ষা আমাদের। কেননা—যদিও সংসারে তার অনেক নাম, অনেক রূপ, তবু আমাদের সব ইচ্ছাই অমৃতের জন্য আকাঙ্ক্ষা, অন্য কিছুতেই তৃপ্তি নেই আমাদের; যাকে আমরা জীবন বলি সে তো অমরতারই দুর্বল অনুকরণ; আর

যাকে বলি কাজ, চেষ্টা, ব্যস্ততা, দায়িত্ব—তাও আর কিছুই নয়, শুধু ঐ শূন্যতাকে ভুলে থাকার যে-কোনোরকম অক্ষম উপাদান—যার অবসানের জন্য মৃত্যুও যথেষ্ট নয়, যার পূর্ণতার অনন্য নাম অমৃত—সে কথা আমরা জানি আর না ই জানি।

সমালোচনা

কয়েকটি সনেট। শুদ্ধসত্ত্ব বসু। একক প্রকাশনী, কলকাতা। দেড় টাকা।

স্বয়ং 'পবিত্র সনেটগুচ্ছ' রচনা করেও জন ডান্ শেষপর্যন্ত কাব্যরচনার এই পেত্রার্কী পদ্ধতিকে ব্যঙ্গ করতে ছাড়েন নি: 'He is a fool which cannot make one Sonnet, and he is mad which makes two'। মনে হয় চতুর্দশপদীর বেড়াজাল তাঁর কবিমনকে যথার্থ তৃপ্তি দিতে পারেনি। 'সনেট পঞ্চাশৎ' প্রকাশের পর এ আঙ্গিকের পুনর্নব প্রয়োগে বোধকরি প্রমথ চৌধুরীরও তেমন উৎসাহ ছিল না। কারণ তিনি হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন যে সনেট হবে সেই জিনিস 'প্রকৃতি যাহার জেঠ, আকৃতি কনেঠ'। তাঁরই নিরুক্তি অবলম্বনে সনেটকে বলা চলে 'চতুর্দশ পদে বদ্ধ চতুর্দশ লোকের' চিত্রিত সংক্ষিপ্ত প্রতীক-রচনা মাত্র। ভাবসংহতিই—অতএব বাক্‌সংযমও—এর মূলনীতি। বুদ্ধি ও কল্পনার অসামান্য সমন্বয়ের অধিকারী হয়েও এই একটি সোপানে প্রমথ চৌধুরীর পদক্ষেপ ছিল কুণ্ঠিত; স্বল্পভাষিতা তাঁর ধাতে সইত না। অনুরূপ কারণেই হয়তো রবীন্দ্রনাথও তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনাগুলিতে এ-আঙ্গিক এড়িয়ে গেছেন। পুরোধাস্থানীয়দের এ মনোভাব লক্ষ্য করার পর আধুনিক কালে সনেটরচনার প্রচেষ্টা মাত্রই কৌতূহল উদ্রেক করে।

'কয়েকটি সনেট'-এর মুখবন্ধে কবি লিখেছেন, আলোচ্য গ্রন্থে 'খাঁটি ইতালীয় ও ইংলণ্ডীয় সনেট লেখার পটু ও পঙ্গু চেষ্টা' বর্তমান। কিন্তু খাঁটিত্ব এবং পটুত্বের এই পূর্বঘোষিত দাবির যাথার্থ্য শেষপর্যন্ত রক্ষিত হয়নি।

পৌষ ১৩৬০

যে সংহতিগুণটি সর্বাগ্রে বিবেচ্য তা সনেটগুলিতে অল্পই চোখে পড়ল, অথচ এ গুণটির অনুপস্থিতিতে সনেট রচনার সার্থকতাই বা কী? অভ্যাসানুগত্যে দীর্ঘতর কবিতাই তো রচনা করা চলত। শুধুমাত্র মিত্রাক্ষর-বিন্যাস বা পংক্তিসজ্জার প্রক্রিয়াটুকুই পেত্রার্কীয় সনেটের শেষ কথা নয় নিশ্চয়। তাছাড়া ছন্দ আর ব্যাকরণের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে পরিমিত পরিসরের মধ্যে সুচতুর, সতর্ক শব্দপ্রয়োগে সনেট রচনার যে মুনশিয়ানা—যাকে বলে craftsmanship—প্রকাশ পায় তাতেও শুদ্ধসত্ত্ব বসু শিথিলতা দেখিয়েছেন। প্রয়োগজীর্ণ শব্দের পৌনঃপুনিক অবতারণা স্বভাবতঃই বিরক্তি জাগায়। একাধিকবার ব্যবহৃত 'বৈকালীন মেঘ', 'নভোচারী পাখি' ইত্যাদি অশুদ্ধ প্রয়োগ; কিংবা কলরব অর্থে 'রৌরব' (১৮ পৃঃ), উদ্বাহ অর্থে 'উদ্বন্ধন' (৩৩ পৃঃ)—এ ধরণের মর্মান্তিক অপপ্রয়োগ শ্রীমতী ম্যালাপ্রপ-কেও লজ্জা দেবে। কোনো কোনো কবিতায় ছন্দোভঙ্গ রীতিমতো পীড়া দেয়। শুদ্ধসত্ত্ব বসু অনেকদিন লিখছেন, তবু এ সংকলনে সুখপাঠ্য কবিতা স্থান পেয়েছে মাত্র একটি কি দুটি। নির্বাচন ব্যাপারে লেখক কি আরো নির্মম হতে পারতেন না?

নিমাই চট্টোপাধ্যায়

প্রাপ্ত

সূর্যভাসসী। সম্পাদক, মৃণালকান্তি মুখোপাধ্যায়। আট আনা।

অশোকের সময়ের গ্রাম। দুর্গাদাস সরকার। চার আনা।

কবিতাভবন প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসুর বই

গল্পসংকলন

লেখকের বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন ধরনের আঠারোটি ছোটো এবং বড়ো গল্প। ছোটোগল্পের কারুশিল্পে বুদ্ধদেব বসুর প্রকৃষ্ট পরিচয় এই বইয়ে পাওয়া যাবে। রয়্যাল আকারে বোর্ডে বাঁধাই। উপহারের উপযোগী। ৫৲

সাড়া

বিখ্যাত প্রথম উপন্যাস। পরিমার্জিত সুদৃশ্য সংস্করণ। ৩৷৷০

বিশাখা

একটি করুণ মধুর রসোজ্জ্বল প্রেমের কাহিনী।
মনোরম প্রচ্ছদ। ২৷৷০

স্বতন্ত্র দুটি ছোটোগল্প

একটি সকাল ও একটি সন্ধ্যা ৷৷০

একটি কি দুটি পাখী ৷৷০

প্রতিভা বসু-র উপন্যাস

সেতুবন্ধ ২৷৷০

কবিতাভবন
২০২ রাসবিহারী এ্যাভিনিউ
কলকাতা ২৯

KAVITA — Vol. 18, No. 2. FEBRUARY, 1954.

Yearly Rs. 4/-, or 6S. 6d.
Per Copy Rupee 1/-

এক টাকা

Published quarterly at Kavitabhavan, 202, Rashbehari Avenue, Calcutta 29, India.
Editor and Publisher : BUDDHADEB BASU
Printed by Prativa Art Press, 115 A, Amherst St., Calcutta-9,

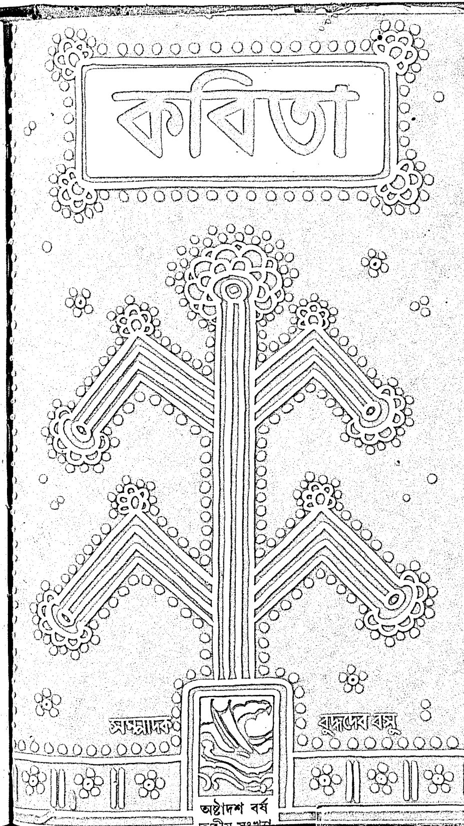

কবিতা

চৈত্র, ১৩৬০

কাব্যনাটিকা

অন্নদাশঙ্কর রায়

*

কবিতা

অমিয় চক্রবর্তী, শামসুর রাহমান, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পূর্ণেন্দুবিকাশ ভট্টাচার্য, স্বদেশরঞ্জন দত্ত, অরবিন্দ গুহ, লোকনাথ ভট্টাচার্য, শোভন সোম, সৈয়দ শামসুল হক, বটকৃষ্ণ দাস, রাজলক্ষ্মী দেবী, সুনীলচন্দ্র সরকার, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু

*

প্রবন্ধ

সুনীলচন্দ্র সরকার

*

কবিতা

ত্রৈমাসিক পত্র

আশ্বিন, পৌষ, চৈত্র ও আষাঢ়ে প্রকাশিত। * আশ্বিনে বর্ষারম্ভ, বছরের প্রথম সংখ্যা থেকে গ্রাহক হ'তে হয়। বার্ষিক চার টাকা, রেজিস্টার্ড ডাকে পাঁচ টাকা, ভি. পি. স্বতন্ত্র। ষাণ্মাসিক গ্রাহক করা হয় না। * চিঠিপত্রে গ্রাহকনম্বরের উল্লেখ আবশ্যক। ঠিকানা পরিবর্তনের খবর দয়া ক'রে সঙ্গে-সঙ্গে জানাবেন, নয়তো অপ্রাপ্ত সংখ্যা পুনরায় পাঠাতে আমরা বাধ্য থাকবো না। অল্প সময়ের জন্য হ'লে স্থানীয় ডাকঘরে ব্যবস্থা করাই বাঞ্ছনীয়। * অমনোনীত রচনা ফেরৎ পেতে হ'লে যথাযোগ্য স্ট্যাম্পসমেত ঠিকানা-লেখা খাম পাঠাতে হয়। প্রেরিত রচনার অনুলিপি নিজের কাছে সর্বদা রাখবেন, পাণ্ডুলিপি ডাকে কিংবা দৈবাৎ হারিয়ে গেলে আমরা দায়ী থাকবো না। * সমস্ত চিঠিপত্রাদি

পাঠাবার ঠিকানা:

কবিতাভবন

২০২ রাসবিহারী এভিনিউ,
কলকাতা-২৯

অতিশিথিল অতিতরল কাব্যরচনার দেশে ভাবসংহতি এবং বিন্যাসের সচেতন কারিগরিতে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত অসাধারণ কৃতিত্বের দৃষ্টান্তস্থল

অর্কেস্ট্রা

'অর্কেস্ট্রা' সুধীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্যগ্রন্থ। তারও আগে, ১৯৩০সালে, 'তন্বী' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল বটে, কিন্তু সে-সব রচনাকে পুনরমুদ্রণে স্বীকার করতে কবি অনিচ্ছুক। 'অর্কেস্ট্রা'র প্রথম পাঠেও আজ আর তাঁর সম্মতি নেই। তাই নতুন সংস্করণে সেই বিখ্যাত প্রেমের কবিতাগুলির ভাবসম্পদ অবিকল থাকলেও ভাষা এবং চিত্রকল্প ব্যবহারে লক্ষ্যনীয় রূপান্তর ঘটিয়েছেন তিনি। কাজেই, নতুন পাঠকের তো বটেই, 'অর্কেস্ট্রা'র পুরনো পাঠকদের কাছেও এই কাব্যগ্রন্থখানি মূল্যবান। দাম আড়াই টাকা। সিগনেট প্রেসের বই।

সংবর্ত

প্রায় একযুগ পরে সুধীন্দ্রনাথের নতুন কাব্যগ্রন্থ। "সংবর্ত মহাকাব্যের লক্ষণাক্রান্ত"—আশ্বিন ১৩৬০-'কবিতা' পত্রিকায় অরুণকুমার সরকার কৃত সংবর্ত-সমালোচনার একাংশ—"সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় শব্দগত দুর্বোধ্যতা নিয়ে যাঁরা হা-হুতাশ করেন, আত্মানুশীলনে মনোযোগী হওয়াই তাঁদের কর্তব্য। আধুনিক ইংরিজি কবিতা বোঝবার জন্য যে পরিমাণ পরিশ্রম আমরা করে থাকি, বাঙালি কবির ক্ষেত্রে তা প্রযুক্ত হবে না কেন? বাংলা কবিতার উৎসধারা রবীন্দ্রনাথে এসে বিক্ষুব্ধ তরঙ্গমালায় পরিণত হলেও, তার উৎপত্তি আরো সুদূরস্থানে। এ-কথা মনে রাখলে, সুধীন্দ্রনাথব্যবহৃত শব্দাবলীকে অচেনা মনে হবে না।" দাম দু'টাকা। সিগনেট প্রেসের বই।

সিগনেট বুকশপ ১২, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট। ১৪২-১, রাসবিহারী এভিনিউ

আরামে ভ্রমণের
জন্য
ডানলপ

সমগ্র প্রাচ্যের সুবিখ্যাত
গোল্ডেন
আমলা
হেয়ার অয়েল
GOLDEN AMLA HAIR OIL
কেশ চর্যা ও কেশ চর্চার শ্রেষ্ঠ উপকরণ বর্ণে, গন্ধে ও গুণে অতুলনীয়।
আজই ব্যবহার আরম্ভ করুন। সকল সম্ভ্রান্ত দোকানে পাওয়া যায়।
বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা · বোম্বাই · কানপুর

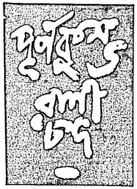

"হরিদ্বার, হৃষীকেশ, মথুরা, বৃন্দাবন কাশী ও জয়পুরকে কেন্দ্র করিয়া তীর্থ ভ্রমণের কাহিনী। অনেকটা ডায়েরির ভঙ্গীতে লেখা। লেখিকা তাঁহার বড় ননদ, ননদাই ও ব্রজরমণ নামক এক বৈষ্ণবের সঙ্গিনী হইয়া এই তীর্থভ্রমণের স্বযোগ লাভ করেন। কিন্তু ভ্রমণকাহিনী বলিতে সাধারণতঃ যাহা বুঝায় ইহা তাহা নহে। এ এক অভিনব রচনা। ঐতিহাসিক তথ্য-প্রীতি শিল্পীর অন্তর্দৃষ্টি, প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা, দেব-দেবতার প্রতি গভীর ভক্তি এবং মানুষের প্রতি গভীরতর সংবেদন, সমস্ত মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া এই স্ববৃহৎ গ্রন্থের পাতায় পাতায় ছবির মালা হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

বাংলা ভাষায় তীর্থস্থান সম্পর্কে এমন একখানি বই যে রচিত হইতে পারে তাহা না পড়িলে বিশ্বাস করা শক্ত হইত।

দেখিবার মতো যত মন্দির আছে, পুণ্যস্নান করিবার মতো যত ঘাট বা কুণ্ড আছে, দর্শনের মতো যত সাধক বা সাধু আছে, শুনিবার মতো যত কথা আছে, অসাধারণ দুঃখ বরণ করিয়াও লেখিকা তাহার কোনোটাই বাদ দেন নাই। যেখানে ঐতিহাসিকতথ্য পরিবেশন দরকার সেখানে তিনি তাঁহা করিয়াছেন, যেখানে কিংবদন্তী বা লীলাকাহিনী অবিশ্বাস্য সেখানে তাহাও তিনি যথাপ্রাপ্ত দিয়াছেন; যেখানে মনে রং ধরিয়াছে সেখানে তিনি রঙীন ছবি আঁকিয়াছেন। রচনা এক এক স্থানে কাব্যধর্মী হইয়া উঠিয়াছে কিন্তু উচ্ছ্বাস নাই, মাত্রাধিক্য নাই।

অসাধারণ সংযত ভাষায়, কোথাও পূর্ণ ব্যঞ্জনায়, কোথাও দ্যোতনা ইঙ্গিতে, কোথাও লঘু কৌতুকে, কোথাও সহৃদয় ব্যঙ্গের সঙ্গে লেখিকা তাঁহার চিত্ররচনা সার্থক করিয়াছেন।

সকল পাষাণমন্দির, সকল প্রাচীন দেবদেবতা, সকল তীর্থযাত্রী, সাধুসন্ত, সাধারণ নরনারী—এমনকি সমস্ত আকাশ-বাতাস, বৃক্ষ-লতা, ফুলফল লেখার ভিতর দিয়া বাঙ্‌ময় হইয়া উঠিয়াছে।

ভাষাহীন যেন হঠাৎ ভাষায় মুখর হইয়া উঠিয়াছে।"—যুগান্তর

॥ ১৯৫৩-৫৪ সালে রবীন্দ্রস্মৃতি-পুরস্কার প্রাপ্ত ॥

কাগজের বাঁধাই ৪৲ বোর্ড বাঁধাই ৫৲

বিশ্বভারতী

কবিতা

চৈত্র ১৩৬০

অষ্টাদশ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা

ক্রমিক সংখ্যা ৭৭

রাতের অতিথি

অন্নদাশঙ্কর রায়

[স্থান জঙ্গীপুরের ডাকবাংলা। কাল রাত দশটা। পাত্র মণ্টু গুপ্ত]

মণ্টু

"আজি কী মুরতি হেরিনু তোমার—"
মশার জ্বালায় হই জেরবার।
হাত চুলকায় পা চুলকায়
চুপ ক'রে বসা হলো দেখি দায়।
তাই বলে কত পায়চারি করি
বাইরে আঁধার পা বাড়াতে ডরি।
ঘন জঙ্গল ঘেরা চারি ধার
অদ্ভুত তার পাতার বাহার
কিন্তু যাদের লোকে 'লতা' বলে
তাদের বিহার বারান্দাতলে।
মশার কামড় বিরক্তিকর
তা বলে কি খাব 'লতা'-র কামড়!
জঙ্গীপুরের ডাকবাংলায়
সঙ্গীবিহীন প্রাণ যদি যায়
তবেই হয়েছে! তার চেয়ে ভালো
হ্যাজাগ্ বাতিটা আরো জোরে জ্বালো।

বেয়ারা! বেয়ারা!—কোথায় বেয়ারা!
চাপরাশিটারও দেখিনে চেহারা।
খাইয়ে আমাকে ওরা গেছে খেতে
কেউ কোথা নেই এ রাতে-বিরেতে।
ঘুম আসে নাকো রাত দশটায়
মশারি খাটিয়ে গরম বেজায়।
ফাইল! ফাইল! চার দিকে স্তূপ
দেখলেই চোখ ব্যথা করে খুব।
তার চেয়ে ভালো গুন গুন করা
যত রাজ্যের কবিতা ও ছড়া।
"হে মাতঃ বঙ্গ শ্যামল অঙ্গ—"

[অতিথির প্রবেশ]

কে? কে?
কে আসছে ওই পা টিপে পা টিপে?
টর্চের বাতি জ্বলে আর নিবে।
কে? কে?

শৈলেশ

আমি শৈলেশ। চিনতে পারলে?
পারলে না? কবে কলেজ ছাড়লে
মনে পড়ে? প্রায় একুশ বছর
পাইনিকো ভাই তোমার খবর।

মণ্টু

শৈলেশ? ওহো! শৈলেশ পাল
তুমি এইখানে! আহা! কত কাল
পরে দেখা হলো তোমার সঙ্গে!

আরে বোসো বোসো। হঠাৎ বঙ্গে
এরূপ স্থানে যে আশাই করিনি।
তাই তো ভাবছি চিনি কি না চিনি।

শৈলেশ

বেহারেই থাকি। তবে মাঝে মাঝে
এদিকেও আসি জমিদারি কাজে।
শুনলুম তুমি এসেছ বেড়াতে
ভাবলুম যাই দেখা করি সাথে।
সময়ও বুঝি হয়েছে বেয়াড়া
বদলেও গেছে আমার চেহারা।
তবু যে চিনেছ এই যথেষ্ট,
না যদি চিনতে সেও অদেষ্ট।
তুমি বড়লোক—

মণ্টু

আমি বড়লোক! আর হাসিয়ো না।
ওসব ঠাট্টা ঢের আছে শোনা।

শৈলেশ

কেন ভাই! কেন! কত বড় পদ!
পদের সঙ্গে নেই সম্পদ?

মণ্টু

পদমর্যাদা রাখতে রাখতে
কোথা চলে যায় রুপোর চাকতি!
মাসের অন্তে সব বাড়ন্ত
তবু লোকে বলে ভাগ্যবন্ত!

শৈলেশ

তুমিও ওকথা বলো যদি ভাই
আমরা সকলে কোথা তবে যাই!
জমিদারি উঠে যাবার সামিল
ম্যানেজারি গেলে আঁধার নিখিল!
লক্ষ্মী ছাড়ে তো ষষ্ঠী ছাড়ে না
বয়স বাড়ে তো শক্তি বাড়ে না।
থাক গে ওসব বলতে আসিনি
রসনাটা নয় মধুরভাষিণী।
অনেক দিন তো যাওনি ওদিকে
বন্ধুরা সাড়া পায় নাকো লিখে।
এসো এক বার ছুটিতে ছাটাতে
বেহারে দু'দিন সময় কাটাতে।

মণ্টু

ইচ্ছে তো আছে। ছুটি মিলবে কি?
বন্ধুরা আছে কে কোথায় দেখি।
কে কী হয়েছে? কে কী করছে?
সুখে সাফল্যে জীবন ভরছে?
কোথায় প্রভাত? মুকুন্দ সেন?
নওলকিশোর? নাজিম হুসেন?
কামতা বক্সু কোথা এরা সব?
খোঁড়া হেমন্ত? পাগলা কেশব?

শৈলেশ

এই তো স্মরণ রেখেছ, মণ্টু।
বাদ পড়ে কেন বুড়ো ও ঝণ্টু?

বেঁচে আছে ওরা সব ক'জনেই
রণজিৎ লালা সেই শুধু নেই।

মণ্টু

পড়েছি, পড়েছি শোক-সংবাদ
চিকিৎসকের বিষম প্রমাদ।
সেই শুধু নেই। সেই শুধু নেই!
কোথায় গেল সে জিজ্ঞাসা এই।

শৈলেশ

থাক গে ওসব বৃথা জিজ্ঞাসা
বাড়ীখানা লালা হাঁকিয়েছে খাসা।
ব্যাঙ্কে নগদ রেখে গেছে ঢের
ভাবনা কেবল গৃহবিবাদের।
মুকুন্দ, জানো, ডেপুটি হয়েছে
'সাব' খসে গেল অনেক বয়েসে।
প্রভাত এখন মস্ত হাকিম
মস্তকে তার কত শত স্কীম।
নাজিম হুসেন পাকিস্তাঁ গিয়ে
ভুল করেছিল, এসেছে পালিয়ে।
মাঝখান থেকে নোকরিটা নেই।
লোকে ভালোবাসে, মূলধন এই।
নওলকিশোর ভূমিহার নয়
মনের দুঃখ মনে চেপে রয়।
চাকা ঘুরে গেলে উঠবে উপরে
দল নিয়ে আছে, প্র্যাকটিস করে।
খোঁড়া হেমন্ত খোঁড়ায় না আর
সারা বেলা করে মোটর বিহার।

মোটরগাড়ীর এজেন্সী নিয়ে
কী ফোলা ফুলেছে মুটিয়ে মুটিয়ে!
ঐ যে তোমার পাগলা কেশব
আশা করি ভুলে যাওনি সে-সব।
সে-সব ব্যাপার ধুয়ে মুছে গেছে
কেশব এখন সিনেমা খুলেছে।
পুরুষ না হয়ে নারী হলে আজ
বেচারির হতো পতিতা সমাজ।

মণ্টু

মোটের উপর জীবন আহবে
ভালোই করেছে বন্ধুরা সবে।

শৈলেশ

ভালোই করেছে, তবু সুখী নয়।
ভালো ছিল সেই তরুণ সময়।
অল্পেই সুখী, অল্পেই সুখ
চালচুলো নেই তবু হাসিমুখ।

মণ্টু

আমাদের গেছে সে যে একদিন
তখন ছিলেম কেমন স্বাধীন!
কত যে স্বপন কত কল্পনা
আকাশেতে আঁকা কত আল্পনা!
সেদিনের চোখে দুনিয়াকে আর
যায় না যে দেখা। এ দোষটা কার!

শৈলেশ

কী দেখতে চাও? কী দেখবে বলো?

মণ্টু

সেও ভুলে গেছি কত কাল হলো।
কী যে আজ চাই! কী যে পাওয়া বাকী।
বুঝিনে, বুঝতে পারিনে সেটা কী।
আরো ধন নয়, আরো মান নয়,
আরো আয়ু নয়, আরো প্রাণ নয়।
তবে কী! তবে কী! কী আমার চাই!
সব আছে, তবু কী আমার নাই!

শৈলেশ

গুরু করেছ কি? দীক্ষা নিয়েছ?
দেবতাকে তাঁর প্রাপ্য দিয়েছ?

মণ্টু

ধর্মে আমার হলো নাকো মতি
ভাবিনে কী হবে পরকালে গতি।
ইহকালে যদি না জানি বাঁচতে
পরকালে কেন চাইব নাচতে?

শৈলেশ

আমি বলি তুমি নাম জপ করো
ক্রতু আর কৃত আজ হতে স্মরো।
জীবনের আর ক'টা দিন বাকী!
দিতে যদি চাও শমনকে ফাঁকি
তবে জপ করো ঠাকুরের নাম
তা হলেই যাবে কৈবল্যধাম।

মন্টু

ইহকালে যদি না জানি বাঁচতে
কেন যাব কৈবল্য যাচতে!

শৈলেশ

কী যে বলো তার হয় না অর্থ।
ধর্মই সার। অসার মর্ত্য।

মন্টু

ধর্ম না যদি বাঁচতে শেখায়
তারে নিয়ে আমি করব কী, হায়!
জানি নাকো আমি কত দিন আছি
বাঁচতে শিখব যত দিন বাঁচি।
ধর্ম যদি-না বাঁচতে শেখায়
শিল্পের কাছে যাব পুনরায়।
দিবসরাত্রি সৃষ্টি যে-করে
রসমাধুর্য বৃষ্টি যে-করে
জীবন কি তার কখনো ফুরায়!
পেয়ালা যে তার ভরে পুনরায়।

শৈলেশ

আমি তো দিয়েছি ধর্মেই মন
নয়তো পাগল হতে কতক্ষণ!
চারদিকে দেখি ভূতের নৃত্য
শত অবিচার নিত্য নিত্য।
চৌর্যের জয়, কে কাকে ধরবে!
ছোট আর বড় অসাধু সর্বে।

প্রতিকার নেই, জলছে মর্ম
তাই তো শরণ করেছি ধর্ম।

মন্টু

ধর্ম না-যদি জানে প্রতিকার
তবে কেন যাও ধর্মের দ্বার!

শৈলেশ

তবুও ধর্ম তথাপি ধর্ম
যদিও জলছে গাত্রচর্ম।

মন্টু

তবে তাই হোক, আমার ধর্ম
সব ছেড়ে দিয়ে শিল্পকর্ম।
আসবে না ফিরে তরুণ সময়
অন্তর হবে তারুণ্যময়।
প্রথম যৌবনের হলো ইতি
দ্বিতীয় যৌবনের হবে স্থিতি।

শৈলেশ

একদিন হবে তারও অন্ত
শমনের দূত অতি দুরন্ত।
পরলোকে যেতে নেবে কী পাথেয়?
শিল্প কি যাবে তোমার সাথেও!
ওপারের কথা কখন ভাববে
মন যদি যায় গল্পে কাব্যে!
নাম যশ নিয়ে করবে কী, ভাই!
নাম জপ করো, সাথী হবে তাই।

মণ্টু

এপারেই যারা জীবন্মুক্ত
সত্যের সাথে নিত্য যুক্ত
সমান তাদের ইহপরকাল
যেমন সকাল তেমনি বিকাল।
আমার মুক্তি নীরবে নিজনে
অপ্রতিমের প্রতিমা সৃজনে।

শৈলেশ

পাগল! পাগল! অসার যুক্তি
নামজপ বিনা কোথায় মুক্তি!
কঠিন বাঁচন কঠিন মরণ
তাই ধরি কষে গুরুর চরণ।
পাপ যদি করি তিনিই ভরসা
নইলে যে পরকালটি ফরসা।

মণ্টু

আমি ধ্যান করি পরম রূপের
বীভৎসতাও তাঁরই হেরফের।
তাঁকেই দেখেছি চোখ খোলা রেখে
তাঁকেই এঁকেছি হাতে কালি মেখে।
এ জীবনে তাঁরে দেখা আর আঁকা
এই তো মুক্তি। আর সব ফাঁকা।

শৈলেশ

তার মানে ফাঁকা গুরুর চরণ!
শুনলেও পাপ! মানলে মরণ!

বিদায়, মণ্টু। চললেম, ভাই।
পাটনায় এসো। ছুটি নেওয়া চাই।

[অতিথির প্রস্থান]

মণ্টু

অবাক কাণ্ড! শৈলেশ পাল
হঠাৎ কেমন করে এত কাল
পরে এলো আর হলো অদৃশ্য!
বিস্ময়কর এ মহাবিশ্ব!
সত্যি কি কেউ এসেছিল রাতে!
হ্যাজাগ নিবেছে। তেল নেই তাতে।
বেয়ারা! বেয়ারা!

এরোপ্লেনে

অমিয় চক্রবর্তী

১

কোনো মানে নেই শুধু আলোয় হঠাৎ এক হওয়া,
বাঁচা না বাঁচার চেয়ে চিরদিন বেশি—
কেউ আছে, কেউ নেই, কারো হাসি কারো কান্না ঐ
পবনে পবনে মিশে উড়ে যায়।
বিদেশে শহরে এসে কদিনের আনন্দ সংসার,
চেনা হল প্রতিবেশি,
চতুর্দিকে সে চেনার ছড়ায় আমেজ,
তার মধ্যে বারবার সব কিছু পেরিয়ে কেবলি
এক হওয়া মাথা নীচু ক'রে প্রাণে চাওয়া
—এই কি সে জীবনী যাপন ॥

২

আয়ুঃক্ষণ মহাবিত্ত, প্রকাণ্ড নিরালা সময়ে,
ছায়াহীন ইস্পাতী দিগন্তে কিছু মায়া।
পর্দায় পর্দায় রং লেগে যায় ক্ষণটুকু জুড়ে
তাকেই প্রাণের বলি একান্ত সময়;
নীচে তারি গাছ নদী
প্রিয়জন সে-মুহূর্তে চলে,
দোকানে কলেজে ট্রেনে সেই ক্ষণে আয়ু
কী বোঝায় কিছুই জানি না—
শুধু সে-মুহূর্তে বাঁচি তোমার ভুবনে ॥

৩

কথা শেষ না হতেই
উড়েছে এ প্লেন।
কথা কত স্তূপ হ'য়ে সাদা হ'য়ে আছে,
আছে নীচে চতুর্দিকে কাছে
ব্যথার উত্তাপে,
মেঘ হ'য়ে।
আলোয় গলিয়ে কবে দেবো ফিরে তাকে
সূর্যের রাস্তায় যেতে সেই সব কথা—
বারান্দায় মাটির ঘরের ধারে,
রাস্তার ফুটন্ত বীথিপাশে;
কথার আবেশ যদি ছড়ায় ঘূর্ণিত শূন্যকায়,
তবু জেনো শেষ কথা বাকি ছিল ॥

৪

কোথায় অদৃশ্য চোখ মনে যায়-আসে
কোথা থেকে আসে যায়।
দৃষ্টি খোলে মেঘ-কাটা যোজন নীলান্ত দূরে নীচে
—এরোপ্লেন হংস চলে পাখা মেলে—
প্রাণের রৌদ্রের ধরা, যেখানে স্নে গৃহকাজে
নিরন্ত আশ্চর্য বয় দরিদ্র সংসার।
বাগানে লোহার তারে কাপড় শুকোয়,
গাঁদা ফুল ফুটেছে সোনারগুচ্ছ,
ব্যথায় প্রভাতী বাজে কঠোর কোমল শ্রীরাগে
অশ্রুত সানাই—
আমাদেরি নিতান্ত আপন
কী আনন্দ দোলে দুদিনের ॥

চেনার গরম হাওয়া
বয়,
ফিরে আসে পুরোনো পৃথিবী
প্রাণের সময়।
উহু কী পাথুরে শীত ছিন্ন ঊর্ধ্বক্ষণে
নিঃসীমা অজ্ঞান মননে,
মনে পড়ে ফিরে এসে—
মৃত্যু থেকে নামি যেই বারবার।

তুষার তুলোর তলে বীজ, তার
পশ্চিমী বসন্তে দ্রুত ফিরে প্রাণ পায়,
অবলীন অপূর্ব ধারণ
নব কলেবরে এই প্রাণ মন
অবিকল্প সমাধির ঈথর স্পন্দিত অবসানে
কল্প কল্প অবতরণিকা॥

যুদ্ধ

শামসুর রাহমান

বারোমাস তুমি ক্ষ'য়ে গ'লে ঝ'রে
যা কিছু পেয়েছো বর্ষার মেঘে বাতাসের স্বরে
দিগন্ত-কাঁপা রোদের সাড়ায়
শত বছরের কবির চোখের প্রাণের তারায়
—নিত্য নিজেকে বলি বারবার—
বিনিময়ে তার
দু'দিনের যত সাধারণ সুখ
ছাড়ো হেসে-খেলে, শুধু এক-বুক
বেদনার রেণু ছড়িয়ে তোমার গানের ভাষায়
প্রগাঢ় অনেক অজানা আশায়
ভুলে গিয়ে ছেঁড়া হৃদয়ের ক্ষত,
যেই ঝড় আজো না-চাইতে আসে
মুছে ফেলে তাকে মেনে নাও এই বন্ধ্যা আকাশে
তারা-ফোটানোর ব্রত।

কিছু নেই যার বিত্তের কণা
বাজিয়ে সে তার চিত্তের তার আনে মূর্ছনা,
কত নেভা প্রাণে বাতি দেয় জেলে
আবেগের নীল শিখা-শিহরণে, ছাখে চোখ মেলে
গ্রীষ্মকঠিন বর্ষাকোমল শহরের মুখ
প্রেমিকের মতো গাঢ় উৎসুক।
আমি যা' কিছুই করি আহরণ দিন-রাত্তির
উজ্জ্বল বহু গ্রন্থ অথবা দেশ-কাল আর ভোরের শিশির,
পাখির বৃন্ত, কৃষ্ণচূড়ার রোদ্দুর থেকে

স্বচ্ছ মধুর মতো চেখে-চেখে—
ব্যর্থ হবে কি, ব্যর্থ হবে কি তা-ও একদিন ?
পাতা ঝ'রে যাক, ব্যথা মর্মরে প্রাণ হোক লীন :
বিদ্যুৎজ্বলা সৃষ্টি-আগুনে ঝরুক ঝরুক ঘন অবিরল
হৃদয়ের মেঘ-জল।

বাঁকাচোরা পথ দু'পায়ে মাড়িয়ে দেখি উদ্ধত
কৃপাণের মতো
জ্বলছে প্রাণের রৌদ্রের শিখা রাত্রির খাপে ;
যাকে ভালোবাসি তার ঠোঁটে কাঁপে
সূর্য-হাসির সোনালি-চিকন বালি-ঝরা আভা—
তার জন্যেই কখনো বাঁচার আনন্দ বাড়ে।
জলের কুমির ডাঙার বাঘের দুরন্ত থাবা
ক্রূর উদ্যত, হই না ছিন্ন পৃথিবীর দাঁত-নখের প্রহারে।
তবু জানি এত বিস্ময়-লাগা সভ্যতা আছে
জীবনের কাছে
বিনিময়ে তার
তুচ্ছ মেনেছি খণ্ড খণ্ড যুদ্ধের হার।
অস্ত্র আমার নেই কিছু শুধু গান নিয়ে আমি
সংসার রুখে দাঁড়ালে কঠিন প্রান্তরে নামি ;
যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছি তবুও মরিনি থাবার
প্রহারে এখনো ; সোনালি-চিকন সূর্য-হাসির, গ্রন্থ-আভার
পৃথিবীতে রোজ নতুন বোধের গাঢ় রূপাভাস,
বাঁচবার উল্লাস ॥

সমর্পণ

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

ফিরে এলাম, হে নির্ভয়, তোমার চোখে শান্তি
এখানে এই কিশোর তৃণ, মাটিতে গড়া স্বর্গে—
অতীত-ছায়া লগ্নে আমি নিজেকে দেবো অর্ঘ্য ;
সেই আমার অপ্রাপনীয় প্রাণের সংক্রান্তি।

ঘুমের দেশ ছেড়ে এলাম তোমার মহারাজ্যে
তোমার চোখ আলোকময়, মুছে দিলাম ক্লান্তি,
দু'হাতে ছিঁড়ে মুহূর্তের কত না ফুল সাজ যে
ফিরে এলাম হে নির্ভয়, তোমার চোখে শান্তি।

বাতাসহীন অরণ্যের জীবন নিঃশব্দ
সাগর-ঢেউ যৌবনের মিথ্যে দুরাকাঙ্ক্ষা
তারার মত চক্ষে জ্বালে বিচ্ছেদের শঙ্কা
অকস্মাৎ তোমাকে পাই যেন আকাশলব্ধ।

তোমার হাতে তুলে দিলাম এতদিনের ক্লান্তি
এবার পাবো দিনের স্বাদ রাতের হিমস্পর্শ
আমাকে দাও দুঃখ, দাও দুঃখময় হর্ষ
তোমাকে জানি, হে নির্ভয়, তোমার চোখে শান্তি।

নাম

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

বারবার করো না জিজ্ঞাসা
কে আমি এলাম।
ঘুচবে কি সকরুণ আশা
শুনলে এ নাম ?
তখন কি শুধু হাওয়া নিয়ে
নিয়ে ভোর বেলা
ডুবে যেতে পারবে অমিয়ে
বলো ত কোয়েলা!
তখন কি মনে ফুল গেঁথে
আকাশের গায়ে
লুকোতে পারবে ফাঁদ পেতে
নিশায় মিশায়ে
মৃদু বুক, তাই আমি কে যে
শুনতে চেয়ো না
নই প্রেম উঠব যে বেজে
অতনু সে-ও না।
আমারে আমার নামে পাওয়া
লাগবে না ভালো
থেমে যাবে রাত্রির হাওয়া
মেঘের সকালও ॥

কাক ডাকে

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কালোর কানে কানে আলোর কি যে কথা
গানের মতো কথা গানের সুরে সুরে
বাঁশীর সুরে সুরে কী যেন দেয়া নেয়া
পরান দেয়া আর হৃদয় নেয়া বুঝি ॥

আকাশে শুকতারা একলা পথ চলে
ছায়ার মতো পথে অবাক গান গায়,
কালোর কোলে আলো কী যেন লজ্জায়
সে-গানে রেঙে ওঠে, তখন ভোর হয় ॥

আলোকে চুমু খেয়ে রাতের রাণী যায়
কোথা যে রাত যায় কে জানে কোন দেশে,
উদাসী শুকতারা বাজিয়ে একতারা
হয়তো খোঁজে তাকে, গাছের শাখে শাখে
হীরার মালা পরে, তখন কাক ডাকে ॥

ছায়াছবি

স্বদেশরঞ্জন দত্ত

খেজুরের বন   পাতার ছাউনি   মাটির দেয়াল
কেন ছাড়লাম, কী হলো খেয়াল ?
ঘুমন্ত নদী পাশফেরা বন চারকোণা মাঠ
পরিপাটী পথ ছায়া ঢাকা ঘাট
সারারাত হাওয়া খোলা সারারাত ঘরের কপাট
—কেন ছাড়লাম ?
ভাটিয়ালি সুর ভরাজ্যোৎস্নায়
মাঝিদের নাও গাঙপার যায়,
—কেন ছাড়লাম ?
মন্দ ছিলো ?
ভোরে উঠে দেখা শিশু-সূর্যের একলাফে পার হওয়া চৌকাঠ।
ক্রমে বেলাবাড়া, খোঁড়া কাঠুরের জড়ো করা কাঠ।
এখানে সেখানে কেঁচো তুলে জড়ো ক'রেছে মাটি।
ধোপাদের বউ আদাড় বাদাড় কুড়িয়ে বাঁধছে পাতার আঁটি।
গামছার ফাঁদে জেলের ছেলেরা ধরছে মাছ।
কুমোরপাড়ায় রৌদ্রে শুকোয় মাটির ছাঁচ।
নদীর কিনারে বেলা দুপহরে গলিয়ে পিচ্
নৌকো উল্টে মাঝিরা মাথায় উপর-নীচ।
হেলা বাঁশঝাড় আড়ালে বিছোনো বালুর চর।
দাওয়ায় ছেলেটা এক মনে ব'সে কড়া চেটে খায় দুধের সর।
বিকেলে বিকেলে কালোমেয়েটির জল নিতে আসা,
শূন্য কলসী, খোলা জানালায় তাকানো চোখের নির্বাক ভাষা।
কেন হারালাম এতো ছায়াছবি সুপুরির বন জামতলা গ্রাম।
আর তো পাব না তখন বুঝিনি কেন ছাড়লাম ?
মন্দ ছিলো ?

সহজিয়া

পূর্ণেন্দুবিকাশ ভট্টাচার্য

কিছুই কাঁপে না সুখে শোকে
—যেন তথাগত সাড়া নেই—
তোমার চতুর চোরা চোখে,
হাসিও বাউল ক'রে তোল,
যদিও বয়স সবে ষোল।

মরমীর দূর দেবালয়ে
যেন ধূপসুরভি তনুর,
একটি স্তবের মত স্থির
কুন্তল তোমার ত্রিবেণীর,
—আকাশেরও প্রদীপ নেবেনি।

এ শুচিও রূপচিত শুধু,
স্বভাবের স্বচ্ছসিত নয়,
যবে এর কুহকী কর্পূর
উবে যাবে, রবে রৌদ্র ধূ-ধূ
—রূপ ক্ষমা করে না সময়।

দূরত্বের নির্লিপ্তি রেখ না
—ঋজুপাঠ হৃদয় শেখেনি—
আমাকে যা দেবে তা এখনি
দাও—অই ষোলটী শরৎ—
কামনার কবোষ্ণ কপোত।

উজ্জ্বল আবেগে থরথর
তুলে ধর বিকচ অধর ;
অকারণ দ্বিধা যদি আসে
শুনে নিও প্রকৃতি কী বলে :
অধরার পদ্মপ্রতিভা সে।

দূর বাঁধা কাছের শিকলে ॥

অপেক্ষা

অরবিন্দ গুহ

তোমার অপেক্ষা ক'রে থাকি।
এই এভিন্যুর বাঁকে বিবর্ণ বিছিন্ন হাঁকাহাঁকি
কোনোদিন স্তব্ধ কি হবে না? কারা আসে?
অনাত্মীয়, অবাঞ্ছিত। নানা গল্প সন্ধ্যার বাতাসে।
তারার পাড়ায় লঘু রক্তমেঘ ঘোরে ;
আরক্তিম আভা কাঁপে পৃথিবীর নগরে-নগরে।
এই প্রত্যাশার লগ্নে অনেক যৌবন জলে কাঁপে ;
কারো পরিণাম সুখে, কারো-কারো বিষণ্ণ বিলাপে।

কিছুই পারিনি, দিতে। শুধু অপেক্ষার মৌন ভাষা
আর আকাঙ্ক্ষার গান। দীর্ঘরেখা অস্থির পিপাসা
আমার সম্বল ; আমি আজো বীরোচিত
কিছু পারিনি কেবল পারি একা নিরুক্ত নিভৃত
বেদনার সঙ্গী হ'তে। তাই আমি বহুদূরে আছি ;
তোমার বাগান থেকে বারংবার আমার মৌমাছি
প্রত্যাখ্যাত হ'য়ে ঘরে এসে
ফুরোয় যৌবন তার ব্যথার মুহূর্ত ভালোবেসে।

অসংখ্য যৌবনমেঘ তোমার শরীর ভ'রে ঢেলে
দেবে স্তব, স্তবের শ্রাবণ। তুমি প্রত্যহ বিকেলে
নিরুপম উপহার পাবে!
লক্ষ বকুলের বাহু তোমাকে জড়াবে
সন্ধ্যায়, সকালে।
তুমি আমন্ত্রিত হবে ঊর্ধ্ববাহু অরণ্যের ডালে।

হৃদয়ের অগ্নি থেকে তুমি যতো আলো
তোমার ছ'চোখ ভ'রে জালো
রাত্রিদিন জলে-স্থলে বিভিন্ন ঋতুতে—
যৌবনের ইচ্ছা চায় শুধু তাকে একবিন্দু ছুঁতে।

কার যৌবনের ইচ্ছা স্পর্শ করে পূর্ণতার সীমা
সুদূরের নক্ষত্রনীলিমা।
এই এভিন্যুর বাঁকে বিজ্ঞতার সমস্ত সান্ত্বনা
প্রতিহত। ব্যর্থ, ক্লান্তিহীন বাসনার আনাগোনা
হৃদয়ের কূলে-কূলে। যোদ্ধা নই, হাতে নেই অসি।
অপেক্ষার এ-মুহূর্তে তবু আমি দুর্জয় সাহসী।

তোমার অপেক্ষা ক'রে থাকি
এই এভিন্যুর বাঁকে বিবর্ণ বিচ্ছিন্ন হাঁকাহাঁকি,
পরিহাস, প্রগল্‌ভতা। কে আসে, কে আসে?
কৌতুকে অথবা কৌতূহলে
এই অন্ধকার যেন কার কথা বলে।
এ-আকাশ ছেড়ে সব রক্তমেঘ আরেক আকাশে
চ'লে গেলো! সবি যায় আমার অপেক্ষা একা থাকে;
নগরের আলো জলে অন্ধকার এভিন্যুর বাঁকে।
অপেক্ষার মণি
চিরকাল একা জ্বলে, কোনোদিন তুমি তো আসো নি।

রক্তের প্রান্তর ভ'রে বাজে দ্রুত অশ্বখুরধ্বনি॥

নাম-না-জানা শিল্পীর আঁকা বিবসনা

লোকনাথ ভট্টাচার্য

[একদিন মধ্যরাতে হঠাৎ তাকে দেখলাম—অথচ
সে টাঙানো আছে বহুদিন আমারি দেয়ালে]

উঠেছে? সে উঠেছে কি
—ওঠেনি, সে-নারী শুধু শুয়েই রইল
স্তনে ঘিরে অবসন্ন মৃত্যুর চেতনা
বাহু দুটি ব্যর্থতার অব্যর্থ চুম্বনে বিবর্ণবরণা
ক্লান্ত এক মরুরিক্তপ্রদেশের বিলীন ফাল্গুনে নীল
উরুর আড়ালে স্বর্গ ক্ষীয়মাণ রসে রসে, দিন
তার রাত তার দিনরাত নয়, কিছু নয়, স্মৃতি তার
বিস্মৃতির অগম পারের আলো নিশ্চল নিভৃত

—শুয়েই রইল নারী, ওঠেনি তো

সাড়া দাও আজ এই অন্ধকার রাতে
দুকুল-আকুল-করা জোয়ার জেগেছে বেদনাতে
সাড়া দাও, হাত রাখো হাতে
আমি বড় একা

দেয়ালের কোণে কোণে গভীর নির্জনে
কথা জমে
নিবিড় নিরন্ধ্র নীলে নীলতর আবেগের মীড়ে
কথা জমে
সিন্ধু করে হাহাকার, এদিক-ওদিক ভাঙে ঢেউ
কথা জমে

অতলের গ্লানির সামান্য কোনো কণা
তীরে ফেলে দিয়ে যায় কেউ
অন্যমনা হাওয়ায় হাওয়ায়
তারো কথা জমে এই অতন্দ্র নিশায়

সাড়া দাও অন্ধকার রাতে
ক্ষতের মুখের রক্ত গোলাপের গন্ধ চায়
আমি বড় একা, আজ আমি বড় একা এমন নিশায়

কেন আমি একা আজ এমন নিশায়

যে-শিশু পেল না অন্ন, তারো কথা জানি
যে-মায়ের হাহাকার অরণ্যে ঝড়ের আনে বাণী
তবু এই রক্ত, এই গোলাপের রঙ
এই শুয়ে-থাকা নারী, নক্ষত্র চেনায় কী টিকানা
আশ্চর্য আগুনে এই অন্তর বহ্নির কারখানা

মানুষ পেল না অন্ন, ফুল তার কী করেছে
মানুষের পাপ
দেবতা কোথাও যদি থাকে, তার অভিশাপ
সেই সব পশুদের পরে
আরেক দধীচি-হাড়
যুগান্ত-সন্ধ্যায় শোনে আগামীর চূড়ান্ত বিচার

আবার ভাবনা ঢেকে ফেলে—প্রত্যহের তিক্ত সহচর
আলোহীন ছায়াহীন কায়ার স্বাক্ষর

দুর্জয় আশার ব্যথা, মানুষের প্রতি
ভালোবাসা, আত্মার আরতি
—কেন এত বেদনা আমার, কেন এত হে মহান
ভেঙে যাই নিঃশেষের ভাঙন কল্লোলে
চূর্ণীকৃত চেতনায় অন্ধকার হৃদয়ের বনে
টুকরো টুকরো হীরা জ্বলে

মুছে যায় রঙ—মেঘে মেঘে ক্লান্ত হয়
তারার আলোর গান
—জাগল না সেই নারী, শুয়েই রইল

দু'টি কবিতা

শোভন সোম

(এক)

সময়ের সমুদ্রের তীরে ব'সে আমরা ক'জন
আঙুলের দাগ শুধু কেটে গেছি।
অপরাহ্নে পাখির কূজন
থেমে গেলে, জ্যোৎস্না রাতে সবুজ ঢেউ-এর দিকে চেয়ে
বহুক্ষণ কাটিয়েছি
আজকে স্মৃতির গলি বেয়ে
যদি ফিরে যাই, গিয়ে কড়া নাড়ি খুলে তুমি দেবে কি দরোজা?
জানিনে, পুরোনো গল্প হয়ত এখন শুধু বোঝা!

(দুই)

তাহলে ঝরাও কান্না, আশ্বিনের বিলম্বিত ধারা
নামুক আকাশ ভরে, রুদ্ধগতি রাত্রির তিমির
ভরে দিক—ঘষা কাচে জলের করুণ আলপনা
আঁকা হোক—শংখ-শাদা শরীরের প্রতি ভাঁজে ভাঁজে
উঠুক উদ্বেল ঢেউ—চেতনার গভীর হৃদয়ে
নেবে যাও, মগ্ন হও। তারপর অন্ধকার, লাল কালো সব রঙ ধুয়ে
জন্ম নিক ঘাসে ঘাসে হীরে জলা আশ্চর্য সকাল।

এই মেঘ এই রৌদ্রের বনে

সৈয়দ শামসুল হক

প্রত্যহ তুমি প্রত্যয় দাও অঞ্জলি ভ'রে
এই মেঘ এই রৌদ্রের বনে তুমি।
তুমি এই ছায়া কাঠগোলাপের নীচু এক শাখা ধ'রে:

ফাগুনের বনে খবর ছড়াও আগুন লেগেছে নাকি!
চৈত্রের পাতা দগ্ধবরণ, তবু দিনমান
তোমার স্বভাব এই পথে শুনে থাকি।

সহজ সুরের কড়ি ও কোমল চৈত্রের ধূ ধূ চর,
তুমি কি আমার দু'হাতে এখনো
খোঁজো নিবিড়তা নিশিদিন সুন্দর?

সন্ধ্যে-সকাল নাগরিক মনে নেই বিশ্রাম যদি
দৈনন্দিন হৃদয়কে দাও উত্তরণের আশা,
চেতনায় করো সংহতি সঞ্চার
এই মেঘ এই রৌদ্রের বনে তুমি॥

হৈমন্তী

বটকৃষ্ণ দাস

তুমি নির্জন নীল আকাশের তারা,
সন্ধ্যার তিমিরাঞ্চলে উড্ডীন ;
দ্বিধা দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে আত্মহারা
তোমাকেই দেবো এই হেমন্তদিন।

দীর্ঘ দিনের সঞ্চিত বেদনায়
আমি যে ক্লান্ত কালের অন্ধকারে ;
প্রাণধারণের দুঃসহ তাড়নায়
আত্মগ্লানির বোঝাই কেবল বাড়ে।

তুমি ছিঁড়ে দাও এই ক্লান্তির ভার,
তোমার আগুনে আমায় শুদ্ধ করো ;
জীবন-যুদ্ধে সিদ্ধি কোথায় আর ?
দিনে দিনে আয়ু ক্রমেই হ্রস্বতর।

তুমি ছাড়া আর মুক্তি কোথাও নেই,
জীবনের পাপে নিরুদ্ধ ভোগবতী ;
তুমি আনো জীবনের গূঢ় অর্থেই
দ্বৈত-প্রেমের একাকার সংহতি।

তোমাকেই দেবো এই হেমন্তদিন,
উজ্জীবনের পুষ্পিত প্রত্যয়ে ;
এ-হৃদয়ে আনো নব দিগন্তে লীন
শুভ্র উষসী, রঙিন সূর্যোদয়ে।

মধুবনী থেকে কানাডা

শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবী

আরতি, তোমারো ছিলো ভালোবাসা, ভাবে-ভাসা দিন।
আজ
হয় তো তা কাজ দিয়ে ভরপুর,—বিশ্রামে বিলীন।
সাধারণ মেয়ে, তবু খেতাবী স্বামীর সাথে সাথে
শুনছি তুমিও যাবে দূর কানাডাতে,
সেপ্‌টেম্বরে ছাড়বে জাহাজ।
আরতি, তোমাকে বড়ো মনে পড়ে আজ।

আপেক্ষিক দূরত্বের তত্ত্ব জানি।
মধুবনী যতো দূরে,—কানাডাও ঠিক ততোখানি।
সেই মেয়ে থেমে গেলো,—যাকে মনে ক'রে
আমার নির্জন রাতে স্বপ্নের পাখিরা আজো ওড়ে !
তিনটি বছর জুড়ে, তাকে
মধুবনী কী মায়ায় ভুলিয়ে নিঃশুব্ধ ক'রে রাখে ?
পায়ে তার কোন্ প্রাণ লুটোয় সে-গ্রামের নির্জনে ?
যাদুকরী সেখানে কি যাদু করে পাড়া-পরিজনে ?

বুঝি তাই হবে।
প্রতিষ্ঠা পেয়েছে মেয়ে বধুর গৌরবে।
সকালে বিকেলে রাতে, সেবায় শীতল হাতে তাই খেলা করে
সংসারের রুক্ষ বালুচরে।
দুপুরে মেয়েরা আসে,—আরতির ছবি-ছবি ঘরে
বসে তারা। উল বোনে কেউ, কেউ শেলাই বা করে।
কূজনে-মর্মরে ভরা প্রত্যেকটি সম্পূর্ণ দুপুর।
শাশুড়ির ঘর থেকে ভেসে আসে রামায়ণী স্বর।

কবে তুমি কানাডায় যাবে ?
মধুবনী ভুলে গিয়ে, নিজের স্বভাবে
আবার কি বাঁচবে আরতি ?
দুরাশা দুর্জয় বটে : ভাবনার নেই কি সংগতি ?
কানাডা তো মধুবনী নয়।
সেখানে পেলেও তুমি পেতে পারো একটু সময়।
ল্যাবরেটরির কাজে ডকটর যখন ব্যস্ত খুব,
শীতের দুপুর মিঠে,—চারদিক চুপ,
তখন তোমার মন একবার অতীতের নিষিদ্ধ জানালাগুলি দিয়ে
দেখবে না পেছনে তাকিয়ে ?
মনে কি করবে তাকে কানাডার নির্জন দুপুরে
কাছে থেকে আজ যাকে রেখেছো হৃদয় থেকে দূরে ?

তাকে আজ ডাকি

সুনীলচন্দ্র সরকার

সবি আছে, তবু এতকাল
র'য়েছি একাকী
যে এলে সমস্ত পূর্ণ হবে
তাকে আজ ডাকি।

কত কার কত কি যে হই
মন-সাড়া দিয়ে,
ভূমিকায় নামি, কিন্তু রই
তার চে পিছিয়ে :
আমাকে আলাদা ক'রে রাখে
হিসেবের ফাঁকি,
যে এলে সকলি সত্য হবে
তাকে আজ ডাকি।

নিজেকে পাইনি তা তো নয়
নিজেরি কোরকে,
দিনের বিস্তৃত অবধানে,
রাতের স্মারকে :
তবু মনে, রক্তের স্বননে
দুর্বলের বাকি,
যে এলে জোয়ার পূর্ণ হবে
তাকে আজ ডাকি।

দেখেছি তারার বৈঠা লাগে
যে শান্ত সাগরে,
ভ'রেওছি তার কিছু কিছু
বুকের গাগরে,
তবু এ শান্তির অ-স্বীকৃত
নৈর্ব্যক্তিক আঁখি
যে এলে সম্পর্ক স্নিগ্ধ হবে
তাকে আজ ডাকি।

জীবনস্মৃতি

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

টালিগঞ্জে গীর্জের চূড়োয়
একটি চড়ুই একলা সকালের রোদ্দুর কুড়োয়।

অন্যদিকে কলকাতার আর-সব মাঠে
যে রোদ্দুর ভোরবেলা ঘোমটা তুলে সূর্যকে ত্যাখেনি,
সকাল সাতটায় সেই বধূটিও খুলে ফেলে বেণী
সপ্রতিভ দাঁড়ায় চৌকাঠে।
নাগরিক হাওয়া আসে, দোঁহে কোনো পরামর্শ আঁটে!

সময় বাজায় এগারোটা;
তাহলেও টালিগঞ্জে গীর্জের চূড়োয়
ভোর যেন ফুরোয় না—শিশিরের চন্দনের ফোঁটা
ধবল চড়ুই বুঝি দূরে গিয়ে তবু তাকে ছোঁয়।

এইবারে নিলাজ বধূটি
পাড়ার ছেলেকে দিয়ে পেড়ে নিয়ে চড়ুইয়ের ছানা
চেপে ধরে মুঠি,
যাদুকরী ছিন্ন করে শিশিরস্নাত ছুটি ডানা—
নিজের প্রখর রৌদ্রে তারপর প্রহর পোহায়।

দূরে নামে কারখানার ছুটি,
দিনমজুরের মন ছেয়ে যায় ধোঁয়ায় ধোঁয়ায়।
লজ্জায় নিজেকে ঢেকে সেই বউ ঘরে ফিরে যায়।

তবু দেখি টালিগঞ্জে গীর্জের আড়ালে
ছোটো চড়ুইয়ের ছায়া মিটি-মিটি জোনাকিরা জ্বালে;
ছুটির ঘণ্টায় বাজে একরাশ ঝিঁঝির শরীর,
বিষণ্ন বাতাসে তুলে মুলতানের মীড়
তারা সব জড়ো হয়, ঐকতানে কাঁপে থরোথরো :
'জানি জানি সে-চড়ুই কোকিলের চেয়ে ঢের বড়ো ॥'

শীতরাত্রির প্রার্থনা

বুদ্ধদেব বসু

এসো, ভুলে যাও তোমার সব ভাবনা, তোমার টাকার ভাবনা, স্বাস্থ্যের ভাবনা,
এর পর কী হবে, এর পর,
ফেলে দাও ভবিষ্যতের ভয়, আর অতীতের জন্য মনস্তাপ।
আজ পৃথিবী মুছে গেছে, তোমার সব অভ্যস্ত নির্ভর
ভাঙলো একে-একে ;—রইলো হিম নিঃসঙ্গতা, আর অন্ধকার নিস্তাপ
রাত্রি ;—এসো, প্রস্তুত হও।

বাইরে বরফের রাত্রি। ডাইনি-হাওয়ার কনকনে চাবুক
গালের মাংস ছিঁড়ে নেয়, চাঁদটাকে কাগজের মতো টুকরো ক'রে
ছিটিয়ে দেয় কুয়াশার মধ্যে, উপড়ে আনে আকাশ, হিংসুক
হাতে ছড়িয়ে দেয় হিম ; শাদা, নরম, নাচের মতো অক্ষরে
পৃথিবীতে মৃত্যুর ছবি এঁকে যায়।

তাহ'লে ডুবলো তোমার পৃথিবী, হারিয়ে গেলো চিরদিনের অভিজ্ঞান ;
ফুল নেই, পাখি ডাকে না, নাম ধ'রে ভরা গলায় ডাকে না কেউ ;
অচেনা দেশ, অস্থায়ী ঘর, শূন্য ঘরে নিঃসম্বল প্রাণ,
আর বাইরে উত্তরের শীত, অন্ধকার, মেরু-হাওয়ার ঢেউয়ের পর ঢেউ।
এই তো সময় ;—সংহত হও।

সংহত হও, নিবিড় হও ; অতীত এখনো ফুরিয়ে যায়নি, ভুলো না,
যে-অতীত অপেক্ষা ক'রে আছে তোমার জন্য, তারই নাম ভবিষ্যৎ ;
যাবে, হবে, ফিরে পাবে। মুহূর্তের পর মুহূর্তের ছলনা
কেবল চায় বেঁধে রাখতে, লুকিয়ে রাখতে। কিন্তু তোমার পথ
চ'লে গেছে অনেক দূরে, দিগন্তে।

সেই প্রথম দিনে কে হাত রেখেছিলো তোমার হাতে, আজো তো
মনে পড়ে তোমার,
যাতে মনে পড়ে, ভুলতে না পারো, তাই অনেক ভুলতে হবে তোমাকে,
যাতে পথ চলতে ভয় না পাও, ফেলে দিতে হবে অনেক জঞ্জাল,
সাবধানের ভার,
হ'তে হবে রিক্ত, হারাতে হবে যা-কিছু তোমার চেনা, যাতে পথের বাঁকে-বাঁকে
পুরোনোকে চিনতে পারো, নতুন ক'রে।

এসো, আস্তে পা ফ্যালো, সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসো তোমার শূন্য ঘরে—
তুমি ভ'রে তুলবে, তাই শূন্যতা। তুমি আনবে উষ্ণতা, তাই শীত।
এসো, ভুলে যাও তোমার টাকার ভাবনা, বাঁচার ভাবনা, হাজার ভাবনা—
আর এর পরে
তোমার দিকে এগিয়ে আসবে ভবিষ্যৎ, পিছন থেকে ধ'রে ফেলবে অতীত।
এসো, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও আজ রাত্রে।

তা-ই চাও তুমি, তারই জন্য তোমার বুভুক্ষা ; এই মৃত্যুর হাতেই
মুহূর্তের পর মুহূর্তের ছলনা হবে ছিন্ন ;
যেমন তোমার চোখের সামনে পৃথিবী ম'রে গেলো আজ—ফুল নেই,
সব সবুজ নিবে গেছে, চারদিকে শুধু কঠিন শাদা স্তব্ধতার চিহ্ন—
তেমনি তোমাকে ডুবতে হবে, তোমাকেও।

ডুবতে হবে মৃত্যুর তিমিরে, নয়তো কেমন ক'রে বেঁচে উঠবে আবার ?
লুপ্ত হ'তে হবে পাতালে, নয়তো কেমন ক'রে ফিরে আসবে আলোয় ?
তুমি কি জানো না, বার-বার মরতে হয় মানুষকে, বার-বার,
দুলতে হয় মৃত্যু আর নবজন্মের বিরামহীন দোলায়
সত্যি যদি বাঁচতে হয় তাকে।

অন্ধকারকেই মৃত্যু নাম দিয়েছি আমরা। বীজ ম'রে যায়,
যখন অদৃশ্য হয় মাটির তলার সংগোপন গূঢ় গহ্বরে ;
শীত এলে ম'রে যায় পৃথিবী, ঝ'রে যায় পাতা, নেয় বিদায়
ঘাস, ফুল, ঘাস-ফড়িং ; নেকড়ে আসে বেরিয়ে ; কালো, কালো
নিষ্ঠুর কবরে
হারিয়ে যায় প্রাণ—ধবধবে তুষারের তলায়।

তেমনি তুমি ;—তোমারও রোদ ম'রে গেলো, ঘন হ'য়ে ঘিরলো কুয়াশা,
তোমার আলোর পৃথিবী ছেড়ে তুমি নেমে এলে পাতালে,
তোমার রঙিন সাজ ছিঁড়ে গেলো, মুছে গেলো নাম, ভুলে গেলে
তোমার ভাষা,
যত চোখ তোমাকে চিনেছিলো একদিন, সেই সব উৎসবের মতো
চোখের আড়ালে
তুমি মিলিয়ে গেলে—অন্ধকার থেকে অন্ধকারে।

কিন্তু মাটীর বুক চিরে লুপ্ত বীজ ফিরে আসে একদিন,
আবার দেখা দেয়, অন্য নামে, নতুন জন্মে, রাশি-রাশি ফসলের ঐশ্বর্যে ;
আর এই শীত—তুমি তো জানো—প্রত্যেক ফোঁটা বরফের সঙ্গে
তারও শুধু জ'মে উঠছে ঋণ,
সব শোধ ক'রে দিতে হবে ; প্রচ্ছন্ন প্রাণ অবিচল ধৈর্যে
জেগে আছে দীর্ঘ, দীর্ঘ রাত্রি।

শুধু জেগে আছে তা-ই নয়, কাজ ক'রে যাচ্ছে গোপনে-গোপনে,
সৃষ্টি ক'রে যাচ্ছে মৃত্যুর বুকে নতুন জন্ম, কবর ফেটে অবুঝ
অদ্ভুত উৎসারণ, পাথর ভেঙে স্রোত, বরফের নিথর আস্তরণে
স্পন্দন—যখন ঘোমটা ছিঁড়ে উঁকি দেবে ক্ষীণ, প্রবল, উজ্জ্বল, আশ্চর্য সবুজ
বসন্তের প্রথম চুম্বনে।

আর তাই এই মৃত্যু তোমার প্রতীক্ষা—তোমাকে তার যোগ্য হ'তে হবে,
ভুলতে হবে সাবধানের দীনতা, হাজার ভাবনার জঞ্জাল ;
সন্দেহ কোরো না, প্রতিবাদ কোরো না ; নিহিত হও এই কঠিন হিম ধবধবে
আস্তরণের অন্তঃপুরে, বীজের মতো—যেখানে অপেক্ষা ক'রে আছে
তোমার চিরকাল।
উৎসর্জন করো, সমর্পণ করো নিজেকে।

নিবিড় হ'লো রাত্রি, পাৎলা চাঁদ ছিঁড়ে গেলো, নেকড়ের মতো অন্ধকার,
দলে-দলে ডাইনি বেরোলো হাওয়ায়, আততায়ীর ছুরির মতো শীত।
এরই মধ্যে তোমার যজ্ঞ ; উৎসর্গ হবে প্রাণ, আগুন জ্বালবে আত্মার,
ভস্ম হবে যাকে ভেবেছো তোমার ভবিষ্যৎ, আর যাকে জেনেছো তোমার অতীত।
পবিত্র হও, প্রতীক্ষা করো।
ঐ শোনো, ঘণ্টা বাজে গির্জেতে ; এদের উৎসবের ক্ষণ আসন্ন,
ঈশ্বরের একজাত, একমাত্র পুত্রের জন্মের স্মরণে ;—
কিন্তু তুমি—তোমার শরীর ভিন্ন মাটিতে তৈরি, অন্য
গান বাজে তোমার রক্তে, অন্য এক আশ্বাসের উচ্চারণে
ধ্বনিত তোমার ইতিহাসের আকাশ।

তুমি জেনেছো, মানুষমাত্রেই অমৃতের পুত্র—শুধু একজন নয়, প্রত্যেকে,
তুমি বলেছো, অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে যাও, মৃত্যু থেকে অমৃতে,
তুমি শুনেছো, জন্মের পর জন্মান্তর আবর্তের মতো এঁকে-বেঁকে
অমৃতের দিকে নিয়ে যায় ;—আর এই জীবন, সেও তার সময়ের
সীমায়, মাংসের গণ্ডিতে
বন্দী হ'য়ে থাকবে না।

তাই তো জানো তুমি—বার-বার মরতে হয় মানুষকে, নতুন ক'রে
জন্ম নেবার জন্য,

শুধু জন্ম-জন্মান্তর নয়, একই জন্মে তার এই মৃত্যু আর পুনরুত্থান,
শুধু একজনের নয়, সকল মানুষের আকাঙ্ক্ষার অরণ্য
লুকিয়ে রেখেছে চিরকাল এই বুভুক্ষা—তারই জন্য সব কান্না,
সব কান্না-ভরা গান,
বুকে বুক রেখে তৃপ্তিহীন প্রেমিক।

তৃপ্তিহীন বিরহে তুমি জ্বলছো—জ্বলতে দাও, পুড়ে যাক যা-কিছু
তোমার পুরোনো,
ডিমের খোলশের মতো ফেটে যাক তোমার পৃথিবী, বেরিয়ে আসুক
অন্য এক জগৎ,
এই পাতাল বেয়ে নেমে যাও আরো, আরো অন্ধকারে ; যখন সব
হারাবে, কোনো
চিহ্ন আর থাকবে না, তখনই তোমাকে ধ'রে ফেলবে অতীত, এগিয়ে আসবে
তোমার দিকে ভবিষ্যৎ
সব নতুন—নতুন হ'য়ে।

সময় হ'লো, বাইরে অনাকার অন্ধকার, প্রেতের চীৎকারের মতো হাওয়া ;
অচেনা দেশ, অস্থায়ী ঘর, শূন্য ঘরে নিঃসম্বল প্রাণ ;
আজ আর কিছু নেই তোমার—শুধু একফোঁটা রক্তে-লীন সংগোপন
ঝাপসা পথ-চাওয়া
এই ব্যাপ্ত কুয়াশার মধ্যে ক্ষীণ, ক্ষণিক, লুকিয়ে-থাকা তারার মতো
কম্পমান।
প্রস্তুত হও, প্রতীক্ষা করো তোমার মৃত্যুর জন্য।

যে-মৃত্যুকে ভেদ ক'রে লুপ্ত বীজ ফিরে আসে নির্ভুল,
রাশি-রাশি শস্যের উৎসাহে, ফসলের আশ্চর্য সফলতায়,

যে-মৃত্যুকে দীর্ণ ক'রে বরফের কবর ফেটে ফুল
জ'লে ওঠে সবুজের উল্লাসে, বসন্তের অমর ক্ষমতায়—
সেই মৃত্যুর—নবজন্মের প্রতীক্ষা করো।

মৃত্যুর নাম অন্ধকার; কিন্তু মাতৃগর্ভ—তাও অন্ধকার, ভুলো না,
তাই কাল অবগুণ্ঠিত, যা হ'য়ে উঠছে তা-ই প্রচ্ছন্ন;
এসো, শান্ত হও; এই হিম রাত্রে, যখন বাইরে-ভিতরে কোথাও
আলো নেই,
তোমার শূন্যতার অজ্ঞাত গহ্বর থেকে নবজন্মের জন্য
প্রার্থনা করো, প্রতীক্ষা করো, প্রস্তুত হও।

রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা

সুনীলচন্দ্র সরকার

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বাংলার আধুনিক কবিদের সম্পর্ক আকর্ষণ বিকর্ষণের লীলায় বিচিত্র। একদিকে আমাদের কবিরা যেমন অনুভব করেছেন রবীন্দ্রমণ্ডল থেকে বেরিয়ে যাবার তাগিদ, সেই দীপ্ত মধ্যাহ্নপ্রসার থেকে দূরে নিজেদের এলাকা আবিষ্কারের আকাঙ্ক্ষা, অপরদিকে দেখি তাঁদের বারবার ফিরতে হয়েছে রবীন্দ্রভূমিতে। নূতন যুগের নূতন প্রয়োজন তাঁরা অনুভব করেছেন, আজকের পৃথিবীর সমস্যাকীর্ণ সভায় নিজের নিজের ভূমিকা ও ভঙ্গী তাঁরা খুঁজেছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে পেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমানবতা পাশ্চাত্য-দেশের পক্ষে উপর থেকে নেমে আসা একটা সমাধান, ভিতর থেকে হয়ে-ওঠা নয়। কারণ তারা চিরকাল বেঁচে আসছে একান্ত সংসারমনস্কভাবে। আমাদের কবিরা সংসারযাত্রার এই বাস্তবভূমিতেই মিলন চেয়েছেন পশ্চিমের সঙ্গে, সমস্ত জগতের সঙ্গে। ভারতীয় সাহিত্যে এই প্রথম তাঁরা ঐকান্তিকভাবে ঐহিকতার সাধনা সুরু ক'রেছেন। তাছাড়া এদেশে সার্থক ও মহৎ কোনো সাহিত্যরীতির প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থনে ব্যক্তিত্ব-বিসর্জনের প্রথা চলে এসেছে। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস দু'জনেই বৈষ্ণবকবি এবং স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও একটি গোষ্ঠীর অন্তর্গত। আমাদের কবিরা দল বাঁধার প্রবৃত্তি ত্যাগ ক'রে ব্যক্তিত্বকে তার নিজস্ব মর্যাদায় ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। সমতানের মাধুর্য ত্যাগ ক'রে বিরোধের মধ্যে যে harmony, তাই তাঁদের কাম্য। তাঁরা তাঁদের কাব্যজগতে সমীকরণ খোঁজেননি; যা বিশিষ্ট, যা phenomenal, যা unique তারই মধ্য থেকে আহরণ করতে চেয়েছেন কাব্যের উপাদান। এঁরা উপলব্ধি করেছেন যে রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ সাধনার পরও কাব্যের সংসারের সমস্ত দায়িত্ব ও কর্তব্যের শেষ হয়নি। এবং তা কখনো হবার নয়। এই দায়িত্ববোধের দ্বারাই তাঁরা সাবালকত্ব অর্জন করেছেন, এবং তৎক্ষণাৎ নিজেদের স্বাধীন সম্ভাবনাও যেমন বুঝেছেন, তেমনি টের পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁদের নিগূঢ় আত্মীয়তা। এমন এক আত্মীয়তা যা

আটকে রাখে না, এগিয়ে দেয়। ইয়োরোপের আধুনিক কবিদের চেয়ে এই বিষয়ে এঁরা ভাগ্যবান্। এঁদের নবজয়, নূতন অধিকারের আনন্দও আছে, এবং বিশাল এক আত্মিক জন্মভূমি থেকেও এঁদের চ্যুত হ'তে হয়নি। তাই যদি এঁরা সাময়িকভাবে রবীন্দ্রনাথকেও ভুলে থাকেন, তবু কবি হ'তে ভোলেননি। কত অল্প অপচয়ে আজ এঁদের কাছ থেকে আমরা কিছু নতুন কাব্য লাভ করেছি। কাব্যকে রক্ষা ক'রে এঁরা দেশকে একটা আসন্ন গদ্যময়তা, শুষ্ক স্রোতহীনতা থেকে বাঁচিয়েছেন, যা রবীন্দ্রনাথের মত কবির তিরোধানের পর মোটেই অস্বাভাবিক হত না। আজ যে রবীন্দ্র-জন্মোৎসব তার জনতাসুলভ অস্পষ্ট আন্দোলনের মধ্য থেকে একটি মিষ্ট শান্ত উৎসবরূপ গ্রহণ করছে তার মূলে নিশ্চয় অনেক পরিমাণে আছে আমাদের আধুনিক কবিদের দান। বিক্রমাদিত্যের প্রহরী সেই বীরবলের মত তাঁরা সকলকেই যেতে দিয়েছেন, শুধু কাব্যলক্ষ্মীকে নয়, তাই রবীন্দ্রনাথও থেকে যেতে বাধ্য হয়েছেন। প্রমাণিত হয়েছে, অন্ততঃ এই বাংলাদেশে, নিদারুণ বিভ্রান্তির দিনেও রবীন্দ্র-সূর্যের নির্বাপন আমরা সহ্য করতে পারবো না।

রোম্যান্টিক যুগের পর থেকে যে সমস্যাগুলি ক্রমশঃই প্রখর হ'য়ে উঠেছে তার প্রথম সার্থক সমাধান পাই রবীন্দ্রনাথে। কিন্তু তিনি স্বাধিকৃত যুগকে অতিক্রম ক'রে পরবর্তী যুগেও পদক্ষেপ ক'রেছেন। বহুদিন পর্যন্ত অতি-আধুনিক কবিদের উচ্চ-প্রচারিত সমস্যাগুলির প্রতি তাঁর সহানুভূতি কুণ্ঠাগ্রস্ত ছিল, তার পরিচয় আছে তাঁর 'সাহিত্যে আধুনিকতা' প্রবন্ধে। কিন্তু সভ্যতার যে সংকট শেষবয়সে তাঁকে দেখতে হ'য়েছিল, তাই তাঁকে বাধ্য করেছিল এইসব আধুনিক সমস্যার বিক্ষুব্ধ রণাঙ্গনে নেমে আসতে। শেক্‌স্‌পীয়র দৈববলে দীর্ঘ জীবনের অধিকারী হ'য়ে যদি ড্রাইডেন-পোপের সাহিত্যিক সমস্যা সমাধানে অগ্রসর হ'তেন সে যেমন কৌতূহলের বিষয় হ'ত, রবীন্দ্রনাথের এই অসময়ে আধুনিক সমস্যায় হস্তক্ষেপও তেমনি একটা ঐতিহাসিক মির‍্যাক্‌ল্। তার ফলে আধুনিক সমস্যা কতটাই বা মিটল, আর কতটুকু মিট্‌ল না, কেনই বা মিটল না এবং যা মিটল না তা পূরণ করবার যোগ্যতা আমাদের আধুনিক কবিদের আছে কি না তাই এবার বুঝে দেখবো।

কিন্তু তা বুঝতে হ'লে সেই রোম্যান্টিক যুগ থেকে আজ পর্যন্ত একটা দ্রুতদৃষ্টিক্ষেপের দরকার আছে। রোম্যান্টিকরা মনের অশান্ত নিম্নচারী আকাঙ্ক্ষা প্রবৃত্তিগুলিকে নিরোধ ক'রে জীবনবৃত্তের অনেকটা বর্জন ক'রে লাভ করেছিলেন তাঁদের কাব্যলোক। তাই আলোঅন্ধকারের তীব্র বিরোধে শেলির কাব্যজগৎকে মনে হয় যেন গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবির মত। নাইটিঙ্গেলের গানের মত কীট্‌সের পূর্ণকণ্ঠ হৃদয়গীতিও দাবী করে একটা দূরত্ব, একটা স্তিমিত স্বপ্নপরিবেশ। ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রকৃতি ও জীবনের মাত্র বাছাই-করা একটা অংশে heaven ও home—স্বর্গ ও নীড়ের সমন্বয় পেয়েছেন এবং সে সমন্বয়ও তাঁর উত্তরজীবনে স্থায়ী হয়নি। উর্ধ্বমন যে আলো যে বিশ্বজনীন অধিকার ও আত্মীয়তার আশ্বাস পেয়েছে তাই দিয়ে সমস্ত জগৎকে আবৃত করবার, আয়ত্ত করবার ব্যর্থচেষ্টার ট্রাজেডি দেখতে পাই গ্যেটের ফাউষ্ট-এ। অন্তরের গোপন প্রাপ্তির সঙ্গে তীক্ষ্ণ নির্লজ্জ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণবুদ্ধির সামঞ্জস্য খুঁজে জীবন কাটলো টেনিসন-ব্রাউনিং-এর। তারপরও চেষ্টা চলল রোম্যান্টিক ভাবমণ্ডলের এক একটি উপাদান খসিয়ে নিয়ে তার সাগ্রহ অনুশীলন, যদি কোনোটির মধ্য দিয়ে সেই শুদ্ধতম, শাশ্বততম আলোটি জ্ব'লে ওঠে যা রোম্যান্টিক সাধনার মূল লক্ষ্য। কিন্তু অনেক সৌন্দর্যবাদ, কাব্যের শুদ্ধস্বরবাদ, প্রতীকবাদ সত্ত্বেও পাওয়া গেল না সেই আলো। অথচ জগতে তখন ক্রমশই ঘনিয়ে আসছে দুর্যোগ, কিন্তু কি করতে হবে তা জানা নেই। সে এক অস্বস্তিকর যুগ গেছে জীবনে ও কাব্যে। ক্রমশঃ ইয়োরোপের চিন্তকদের, কবিদের অবস্থা হয়ে উঠল রবীন্দ্রনাথের আষাঢ়ে-গল্পের সেই বালক নায়কটির মত, যে এক সুন্দরী যুবতী মেয়ের সঙ্গে একই ঘরে বসবাস ক'রেও কিছুতে বুঝে উঠতে পারছে না—কেউ তাকে বুঝিয়ে দিচ্ছে না—সে ঐ মেয়েটির কে হয়। ইয়োরোপের কবিরাও কিছুতেই স্থাপন করতে পারছিলেন না জীবনসত্যের সঙ্গে, যুগাত্মার সঙ্গে, একটা সত্য সম্পর্ক। আবার নতুন ক'রে খোঁজ সুরু হয়েছিল নানারকম ব্যক্তিগত মৌলিকতার সন্ধানী আলো ফেলে। এমন সময়ে ইয়োরোপে উপস্থিত হল রবীন্দ্রনাথের সমাধান।

গীতাঞ্জলি ইয়োরোপকে যা পরিবেশন করেছিল তাতে তখনকার ইয়োরোপ ব'লে উঠেছিল 'ইউরেকা'। সকল রকমের আদর্শ, আইডিয়া বা কল্পকুসুমের প্রতি একটা বিতৃষ্ণা তখন ইয়োরোপে তীব্র হয়ে উঠেছে এবং গীতাঞ্জলি এর কোনোটা নিয়েই সেখানে উপস্থিত হয় নি। নিয়ে গিয়েছিল জীবনসত্যের সঙ্গে একটি সুপ্রমাণিত সর্বাঙ্গীন সম্পর্কের সাক্ষ্য। সেই মেয়েটির সঙ্গে সেই ছেলেটির সম্বন্ধের রহস্য। দেখা গেল রোম্যান্টিক প্রতিশ্রুতি কেমনভাবে স্থায়ী সুসমঞ্জস সত্যে পরিণত হতে পারে। গীতাঞ্জলির মধ্যে নিক্রান্ত যে অন্তরতম মানবসত্তা সে কত সহজে আপন করেছে সব কিছুকে, বিরোধ মিটিয়েছে স্বর্গের সঙ্গে মর্তের, প্রকৃতির সঙ্গে অন্তঃপ্রকৃতির, নিয়তির সঙ্গে নিজস্ব স্বাধীনতার।

রোম্যান্টিক কবিরা দাবী করেছিলেন চিত্তের একধরণের বাষ্পায়ন, বা, বৈজ্ঞানিক পরিভাষায়, উর্ধ্বপাতন। সে দাবী ইয়োরোপীয় সমাজ স্বীকার করেনি। গীতাঞ্জলিতে সহজকে স্বাভাবিককে পরিহারের দাবী নেই, গ্রহণের বাণীই আছে। কিন্তু এই গ্রহণকে সার্থক করতে হ'লে যে নির্লিপ্তি, যে বৈরাগ্য, যে ত্যাগের-দ্বারা-ভোগের প্রয়োজন তা ইয়োরোপের ধাতস্থ নয়। বিশেষতঃ ইয়োরোপের অন্তঃপ্রকৃতির একটা গূঢ় ইঙ্গিত মেনেই যেন মানুষের ভাগ্যবিধাতা বিকল করে দিলেন সভ্যতার রথ। কুটিল হাসি হেসে খুলে দিলেন মানুষমনের নীচেকার বিষাক্ত বাষ্পের valve.

রবীন্দ্রসমাধানকে গ্রহণ ক'রে পৃথিবী এগিয়ে যেতে পারতো নূতন সম্ভাবনায়, কিন্তু দেখা গেল তা হবার নয়। এখনো অনেক বাকিবকেয়া আছে যা মেটাতে হবে, তবেই নতুন খাতা খোলা সম্ভব। সেই বাকিবকেয়ার অভিযোগ তাই অপ্রতিরোধ্য ভাবে মুখর হয়ে উঠল। দাবী উঠল ভিতের নিম্নতম স্তর থেকে নতুন ক'রে গ'ড়ে তোলবার। Humanism ও Renaissance-এর ক্রোড়দৃশ্যটুকু বাদ দিলে বলা যায় ইয়োরোপ বরাবর খুঁজেছে রক্তমাংসের, মেরুমজ্জার মধ্যে, লৌকিক passions-এর মধ্যে, যৌথ জীবনযাত্রার বিচিত্র তরঙ্গে, ইতিহাসের ঘাতপ্রতিঘাতে, তার ইষ্টের স্বাক্ষর। আত্ম-উন্নয়নের দাবী অস্বীকার ক'রে, সমস্ত সজ্জা, সংস্কৃতি, প্রস্তুতির

অভিমান ত্যাগ ক'রে, সে চাইল আদিম অপ্রস্তুত স্বভাবে ফিরে যেতে। মানল না আর বুদ্ধিকে, উচ্চমনের দীপ্তবিস্তারকে। সত্যকে যাচিয়ে নিতে চাইল বুদ্ধিনিরপেক্ষ শুদ্ধ আবেগে, রক্তের অপক্ষপাত চমকে, ইন্দ্রিয়ের স্বাধীন সাক্ষ্যে, দায়িত্বহীন মনের অভাবিত চিন্তা স্ফুরণে, অবচেতনের স্বপ্নযাত্রায়। সত্যকে পেতে হ'লে পাবার মাধ্যমটি নিখুঁত নির্ভরযোগ্য হওয়া চাই—বিজ্ঞান থেকে এই পাঠ নিয়ে কবিরা লেগে গেলেন ঠিক মাধ্যমটি খুঁজে বার করার কাজে। কবিসত্তার উঁচু নীচু সমস্ত স্তর মিলিয়ে খোঁজা হ'ল সামগ্রিক নির্ভুল মাধ্যম। তারচেয়েও বেশী চেষ্টা হ'ল অন্যান্য স্তর বাদ দিয়ে বিশেষ একটি বা কয়েকটি চিত্তস্তরের সংযোজনে মাধ্যমরচনা। কেউ বেছে নিলেন বিশুদ্ধ জীবন্ত জীবন চেতনা, কেউ বা মার্জিত ইন্দ্রিয়বোধ; কেউ কার্যকারণহীন স্বয়ংক্রিয় ইন্টুইশন; কেউ বা ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন আদিম অসংলগ্ন অনুভূতি ও অর্ধজাগ্রত স্বপ্নের সমুদ্রে।

ইয়োরোপে কিছু আগে এবং বাংলায় তার কিছু পরেই সুরু হ'ল এই সাধনা যাকে বলা যায় কাব্যে একরকমের তান্ত্রিক সাধনা। যা বিরূপ, বিস্বাদ বীভৎস, যা লৌকিক, পরস্পরবিরুদ্ধ ও উগ্র তারই মধ্যে কাব্যসত্যের আবাহন। রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর বলাকার দীপ্ত বিশ্বলোকে জ্যোতির্মণ্ডলের মধ্যে আসীন তখনই বাংলায় বেজে উঠেছে পীড়িত অন্তরাত্মার ক্রন্দন জীবনানন্দ দাশের কবিতায়। সেই ক্রন্দন জীবনের সঙ্গে মর্মসত্যের অসংলগ্নতার। বুদ্ধদেবের ভিতরকার প্রাণপ্রেরণা, vital urge, তার উচ্চকণ্ঠ দাবী নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। বিষ্ণু দে-র শাণিত দৃষ্টি পড়তে সুরু হ'য়েছে লোকজীবন, লোকচরিত্রের উপর। একটা দুরন্ত আবেগ তাঁকে অশিষ্ট অসংযত উৎসাহে বাধ্য ক'রেছে চারিদিকে আঘাত দিয়ে ফিরতে। সুধীন্দ্র দত্তের কাব্যে শোনা গিয়েছে পূর্বপ্রত্যয়ের বাঁধনকাটা চিন্তার সুর, নিজস্ব প্রকৃতির নিঃসঙ্কোচ প্রকাশ। প্রেমেন্দ্র মিত্র' সত্যকার ভূগোলে, সত্যকার ছুতোর-কামার-মিস্ত্রির আসঙ্গে তাঁর কাব্যকে দিচ্ছেন বাস্তবসত্যের একটা কড়া cold bath. রবীন্দ্রনাথ মানুষকে সেইখানে দেখেছেন যেখানে 'আকবর বাদশার সঙ্গে হরিপদ কেরাণীর কোনো ভেদ নেই।' ইতিহাসের কোলাহলময়

জনযাত্রা' থেকে তিনি তাঁর চিত্তকে বরাবর দূরে রক্ষা ক'রেছেন। বিশ্বমানবের চিরন্তন ইতিহাস তাঁর কাছে স্পষ্ট কিন্তু তাঁর মনে হয়

এই প্রকাণ্ড জীবননাট্যে, কে দিয়েছে
প্রকাণ্ড এক অটল যবনিকা

কিন্তু আমাদের আধুনিক কবিরা প্রায় সকলেই নিজ নিজ ভঙ্গীতে ইতিহাস-চেতন। তাঁরা যে প্রত্যক্ষতার রস আমাদের দান ক'রেছেন তা আমাদের কাব্যে একটি নূতন সম্পদ।

বাংলায় এই নূতন কণ্ঠগুলির ইসারা রবীন্দ্রনাথ অনেকদিনই মনে হয় তেমন মনোযোগ দিয়ে বোঝবার চেষ্টা করেননি। বিশেষতঃ তাঁর মৃত্যুর কয়েক বছর পরেই এই আধুনিক কবিরা এবং তাঁদের কাব্য একটা সুসঙ্গত অর্থময়তা লাভ করেছে। কিন্তু এক সময়ে নামতে হ'ল রবীন্দ্রনাথকে এই অঙ্গনে। দ্বারকার পুরাঙ্গনাদের দস্যুকবল থেকে রক্ষা করতে না-পারার যে ট্র্যাজেডি সব্যসাচী অর্জুনের কপালে ঘটেছিল—যে পুরাবৃত্তের নাট্যসম্ভাবনা রবীন্দ্রনাথ নিজেই কোথাও উল্লেখ করেছেন—সেই রকমের ট্র্যাজেডিই শেষজীবনের কয়েক বৎসর তাঁকে বহন করতে হয়েছিল। কিন্তু অর্জুন হার স্বীকার করলেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর পরাজয়কে মেনে নেননি। তাই আমরা সাক্ষী থেকেছি এক হৃদয়-বিদারক, এক চরমমহিমাময় ভাস্বর দৃশ্যের, যখন দেখেছি জীবনের সায়াহ্নে আবার রবীন্দ্রনাথ

বাকি অর্ধ ভগ্ন প্রাণ আবার করিছে দান
ফিরিয়া খুঁজিতে সেই পরশপাথর।

সেই শেষ সিদ্ধিও তিনি লাভ করেছিলেন। তার কাব্যিক প্রতিলিপি আছে তাঁর ১৩৪২ সাল থেকে ১৩৪৮ সাল অর্থাৎ শেষসপ্তক থেকে শেষলেখা পর্যন্ত কাব্যগ্রন্থগুলিতে। উন্নত মন ও আত্মার দিগন্তবিস্তার ছেড়ে তিনিও নেমেছেন দায়মুক্ত প্রাণরসের নিম্নতলে :

আমার প্রাণ নিজেকে বাতাসে মেলে দিয়ে
নিচ্ছে বিশ্বপ্রাণের স্পর্শরস
চেতনার মধ্যে দিয়ে ছেঁকে।

আবার দেখি প্রাণবোধের শিথিল সর্বনিম্নলোকে নিজেকে এলিয়ে দেওয়া :

যত কিছু ঝাপসা-হ'য়ে-যাওয়া রূপ
ফিকে-হ'য়ে-যাওয়া গল্প
কথা-হারিয়ে-যাওয়া গান
তাপহারা স্মৃতিবিস্মৃতির ধূপছায়া
সব নিয়ে একটি মুখ-ফিরিয়ে-চলা স্বপ্নছবি

মুখর মনকে থামিয়ে দেওয়া হয়েছে, তার সমস্ত উচ্চাভিলাষকে দেওয়া হয়েছে বিদায় :

ভাষা নাই ভাষা নাই
চেয়ে দূর দিগন্তের পানে
মৌন মোর মেলিয়াছি পাণ্ডুনীল মধ্যাহ্ন আকাশে

অভিভাবকহীন চিত্তাকাশে উঠছে অবচেতনলোকের বাষ্প

বাষ্পের সে শিল্পকাজ যেন আনন্দের অবহেলা
স্বপ্নের এ পাগলামি বিশ্বের আদিম উপাদান

স্যুর-রিয়্যালিষ্টরা তো ঠিক এই দাবীই করেছিল।

রূপ ও বস্তুসত্তার বিশুদ্ধ ভোগতৃষ্ণা তীব্রভাবে ব্যক্ত করেছেন ফরাসী কবিরা—সেই বোদ্‌লেয়ার থেকে আজ পর্যন্ত। র‍্যাঁবো-র 'ক্ষুধা' নামে কবিতার প্রথমে দেখি :

If I have any taste it is hardly
For more than earth and stones,
I always breakfast on air,
Rock , cinders and iron
Round, my hungers. Crop, hungers
The field of sound.
Suck the sweet venom
Of convolvulus.

রবীন্দ্রনাথের শেষবয়সে এই তৃষ্ণা তৃপ্তি খুঁজেছে তাঁর দ্রুতচিত্র রচনার মধ্য দিয়ে আশ্চর্য রূপোচ্ছ্বাসে! যা দেখে ইয়োরোপীয় সাধকরা দ্বিতীয়বার ব'লে উঠেছিলেন 'এই তো খুঁজছিলুম'।

পূর্বপ্রত্যয়মুক্ত নগ্নচৈতন্যের মধ্যে কোনো বিশেষ মুহূর্ত বা pheno-

menon-এর সারনিষ্কাশন সাম্প্রতিক ইংরেজ কবিদের সাধনার একটা বড় অংশ জুড়ে আছে। রবীন্দ্রনাথ এই শিল্পে অদ্ভুত দক্ষতা লাভ করেছেন। সম্প্রতি অমিয় চক্রবর্তী 'অগণ্য চৈতন্য ছোঁয়া মনন' ও মুহূর্ত ক্রিষ্টাল রচনার যে সার্থক প্রচেষ্টা করেছেন, তার উপর রবীন্দ্রনাথের এই ধরণের কবিতার কিছুটা প্রভাব আছে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই সব নূতন সুড়ঙ্গপথ শুধু অতিক্রমই করেননি, ভেদ ক'রে, দীর্ণ ক'রে আবার পেয়েছেন যে-আকাশ তার সঙ্গে তাঁর বলাকা, গীতাঞ্জলির আকাশ একটা বিরাটতর বৃত্তে যুক্ত হ'য়ে গেছে। দ্বিতীয়তঃ তাঁর প্রকাশভঙ্গী এই সব ক্ষেত্রেও থেকে গেছে logical. নূতনতর টেকনিকের উপর তিনি নির্ভর করেননি। নির্ভর করেছেন নূতন রসের উপযোগী নূতন অন্তঃস্বর, নূতন ছন্দের উপর।

আজ বাংলা কাব্যে যে নূতন উন্মীলন ঘটেছে তা দেখে যেতে পারলে তিনি খুশী হতেন। তাঁর পরিচিত তরুণকবিদের অনেকেই আজ সার্থক পরিণতি লাভ করেছেন। আজকের যাঁরা তরুণ তাঁদেরও মধ্যে দেখা যাচ্ছে একটা সম্ভাবনা। ইন্দ্রিয়ব্যবহারের একটা তীক্ষ্ণতা, বোধের একটা স্বচ্ছতা ও যাথার্থ্য দেখছি তাঁদের লেখায় যদিও গঠনের দুর্বলতায় হয়তো তা অনেক সময় পূর্ণ সফল হয়নি। এঁদের হৃদয়ব্যবহারও sentimentality-মুক্ত হ'য়ে অনেক পরিমাণে সমীচীন হ'য়ে এসেছে। ঐতিহাসিকতার, সংসারমনস্কতার তীব্র আলোড়নের শেষে আবার রবীন্দ্র-জলবায়ুর দিকে তীর্থযাত্রার একটা ঢেউ উঠবে বলে মনে হচ্ছে। সংসারমনস্কতার সঙ্গে রবীন্দ্রসমাধানের মিল যদি তাঁরা ঘটাতে পারেন, প্রত্যক্ষতার সঙ্গে প্রসারের, বিশেষের সঙ্গে universal-এর, তবে আমাদের কাব্যের অতীতগৌরব ভবিষ্যতেও প্রসারিত হবে সন্দেহ নেই। এবং এই কাজে যাঁরা অগ্রণী হবেন, সে দু বছর পরে বা 'আজি হ'তে শতবর্ষ পরে'ই হোক, তাঁরা দেখবেন তাঁদের যাত্রাপথে রবীন্দ্রনাথ অনেক আগেই পৌঁছে রয়েছেন। তখন তাঁরা নূতন ইঙ্গিত আবিষ্কার করবেন জন্মদিনে, আরোগ্য, প্রান্তিক প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের শেষ লেখায়। দেখবেন অনেক দিন ধ'রে বারে-বারে তিনিই আধুনিকতম।

কবি হেমচন্দ্র বাগচী

প্রবীণ কবি হেমচন্দ্র বাগচী মহাশয় অনেকদিন যাবত পীড়িত এবং অশক্ত। কবিতা-র সঙ্গে তিনি বহুকাল লেখকভাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁর তখনকার লেখা হ্রস্বাকার যে-গদ্যকবিতাগুলি এই পত্রিকায় প্রকাশিত হ'য়েছিল তার মধ্যে বিরলরেখায় আঁকা চিত্রের সঙ্গে নিভৃত প্রকৃতির মধুর বিষাদভরা একটি সুর মুহূর্তে কবির বিশিষ্টতা চিনিয়ে দেয়। এ ধরণের কবিতা বাংলায় আর বিশেষ কেউ লেখেননি। পরিতাপের বিষয় সেই সুন্দর কবিতা-গুলি একত্র ক'রে কোনো গ্রন্থ প্রকাশ করতে আজ পর্যন্ত কেউ উদ্যোগী হ'লেন না। একমাত্র 'আধুনিক বাংলা কবিতা' সংকলনে কিছু নিদর্শন আছে।

কোনো শিল্পী-সাহিত্যিকের আপৎকালে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে অনেক কিছুই আমাদের করার থাকে। গভর্ণমেণ্ট এবং বৃহৎ সাহিত্য-শিল্প-প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই যথাযথভাবে সেই কর্তব্য সম্পাদন করা সম্ভব। কবিতার সামর্থ্য নিতান্তই কম। শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায়ের লেখা 'রাতের অতিথি' নামে কাব্যনাটিকাটির একটি বিশেষ সংস্করণ এই উপলক্ষ্যে আমরা প্রকাশ ক'রেছি। বইটির মাত্র একশো কপি ছাপা হ'য়েছে। প্রতিগ্রন্থ লেখক কর্তৃক স্বাক্ষরিত এবং সংখ্যাযুক্ত। নির্দিষ্ট কোনো দামের উল্লেখ করা হয়নি। বিক্রীত অর্থ কবিতা-র পক্ষ থেকে কবি হেমচন্দ্রের নিকট পাঠানো হবে। আমাদের গ্রাহক এবং পাঠকবৃন্দকে এ বিষয়ে আনুকূল্য করার জন্য আবেদন জানাই।

কবিতা

কবিতাভবন * ২০২ রাসবিহারী এ্যাভিনিউ * কলকাতা

১৭৩

KAVITA — Vol. 18, No. 3, MAY, 1954

Yearly Rs. 4/-, or 6s. 6d, or $ 1. 50.
Per Copy Rupee 1/-

একটাকা

Published quarterly at Kavitabhavan, 202 Rashbehari Avenue, Calcutta 29 India.
Editor & Publisher: BUDDHADEVA BOSE
Printed by Modern India Press, 7 Wellington Square, Calcutta.

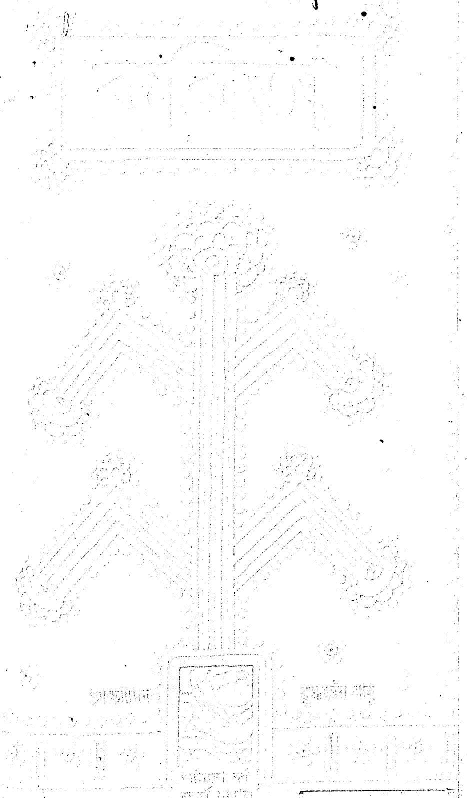

কবিতা

আষাঢ়, ১৩৬১

*

কবিতা

অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, সৌম্য মিত্র, লোকনাথ ভট্টাচার্য, আলোক সরকার, সুনীল সরকার, অশেষ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবী, অন্নদাশঙ্কর রায়, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, হুমায়ুন কবীর, শোভন সোম, বুদ্ধদেব বসু, অরুণকুমার সরকার,

*

প্রবন্ধ

বুদ্ধদেব বসুর কবিতা

নরেশ গুহ

*

সমালোচনা

অরুণকুমার সরকার

কবিতা

ত্রৈমাসিক পত্র

আশ্বিন, পৌষ, চৈত্র ও আষাঢ়ে প্রকাশিত। * আশ্বিনে বর্ষারম্ভ, বৎসরের প্রথম সংখ্যা থেকে গ্রাহক হ'তে হয়। বার্ষিক চার টাকা, রেজিস্টার্ড ডাকে পাঁচ টাকা, ভি. পি. স্বতন্ত্র। ষাণ্মাসিক গ্রাহক করা হয় না। * চিঠিপত্রে গ্রাহক নম্বরের উল্লেখ আবশ্যক। ঠিকানা পরিবর্তনের খবর দয়া ক'রে সঙ্গে সঙ্গে জানাবেন, নয়তো অপ্রাপ্ত সংখ্যা পুনরায় পাঠাতে আমরা বাধ্য থাকবো না। অল্প সময়ের জন্য হ'লে স্থানীয় ডাকঘরে ব্যবস্থা করাই বাঞ্ছনীয়। * অমনোনীত রচনা ফেরৎ পেতে হ'লে যথাযোগ্য স্ট্যাম্পসমেত ঠিকানা-লেখা থাম পাঠাতে হয়। প্রেরিত রচনার অনুলিপি নিজের কাছে সর্বদা রাখবেন, পাণ্ডুলিপি ডাকে কিংবা দৈবাৎ হারিয়ে গেলে আমরা দায়ী থাকবো না। * সমস্ত চিঠিপত্রাদি পাঠাবার ঠিকানা নিচে :

কবিতা ভবন

২০২ রাসবিহারী এ্যাভিনিউ কলিকাতা-২৯

সাহিত্যচর্চা

বুদ্ধদেব বসু

সমালোচক বুদ্ধদেব বসুর বৈশিষ্ট্য এই যে তাঁর বিশ্লেষণ-প্রতিভার সঙ্গে যুক্ত হয় কবির উপলব্ধি এবং রচনা হিসেবে সমালোচনাকেও তিনি সম্পূর্ণাঙ্গ একটি সৃষ্টিকর্মে রূপান্তরিত করেন।

বর্তমান গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় : 'রামায়ণ,' 'মাইকেল,' 'বাংলা শিশুসাহিত্য,' 'বাংলা ছন্দ,' 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক,' 'রবীন্দ্র-জীবনী ও রবীন্দ্র-সমালোচনা,' 'সাংবাদিকতা, ইতিহাস, সাহিত্য,' এবং 'শিল্পীর স্বাধীনতা'। প্রবন্ধগুলি গ্রন্থাকারে এই প্রথম প্রকাশিত হল। দাম ৩৲

সাহিত্য বিষয়ে যে-কোনো প্রচলিত মতের সহজ পুনরুক্তি করা বুদ্ধদেব বসুর স্বভাব নয়।

সিগনেট প্রেসের বই

সিগনেট বুকশপ। ১২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট

১৪২·১ রাসবিহারী এভিনিউ

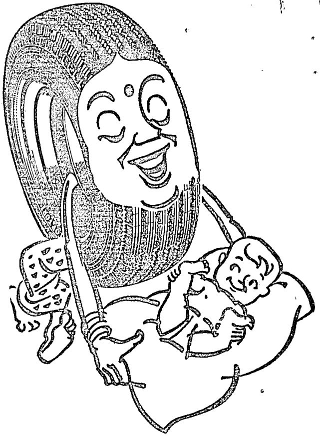

আরামে ভ্রমণের
জন্য

ডানলপ

TRADE MARK

সমগ্র প্রাচ্যের সুবিখ্যাত

গোল্ডেন
আমলা
হেয়ার অয়েল

কেশ চর্যা ও কেশ চর্চার শ্রেষ্ঠ উপকরণ বর্ণে, গন্ধে ও গুণে অতুলনীয়।

আজই ব্যবহার আরম্ভ করুন। সকল সম্ভ্রান্ত দোকানে পাওয়া যায়।

বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর

সম্প্রতি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে

অষ্টম খণ্ড

শীঘ্রই প্রকাশিত হবে

সপ্তদশ খণ্ড

রবীন্দ্র রচনাবলী

মোট এই খণ্ডগুলি বর্তমানে পাওয়া যায়—ক. কাগজের মলাট সংস্করণ। প্রতি খণ্ডের মূল্য আট টাকা—১ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬॥ খ. সাধারণ কাগজে ছাপা, রেক্সিনে বাঁধাই। প্রতি খণ্ডের মূল্য এগারো টাকা—১ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ২৪ ২৫ ২৬॥ গ. মোটা কাগজে ছাপা, রেক্সিনে বাঁধাই। প্রতি খণ্ডের মূল্য বারো টাকা— ৭ ৮ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ২১ ২২

রবীন্দ্র-রচনাবলী পাবার সহজ উপায়॥ আপনি কোন্ কোন্ খণ্ড সংগ্রহ করেছেন বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগে (৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলকাতা ৭) চিঠি লিখে তা জানিয়ে, স্থায়ী গ্রাহক হয়ে থাকা। ক খ গ কোন্ রকমের বই আগে কিনেছেন তা জানালে সেই রকম বই দেবার চেষ্টা করা হবে। কোনো খণ্ড প্রকাশিত বা পুনর্মুদ্রিত হলেই গ্রাহকদের চিঠি লিখে জানানো হয়। গ্রাহক হবার জন্য অনুরোধপত্রই যথেষ্ট, কোনো দক্ষিণা বা অগ্রিম মূল্য জমা দিতে হয় না।

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলকাতা

কবিতা

আষাঢ় ১৩৬১

অষ্টাদশ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা

ক্রমিক সংখ্যা ৭৮

অপঘাত

অমিয় চক্রবর্তী

নতুন পার্কার পেনে মসৃণ কাগজে পদ্য লেখা,
মার্কিনের আয়োজন : জানলার বাহিরে রোদ্দুর,
একটু নীল পর্দা ছায়া, পাশে শেল্‌ফে দু'চারটে বই
(হাক্‌স্‌লির নতুন গন্থ, সমুদ্রের গল্প হেমিংওয়ের,
ইচ্ছেমতো পড়বার), চেলোর রেকর্ড রেখে ফের
বন্ধু চলে গেছে ; মনে কম্পিত শান্তির লাগে সুর,
ঘরে আসতে ঝিল-পথে দুর ভাবনা ডুবেছে অথই,
কোরিয়ায় যুদ্ধ থামবে ক্ষীণ বুঝি জাগে আশা-রেখা।

সারি সারি কথা শুধু মসৃণ কলমে মিথ্যে লেখা,—
খাতা বন্ধ ক'রে বসি। দেখি সামনে অলগ্ন রোদ্দুর,
নীল পর্দার শূন্য, পাশে স্তব্ধ সদ্য ছাপা বই
(ধার্মিক শঠের ভাষ্য, উজ্জ্বল প্রবন্ধ ; হাঙরের
সঙ্গে যোঝে বুড়ো মাঝি : ঝোড়ো গল্প) কানে ক্ষীণ জের
ইস্পানী অদৃশ্য তন্ত্রী, মনের বাষ্পায় কোথা সুর
কবিতায় ঝামরে আসা, ঝিলের ঝলক গেল কই,
কোরিয়া আগুনে পোড়ে, রেডিয়ো ছড়ায় দগ্ধ রেখা॥

হোমরের ষট্‌মাত্রা

বিষ্ণু দে

ছিল একদিন কস্তুরীমৃগ কৈশোরকের চিত্তে
ঝর্ণার বেগ, দ্রুতমুহূর্ত্ত পাহাড়ে মাত্রাবৃত্তে
তীব্র তড়িতে মেলাতে চেয়েছি ক্ষণিকাকে চুম্বনে
সম্বৃত একা ত্রিকালখোদাই পরম চিরন্তনে।
গ্রীষ্মে ঝর্ণা হারায় পাথরে বালিতে,
বর্ষায় ছোটে ঢল ভেঙে জল ঢালুতে।
আজকে দুপাশে সমুদ্র দূর দিকে দিকে দেয় পাড়ি,
অনেক নৌকা বিদেশী জাহাজ গাংচিল ঝাঁকে ঝাঁকে,
হৃদয়ে মিশেছে আরেক কালের অনেক দেশের খাড়ি,
পাহাড়ের বেগ স্মৃতিমন্থিত আরেক বেগের বাঁকে।

সেদিন আমার বাসা ছিল মাঘফাগুনে,
বিভোল সে গানে কালের ত্রিতাল কে শোনে!
অনেক জনের অনেক দিনের বহু বছরের স্রোতে
কতো না রৌদ্রে সুরবেসুরের ঊর্মিল সঙ্গীতে
তোমার আপন আবেগে মেলাই আমার সাগরযাত্রা,
সাফোর ঝর্ণা কলকল্লোলে হোমরের ষট্‌মাত্রা॥

আদিনাগ

(ভালেরি-র "এবোশ্‌ দ্যঁ সের্পাঁ" অবলম্বনে)

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

মহীরুহ দোদুল মারুতে,
সর্পবেশী আমি শাখাচর;
দন্তরুচি ক্ষুধার বিদ্যুতে
প্রভাস্বর আমার অন্তর।
সঞ্চারী সে-মরীয়া ক্ষুধায়
বীতস্বত্ব নন্দন সুধায়,
লেলিহান দ্বিরুক্ত রসনা।
জন্তু আমি, তীক্ষ্ণধীও বটে;
কিন্তু নেই হেন বিষ ঘটে
যাতে ডোবে ঋষির চেতনা॥

রম্য এই প্রমোদের কাল!
মর্ত্যবাসী, সাবধান!: আমি
জৃম্ভণেও প্রবল, ভয়াল;
আশুতোষ নই, অন্তর্যামী।
নীলিমার ক্ষুরধার স্নেহে
অসংবৃত, ছদ্ম নাগদেহে,
জীবনের পাশব প্রসাদ।
আয়, জড়ভরতের জাতি,
আয়, হেথা আমি ওত পাতি,
নিয়তির মতো অপ্রমাদ॥

সূর্য, সূর্য, হিরণ্ময় হানি,

মৃত্যু ঢাকা যার চন্দ্রাতপে,
যার মন্ত্রে স্ফূর্ত কানাকানি
ফুলে ফুলে, পাদপে পাদপে,
দৃপ্ত তুমি, হে সূর্য, আমার
সর্বশ্রেষ্ঠ সহায়ক, আর
চক্রান্তের আলম্ব ; কারণ
জগৎ যে বিশুদ্ধ অভাবে
কলঙ্ক, তা তোমারই প্রভাবে
অস্বীকার করে মুগ্ধ মন ॥

মহাদ্যুতি, তুমিই জাগাও
প্রাণবহ্নি সত্তার বিগ্রহে,
তথা তার ক্ষেত্র মেপে দাও
প্রত্যক্ষের স্বপ্নাপ্ত আবহে।
দৃষ্ট মরীচিকার প্রণেতা,
কী সংকল্পে নিমগ্ন প্রচেতা,
চাক্ষুষ তা তোমার রূপকে।
হে স্বরাট্‌ ছায়ার সম্রাট,
ভালোবাসি ভরো যে-বিরাট্‌
মিথ্যা তুমি শূন্যের কূপকে ॥

যথাজাত তোমার উত্তাপে
আলস্যের তুষার শিথিল,
স্মৃতি প্রতিধ্বনিত বিলাপে,
আমি প্রত্ন বিপাকে জটিল।
একাকার কায়ার পতন

দেখেছিল এ-দিব্য কানন ;
এ-আরাম সে-জন্যেই প্রিয় :
ক্রোধ পায় ইন্ধন এখানে,
কুণ্ডলিনী উদ্বুদ্ধ পুরাণে,
উন্মুখর অনির্বচনীয় ॥

অহংকার, তুমি মূলাধার,
চক্রবর্তী আকাশে আকাশে,
দেশগত জগৎ-সংসার
খুলেছিলে বাণীর বিভাসে।
নিত্য আত্মদর্শনে বুঝি বা
অপ্রচার্য স্রষ্টার প্রতিভা ;
মুক্ত তাই পূর্ণের অর্গল,
উপজাত বিধির ব্যত্যয়,
ছত্রভঙ্গ সিদ্ধান্তে নিশ্চয়,
তারাপুঞ্জে কৈবল্য বিকল ॥

ব্যোম তার ভ্রান্তির প্রমাণ,
সর্বনাশ স্বাক্ষরিত কালে,
আরম্ভেই উল্কাপাত—প্রাণ
ধাবমান ব্যাদত্ত পাতালে।
কিন্তু আমি প্রথম প্রণবে,
অদ্বিতীয় স্ফূর্তবাক নভে,
উপস্থিত, অতীত, আগামী ;
আত্মহারা ঐশ্বর্যের হ্রাস
করি লুব্ধ আলোকে প্রকাশ ;
নিরাকার মোহিনীর স্বামী ॥

বর্তমান ঘৃণার আধার,
ভূতপূর্ব নয়নের মণি,
প্রেমিকের যোগ্য পুরস্কার
নরকের অক্ষয় পত্তনি ?
দেখো মুখ আমার তিমিরে !
যে-ছবি সে-গরীষ্ঠ গভীরে
মুকুরিত, একদা তা দেখে,
নৈরাশ্যে ও ধিক্কারে ব্যাকুল,
অনুরূপ মাটির পুতুল
গড়েছিলেশ্রদ্ধাব্যতিরেকে ॥

পণ্ডশ্রম : মৃত্তিকাসঞ্জাত,
সাবলীল তোমার সন্তান
করেছিল স্তবে প্রতিভাত
তুমি বটে সর্বশক্তিমান ;
কিন্তু সুষ্ঠু ভাস্কর্যের সেরা,
প্রত্যাদিষ্ট নবজাতকেরা
শুনেছিল বিরামে বিরামে
আমি বলি, "ওরে আগন্তুক,
শ্বেতকায়, উলঙ্গ, উন্মুখ,
পশু তোরা, নর শুধু নামে" ॥

"তোরা যার সৌসাদৃশ্যদোষে
আশপ্ত ও আমার ঘৃণিত,
অপূর্বের স্রষ্টা যদিও সে,
তবু তার রচনা গর্হিত।
সিদ্ধহস্ত আমি সংশোধনে ;

প্রস্তুত যে আত্মসমর্পণে,
আমি তার মরমী সহায়।
শ্লথ যত উরঙ্গশাবক
হয়ে ওঠে উদ্যত তক্ষক
আমাদের যৌথ প্রচেষ্টায়" ॥

অপ্রমেয় আমার মনীষা
খুঁজে পায় মানুষের মনে
প্রতিহিংসাপূরণের দিশা
যা সম্ভব তোমারই সৃজনে।
রহস্যের দুস্থ অবরোধে,
নাক্ষত্রিক ধূপের আমোদে,
বিশ্বপিতা যেথা ইচ্ছাময়,
সেখানেও করে অধিরোহ
আত্যন্তিক আমার সম্মোহ,
স্পর্শক্রামী বিদ্রোহের ভয় ॥

আসি, যাই সত্বর, মসৃণ,
শুচি চিত্তে হই নিরুদ্দেশ।
কার বক্ষ এমন কঠিন
রুদ্ধ যাতে চিন্তার প্রবেশ ?
যেই কেন হোক না সে, তার
মর্মে আত্মরতির সঞ্চার
সংঘটিত আমারই প্রভাবে।
স্বার্থে আমি প্রতিষ্ঠিত ব'লে,
স্বরূপের আবরণ খোলে,
অনুপের বিকাশ স্বভাবে ॥

ঈভ্-ও, দেখেছিলুম একদা,
ভাবনার প্রারম্ভে চকিত,
ওষ্ঠাধরে অবাক্ ব্যবধা,
গোলাপের লাস্যে উচ্ছ্বসিত।
সুপ্রশস্ত হৈম কটিতট ;
অনবদ্য গৌরবে প্রকট ;
নিঃশঙ্ক সে রৌদ্রে ও মানুষে ;
অঙ্গীকৃত বায়ুর আশ্লেষ ;
দেহদ্বারে আত্মার প্রবেশ
প্রত্যাহত বুদ্ধির প্রত্যুষে॥

আহা, ভূমানন্দের সংহতি,
মরি, মরি, তুই কী সুন্দর !
সুমতির মতো, মহামতি
তাই তোর সেবায় তৎপর।
তারা তোর দীর্ঘশ্বাস শুনে,
ঝাঁপ দেয় প্রেমের আগুনে।
যে নিষ্পাপ, সে আরও তন্ময় ;
যে কঠোর, সেই অত্যাহত।...
আমি পালি পিশাচ, প্রমথ,
তবু তুই গলালি হৃদয়॥

সরীসৃপে পক্ষীর উল্লাস :
উহ্য আমি পাতার আড়ালে ;
ছলনার সূক্ষ্ম নাগপাশ
বিরচিত হয় বাক্যজালে।
ইতিমধ্যে রূপমুগ্ধ চোখে

পান করি, রে বধিরা, তোকে ;
আমি তোর প্রচ্ছন্ন কাণ্ডারী।
ব্যক্ত গতি গ্রীবার বিভ্রমে,
দীপ্র তুই হিরণ্ময় রোমে,
শান্ত, স্বচ্ছ মাধুর্যের ভারী॥

আপাতত অনতিগভীর,
অতীন্দ্রিয় প্রকৃতপ্রস্তাবে,
ভাব আমি, সৌগন্ধমদির
তোর মর্ম যার আবির্ভাবে।
নিশ্চয়ের যাতায়াতে তোর
কম্র কায়া কোমল-কঠোর,
ক্ষণে ক্ষণে অধিক উতলা।
ভয় নয়, কম্প্র বিপর্যায়
অভিব্যাপ্ত তোর মহিমায় :
পাব তোকে আয়ত্তে, সরলা॥

(যে-নিপট অকপট, তাকে
প্রযত্নের পরাকাষ্ঠা দেয় ;
সে অচ্ছোদ চোখে জেগে থাকে ;
রক্ষা পায় সুন্দরের গেহ
তার দম্ভে, মতিভ্রমে, সুখে।
এসো, শিখি দুর্দৈবের মুখে
সাধ্বীদের দুঃসাহস দেওয়া।—
পারদর্শী সে-কলাকৌশলে,
পরিচিত আমি প্রতিফলে :
চিত্তজয় সবুরের মেওয়া॥)

অতএব দীপ্ত মুখমদে
বোনা যাক লঘিষ্ঠ শৃঙ্খলা :
জাড্য ভুলে, অস্পষ্ট বিপদে
স্নিগ্ধ ঈভ্ পাতে যেন গলা !
নীলিমায় অভ্যস্ত কেবল,
ঊর্ণাজালে পর্যন্ত বিহ্বল,
কী শিহর শিকারের ত্বকে !
কিন্তু নয় অগোচর কূট,
এবং তা নির্ভার, অটুট,
রচনার রীতিজ কুহকে ॥

উপহার দে তাকে, রসনা,
সোনা-মোড়া কথার মাধুরী,
লক্ষ, লক্ষ মৌনের তক্ষণা,
কিংবদন্তি, উল্লেখ, চাতুরী।
লাগ তার অপচিকীর্ষায় ;
তোষামোদে তাকে নিয়ে আয়
অভিপ্রায়ী আমার কবলে :
স্বর্গচ্যুত নির্ঝরের মতো,
নিজেকে সে করুক দুর্গত
অতটের নীলিম অতলে ॥

রোমে, নাকি পরাগে, আবৃত,
কম্বুনিভ, সে-আশ্চর্য কানে
নিরুপম কী গন্ধে পিহিত
পরমার্থ ঢেলেছি সমানে !
ভাবিনি সে-চেষ্টা অপচয় ;

সর্বগ্রাহী সন্দিগ্ধ হৃদয় :
সিদ্ধি স্থির ;   শুধু প্রয়োজন,
মর্মান্বেষী মধুপের মতো,
ঘিরে রাখা নির্বন্ধে সতত
কর্ণিকা বা সুবর্ণ শ্রবঃ ॥

ধীরে বলেছিলুম, "নিশ্চয়ে
দৈববাণী ন্যূনতম, ঈভ্।
ওই পক্ক ফলের আশয়ে
বিস্ফারিত বিজ্ঞান সজীব।
শুনো না সে-প্রাচীনের মানা,
যার শাপে পাপ দন্তহানা।
কিন্তু স্বপ্নে মুগ্ধ ওষ্ঠাধর,
তুমি করো যে-রসের ধ্যান,
আগামীর সেই অভিজ্ঞান
বিগলিত অনন্তে উর্বর" ॥

আবেদনে অদ্ভুত আমার
বক্তব্য সে পান করেছিল ;
উপেক্ষিত দেবদূত—তার
চক্ষু বৃক্ষে ঘুরে মরেছিল।
অনিষ্টের সঞ্চারে গর্ভিণী,
বোঝেনি সে-বিশ্বাসঘাতিনী
কৌটিল্যে যে জন্তুর প্রধান,
যার শ্লেষে নষ্ট তার ডর,
আমি পর্ণে বিমূর্ত সে-স্বর ;
তবু ঈভ্ পেতেছিল কান ॥

“আত্মা,” তাকে শিখিয়েছিলুম,
“প্রতিষিদ্ধ হর্ষের বসতি ;
তোর মনে যে-প্রেমের ধুম,
তা পরম জনিতারই ক্ষতি।
অপহৃত অমৃতে মধুর,
দূরদর্শী, আদিম অসুর,
ব্যবস্থিত ক্রান্তিপাতে মূঢ়,
আমি বলি, বাড়িয়ে দে হাত,
পাড় ফল ;   ঘোচাতে ব্যাঘাত
হাত আছে—চাস তো, নে বিধু” ॥

মহামৌন প্রহত পলকে !
অর্ধবক্ষে বিটপীর ছায়া,
অপরার্ধ, রৌদ্রের ঝলকে,
উর্ধ্বশ্বাস কেশরের মায়া।
সঙ্গে সঙ্গে আমার উল্লাস
পেয়েছিল শীৎকারে প্রকাশ ;
হয়েছিল বিপন্ন পুলকে
শরীরের কুণ্ডলিত কশা,—
শিরোমণি পর্যন্ত সহসা
মগ্ন যেন সমুখ মাদকে ॥

দীর্ঘায়িত অধৈর্য—প্রতিভা !
অবশেষে লগ্ন উপনীত :
ব্যক্ত নব বিজ্ঞানের বিভা ;
নগ্ন পদে গতি উৎসারিত ;
স্বর্ণে নতি ;   নিঃশ্বাস মর্মরে ;

যুগ্ম আলো-ছায়ার নির্ভরে
চাঞ্চল্যের কম্পিত সূচনা ;
টলমল শূন্য কুম্ভ-বৎ
উন্মুখ সে ;   উদ্বায়ী শপথ ;
আপাতত অবাক্ রসনা॥

বরদেহে প্রলুব্ধ জিজ্ঞাসা,
হারিয়ে যা অভীষ্ট সম্ভোগে।
তোর পরিবর্তনপিপাসা,
ভঙ্গিমার সম্বদ্ধ উদ্যোগে
ঘিরে যেন রাখে মৃত্যুতরু !
না এগিয়ে বাড়া করভোরু,
গোলাপের ভারে মন্দগতি।
নৃত্যে তনু নিশ্চিন্তে সঁপে দে।
এখানে যা ঘটে, অনির্বেদে
অহৈতুক তার পরিণতি ॥

জ্বেলেছিল কী উন্মত্ত আলো
অনুর্বর বিলাসের জতু !
তবু দেখে, লেগেছিল ভালো,
পৃষ্ঠদেশে অবাধ্য বেপথু।
ইতিমধ্যে স্বপ্নে আলুথালু
বোধিদ্রুম, বিলায়ে রসালু
প্রপঞ্চ ও সংহত প্রমিতি,
ডুবেছিল রৌদ্রের গভীরে,
বাতাহত নির্ভার শরীরে
জমে যাতে আবার প্রতীতি ॥

বৃক্ষ, মহাবৃক্ষ, দুর্নিবার
বৃক্ষশ্রেষ্ঠ, গগনদর্পণ,
মর্মরের দৌর্বল্যে তোমার
তৃষ্ণা করে রসানুসরণ ;
শূন্যে তুমি ছড়াও যে-জটা,
অন্তরঙ্গ তমিস্রার ঘটা
সে-ধাঁধায় মোক্ষ খুঁজে পায় ;
চিরন্তন প্রভাতের নীলে,
পারাবতে, সৌরভে, অনিলে,
অফুরান প্ররোহের দায় ॥

হে গায়ক, খনির অগাধে
লুক্কায়িত তোমার নিপান ;
যে-ভাবুক ফণীর প্রসাদে
ভাবাবিষ্ট ঈভ্, মহাপ্রাণ,
তুমি তার হিন্দোলা ;   তোমাকে
উপদ্রুত করে জ্ঞান, ডাকে,
দৃষ্টিপাত বাড়াতে, উন্নতি ;
অবিমিশ্র হিরণ্যে উদ্বাহু ;
প্রশাখায় কুয়াশার রাহু,
পক্ষপাত পাতালের প্রতি ॥

বিনির্মিত তোমার বর্ধনে
অনন্তকে তুমিই হটাও ;
শীর্ষে নীড়, সমাধি চরণে,
জ্ঞানে আত্মবিলোপ ঘটাও।
কিন্তু আমি প্রবীণ দাবায় ;

হৈমার্কের বিশুষ্ক আভায়
তোমার এ-শাখা ঘিরে থাকি ;
জানি তুমি বিত্তে ভারাতুর—
বিপর্যায়, হতাশা, মৃত্যুর
চ্যুত ফল চোখে চোখে রাখি ॥

সুশ্রী সর্প, দুলি ইন্দ্রনীলে,
তন্দ্রা শিষ্ট শীৎকারে তাড়াই,
জয়যুক্ত খেদের নিখিলে
বিধাতার গৌরব বাড়াই।
দুরাশার তিক্ত মহাফলে
মৃৎসন্ততি মাতে দলে দলে—
এর তৃপ্তি, তাই বিলক্ষণ।
তত ক্ষণ তৃষাস্ফীত আমি,
সর্বেসর্বা নাস্তির প্রণামী
না যোগায় সত্তা যত ক্ষণ ॥

পতঙ্গ

সৌম্য মিত্র

(one thing is certain that life flies...)

তন্দ্রাতুর অপরাহ্ণ: অবসন্ন আলো
শেষবার বুঝি তার পরশ বুলালো
বিস্তীর্ণ মাঠের বুকে। শিমূলের ডালে
লেগেছে আরক্ত রোদ শীতের বিকালে।
চড়ুই শালিক ঘরে ফিরে এলো, চিল
আসে নেমে, কালো হোলো কাকচক্ষু ঝিল।
নারিকেল পাতা কাঁপে, অলস বাতাস
ছুঁয়ে যায়, ঢেউ দেয় হিল্লোলিত ঘাস।

কতোদিন চলে গেছে: চলে যায় দিন—
বিচিত্র ময়ূরপক্ষ ধুলায় বিলীন।
হলুদ বিবর্ণপাতা হঠাৎ হাওয়ায়
দিক হতে দিগন্তরে উড়ে চলে যায়।
কী হবে না-ই বা জানি, মাটির সংসার,
দণ্ড দুই আছে তবু তোমার আমার।

দুটি কবিতা

মুনলিট সনাটা

লোকনাথ ভট্টাচার্য

ভোরেরা এখানে নেই, এখনো কাকলী নয়—
অকারণ কোনো হাওয়া কখনো কেন যে তবু
কী-খুশির কথা কয়:
তুমি ব'লে ভ্রম হয়।

চেয়ে এই জ্যোৎস্নায় এ-কথাই মনে হয়,
কোথাও কবিতা নেই মনের মতন—
ঘুমন্ত পাহাড়ে তবু ঝরণা নীরব নয়,
সেই সুরে জেগে যায় যে-বীণা গোপন।

ভোরেরা এখানে নেই, প্রিয়া পরদেশ,
হয়তো কাকলী আছে অচেনা দিগন্তে—
চেয়ে এই জ্যোৎস্নায় এ-কথাই মনে হয়,
তোমার বিরহ বাজে অন্তরে অনন্তে।

আর এক বসন্ত

বেঁচে আছি—ভালোবাসব বলে
যে-ভালোবাসার গন্ধে দুঃস্বপ্ন বিবর্ণ হয়
ভোর জাগে অন্ধকার সমুদ্রের কোলে
অন্তহীন হৃদয়ের ছোঁওয়া-মাখা কী এক বাতাস
কোন দূরান্তর হ'তে ছুটে আসে ভৈরব আশ্বাসে
খাল-বিল-জলা-নদী সব মিলে যায়
আশ্চর্য অশ্রুতপূর্ব মোহানায়—

ঘৃণা করি—বেঁচে আছি ব'লে
যে-ঘৃণা তরল যেন ফুটন্ত গরল হ'য়ে ছোটে
স্বার্থপর কীটাণুর পরে রণ-রনন কল্লোলে যুগান্ত-সন্ধ্যায়
ওই পশু-মূষিকের মরণ-মাখানো লাল আকাশে ঘণায়—
কোন তীরে ম'জে আছে অজস্র বালুর থেকে
আগামীকালের ফুলবন
তার সুপ্ত সম্ভাবনা
হু হু ক'রে উড়ে যায় নিঃসময় প্রান্তরের হাওয়া
ব'লে যায় জাগল না
—আজো সে কি জাগল না ?

আপনার স্বর

আলোক সরকার

তার কথা কারুকে বলিনি।
বলবো না কখনো। এই বিকেলের আলোর রাস্তায়
একসাথে যারা হাঁটে বন্ধু-প্রিয়জন যারা যায়
তাদের আনন্দে মিশি দুঃখে এক হই। তবু দূর
আমার মনের কথা কেউ জানবে না।

কোথায় উদাস বাজে অবিরল আপনার স্বর
মাটির মিলনী-মন্ত্রে পথ অতি-চেনা।
স্তব্ধতার নিরালোকে অনাসক্ত চেয়ে চেয়ে দেখি
পথের বাঁকের ফুল ধুলো ওড়ে নতুন হাওয়ার
আমি তার কেউ নয় আনন্দের উধাও পাথার।
কেন চুপ ক'রে থাকি বন্ধুরা কখনো জেনেছে কি ?

সম্পূর্ণ শিল্পকে দেয় আরো ছায়া তারা ফুরাবে না
প্রতিটি ক্ষণের দান দিনে-দিনে পুষ্পিত মধুর।
কল্পনার নানাবর্ণ। নিবিষ্ট মুহূর্ত তপ্ত স্বর
আবার সম্মোহ আলো—পাশে কেউ নেই। কারা নেই !
কথা বলি কিছু শুনে না-শুনেও হয়তো বা। দূর
বিচ্ছিন্ন চেতনা-মগ্ন অবিরল স্বর অন্যমনা।

বলিনি কারুকে তার কথা বলবো না।

দুটি কবিতা

ভিতর এলাকা

সুনীল সরকার

'অনিত্যমসুখং লোকম্'

সংসার দেখায় বেশ সুস্থ সপ্রতিভ ঃ—
অগোণে এগোয় যেন জয়ন্তী-দিবসে,
বাড়ী ওঠে, পথ হয়, অপ্সরী-সন্নিভ
মেয়েরা বেড়ায় ; হাট, রাজ্যপাট বসে,
কাজ রপ্ত হয়, ফের সুতা-ছেঁড়া ভিড়,
গড়িয়ে ছড়িয়ে পায় নিজ নিজ নীড় ঃ—
নিখুঁত, নিপুণ সব।

এই চিরকাল
গ্রাহ্য হয়, ইতিমধ্যে যদি-না দৈবাৎ
উৎকণ্ঠার হাওয়া ওঠে, হৃদয় গোঁয়ায়,
আস্ফুরিত বিলাপের নির্বার নির্ঘাত
বিদ্যুতে আকাশ ছিঁড়ে উলঙ্গ উত্তাল
ঘুমন্ত সমুদ্র জাগে—তারি কিনারায়
উচ্চ হতাশার মারে অশ্রুপঙ্ক মাখা
দেখা যায় সংসারের ভিতর-এলাকা।

নটীর পূজার নটী

মন রে, হবি নটীর পূজার নটী ?
একে একে খুলে ফেলবি সাজ
চিন্তা-মালা, কীর্তি-সিঁথি,
ভাব-উড়ানি, আঁচল, কাঁচল,

বুকের কাছের সুক্ষ্ম সুচি-কাজ,
তারো নীচে আপনা-জানা
আ-রঙা আঙরাখা খানা
খসিয়ে দিবি, লুটিয়ে দিবি আজ ?
আলগা ক'রে বুকের তট, কটি,
হবি কি আজ নটীর পূজার নটী ?

দেখরে ফোটে আকাশপর্দা ছিঁড়ে
পূজারিণী নগ্ন নটীর নাচ,
ম'রে বাঁচার লহর ওঠে,
মৃদঙ্গ তাই মাথা কোটে,
গ'লে মিলোয় প্রাত্যহিকের ছাঁচ।
হৃদয়গলা এই সাগরে
শতদলের মতন ক'রে
নিজেকে তোর ঢেইয়ে তুলে বাঁচ।
কে আজ এসে ধ'রেছে তোর কটি,
হ' দেখি মন নটীর পূজার নটী !

আত্মচেতনাকে

অশেষ চট্টোপাধ্যায়

প্রস্তাবনা

(তাহলে ব্যর্থই হব আমি।
যদি কোনো দ্রুতগামী
পাখিদের পরিশ্রান্ত ডানা,
আচম্বিতে পেয়ে যায় জীবনের মুক্তির মোহানা ;
তবুও সে ব্যর্থতার গ্লানি
দগ্ধভালে পরাবে ভস্মের টিপ। যদিও একথা মানি :
আমার যা কিছু ছিল সামান্য সঞ্চয়
লগ্নির কারবারে সে তো বৃথা অপচয়
আমিই করেছি। অবশিষ্ট যতটুকু দেনা
এ মনের শূন্য অঙ্কে ব্যর্থতার মূল্য শুধবে না ?
ক'খণ্ড অঙ্গার স্মৃতি
হৃদয়ের উপকূল ঘিরে তার শেষ অনাবৃতি
রেখে যাবে ? শুধু তার ছলনার প্রেম
মুছে দেবে ভালোবাসা ; গোধূলির নিকষিত হেম ?)

*

যে-হাসি একদিন জলতরঙ্গের
নূপুরনিক্বণে তুলেছে ঝংকার ;
যে কথা একদিন প্রলাপী বাতাসের
হৃদয় ছুঁয়ে গেছে করুণ শংকায়
কান্না ছলোছলো যে-দুটি ম্লান চোখে
কেঁদেছে শ্রাবণের মিঞাকী মল্লার,

সে-হাসি কথা আর সে-মৃদু কান্নার
করুণ প্রতিলিপি খুঁজলে পাব না তো।
তাহলে কেন বল সকালে রোদ্দুরে
চায়ের পেয়ালায় হাসির স্বরলিপি।
সবুজ ঘাসে ঘাসে ছড়ানো বাদামের
টুকরো রেখে যায় সে কোন কথাদের
অবাক কারুকাজ। বিকেল ধরো ধরো
দুপুরে জানালায় দাঁড়িয়ে একা একা
সে-কোন অভিমানী মেয়ের দুটি চোখে
ব্যথায় ভিজে ভিজে কান্না থমকায়।

*

তাহলে বুঝি সব কথারা আছে
অন্য কোথা অন্য কোনো মনে।
তাহলে বুঝি এই হৃদয়ের কাছে
আরেক মন হাওয়ার ভাষা শোনে।
ফ্ল্যাটের ঘেরা বারান্দায় নাচে
আরেক হাসি টুকরো কত কথা।
বিকেল রোদ্দুরের রঙে সাজে।
আকাশী মাঠে একী এ আকুলতা।
মুক্তো চিকচিকে সে দুটি দুলে
আলোর মৃদু প্রণয়লিপি আঁকা
কত মুখের মিছিলে গেছি ভুলে
তার সে দুই ধনুক ভুরু বাঁকা।
এখনো সে কি আগের মতো আছে
আকাশে চোখ রেখে কপাট ছুঁয়ে

বুঝি সে-মন ঝাউয়ের গাছে গাছে
ঢেউ তুলেছে কী যে ব্যথায় নুয়ে।
তাহলে আমি পুরনো পট মুছি
মনের রঙে আরেক ছবি আঁকি।
তার সে সাদা সিঁথির পথসূচী
খুঁজবো আমি ভরবো সব ফাঁকি।

*

স্তরে স্তরে পুঞ্জীভূত পাহাড়ের উৎকীর্ণ সে লিপি
মুছে যায়। আরেক মায়াবী হাত সান্ত্বনার আশ্চর্য প্রলেপে
ধুয়ে দেয় বেদনার সে তাম্রশাসন। অবাক, অবাক লাগে
কোথা থেকে আসে এই অসহ্য দুঃখের মতো
থরথর নিমীলিত সুখের যন্ত্রণা। বেদনার খনি খুঁড়ে
বুঝি খুঁজে পাই।
স্বেদগর্ভ শ্রমে মোড়া একমুখ আলো-করা হাসি
আমি তবে মুঠো মুঠো বেদনাকে মেখে নিই
আরেক সমুদ্র স্নানে। এ বন্দর যদি পলাতক
হয় কোনো ছলনার কুয়াশায় ঢেকে :
আবার নাবিক মন
পাড়ি দেবে অন্য কোনো দ্বীপে চোখ রেখে।

ওয়ার্ডস্‌ওঅর্থের প্রতি

শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবী

তোমাকে আমার ভালো লাগতো না। শব্দের মৌমাছি
পাখার গুঞ্জন তুলে করেনি বিহ্বল নাচানাচি।
রক্তের মতন লাল হৃদয়ের চোলানো আবেগ,
পাইনি, পাইনি স্বপ্ন, ভেসে-যাওয়া লঘুপক্ষ মেঘ।
হেসেছি, তোমার হাতে প্রাগৈতিহাসিক একতারা।
মুরজ, মুরলী, বীণা সভায় বাজ্‌বে কতো ধারা!
সেই সব অত্যাশ্চর্য বাজনার সাথে সাথে, কতো
আকাশে যে উঠ্‌লাম, জল্‌লাম আগুনের মতো।
গোলাপের মূর্ছা আর চাঁপার নেশায় ডুব দিয়ে
ক্লান্ত মনে ফিরলাম চেতনার তীর হাতড়িয়ে।
ততোক্ষণ শ্বেতশ্মশ্রু, শাদাসিধে প্রসন্ন বাউল
একতারে অবিশ্রাম চালিয়েছো নিঃশব্দ আঙুল।
আকাশের প্রান্তে আঁকা রামধনু। একলা কৃষাণী
গান গায়। ইআরো-র জলে-ধোয়া উপত্যকাখানি।
একটি সহজ মেয়ে, আধো-ঢাকা ভায়োলেট ফুল,
এই সব মেঠো সুর বাজিয়েছে তোমার আঙুল।
আমারো মনের ঝড় থেমে যায়। স্তব্ধ হয়ে আসে
যে-মূর্ছনা, যে-প্রলাপ ছেয়েছিল আকাশে বাতাসে।
বাজাও, বাজাও তুমি মেঠো সুরে বাউলের বীণ।
সাধ যায় কান পেতে শুনি তার ক্ষীণ রিণ রিণ।

অধ্যায় শেষ

অন্নদাশঙ্কর রায়

১

জেনেছি যা তারে না জানতে চাই
শুনেছি যা তারে না শুনতে, ভাই।
করেছি যা তারে না করতে চাই
বলেছি যা তারে না বলতে, ভাই।

গোড়ায় যদি না জানতেম তারে
থাকতেম ভালো অজ্ঞাতসারে।
আদৌ যদি না শুনতেম তারে
থাকতেম ভালো নীরবে নিসাড়ে।

এখন যে দেখি ভোলা নয় সোজা
দেখে শুনে পরে চোখ কান বোজা।
বাক্য ছুটলে ফিরবে না মুখে
গুলী ছুটলে কি ফেরে বন্দুকে!

২

ইচ্ছা যেখানে উপায় সেখানে
ও কানে ঢুকেছে বেরোবে এ কানে।
ইচ্ছা আসল। ইচ্ছা আছে কি?
মনের অতলে ডুব দিয়ে দেখি।

লক্ষ্যভ্রষ্ট হব না কিছুতে
ফিরে তাকাব না কখনো পিছুতে।
সাধনা আমায় দিয়েছে ভারতী
আমি কেন হই পার্থসারথি!

দুনিয়ায় আছে হরেক মন্দ
তাই বলে আমি করব দ্বন্দ্ব!
মন যার নেই সৃষ্টির কাজে
মন্দই তার নয়নে বিরাজে।

৩

মন্দের কবে হবে অবসান
কল্যাণময় নয় এ ধেয়ান।
মন্দের সাজা হবে নিশ্চয়
নয় এ চিন্তা কল্যাণময়।

আমি ভালো আর অপর মন্দ
কল্যাণময় নয় এ ছন্দ।
সৃষ্টি যে করে চেতনায় তার
অকল্যাণের সয় নাকো ভার।

বিধাতাকে দিই বিধাতার দায়
তাঁর দায় আর আমার বিদায়।
আমার ভাবনা লক্ষ্যভেদন
তন্ময় হব শরের মতন।

৪

আঘাত পেয়েছি যেন ভুলে যাই
মুক্ত হয়েছি, সত্য এটাই।
আঘাত না পেলে মুক্তি কে চায়
লক্ষ্যের পানে দৃষ্টি কি যায়!

ভালোই হয়েছে পেয়েছি আঘাত
নইলে চলত নিত্য ব্যাঘাত
বিচ্যুত হয়ে স্বকর্ম থেকে
অকর্ম নিয়ে সুখী হয়েছে কে!

বিধাতার কৃপা আপাত কঠোর
পরে বোঝা যায় প্রয়োজন ওর।
মুছে যাক তবে খেদ বিদ্বেষ
এই অধ্যায় হোক নিঃশেষ।

নির্জন দিনপঞ্জী

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

৩রা বৈশাখ সকাল ॥

আকাশ জেনেছে, মাটিও শুনেছে আমি-যে করেছি আত্মগোপন!
আমি আজ তাই প্রবাসী আকাশে
হাওয়ায় হাওয়ায় ঘাসে আর ঘাসে
নিজের মনের নিরালাবৃক্ষ করব রোপণ;
পিছনের যারা পিছনেই থাক,
শুনব না আর কারো পিছুডাক—
সাড়া-না-দেবার শপথ না হয় না হোক শোভন।

রাত্রি ॥

ছুটি মাত্র ছুটি দিন, তারপর শহরের ঋণ
তিলে-তিলে আমাকেও শুধে দিতে হবে;
হে মৃত্তিকা, হে আকাশ শেষবার কথা রাখো তবে,
আমার দু-হাতে দাও ছুটি দিন প্রতিশ্রুতিলীন:
একটি ভাস্বর হোক্‌, যে আমায় বিপুল বৈভবে
নীরবে উত্তীর্ণ করে—আরেকটি অঙ্গারমলিন
হোক্‌, তাতে ক্ষতি নেই, আমার অতন্দ্র কোনো প্রতীক্ষার পূর্ণ প্রণিপাতে
হৃদয়ের সহচর সময়ের হাতে
যে অঙ্গার অবশেষে হীরক হবেই।

৪ঠা বৈশাখ, ভোর ॥

এই সকালের আড়ালে কি কোনো তামসী রাতের
অন্ধকারের প্রস্তুতি নেই?

নির্জন থেকে জন্ম যে-সব সোনালিমায়ার কুহেলিকাদের
এ-সকাল মাতে তাদের সঙ্গে প্রদক্ষিণেই !

শ্বেতকরবীর বুক জুড়ে ওই একটি শালিক
বসে আছে যেন ঐন্দ্রজালিক।

আর তাই বুঝি ঈর্ষাপ্রখর প্রজাপতিটার
মাতাল পালকে হাওয়া ছুঁয়ে যায় চপল গীটার—
আমারো চিন্তা আমারো অঙ্গ
হোক তবে আজ হাওয়ার সঙ্গে অন্তরঙ্গ।
সেই হাওয়া ফের ছোট্ট দীঘির
শাপ্‌লায় গড়ে নিলাজ খুশির নিপুণ শিবির
আবার হঠাৎ আড়ালে বাজায় জলতরঙ্গ,
সেই সুর নিয়ে ছিনিমিনি খেলে
রোদ্দুর আঁকে জলছবি নয়, জীবনের ছবি জলের ইজেলে—
হোক্ তবে আজ আমারো চিত্ত আমারো অঙ্গ
জলের সঙ্গে আলোর সঙ্গে অন্তরঙ্গ।

নিরালা নিখিল, সব-কিছু দাও,
মৃত্যুর সুরা, জীবনসুধাও,
আর তারপরে দ্বিগুণ অর্ঘ্য অর্চনা নাও।

দুপুর ॥

সারাদিন আমি এক দুর্বিষহ রহস্যের পাশে
দাঁড়িয়ে রয়েছি একা। যে আমাকে দূরের প্রবাসে
নির্বাসন দিয়ে সুখী, দীপ্ত সেই রহস্যময়ীর
চেয়ে বুঝি এ-রহস্য আরো গাঢ় অতল গভীর,

এবার আমাকে তাই কিছুতেই মুক্তি দেবে না সে,
আমি তার নদী আর সে আমার নম্রনদীতীর ;
নম্র সে, নিষ্ঠুর তবু আমাকে সর্বদা ঘিরে রাখে,
আমি যদি যেতে চাই দূরতর সাগরের ডাকে,
আমার অনন্ত গতি সীমন্তে সিঁদুর ক'রে আঁকে।

ওখানে আশ্চর্য এক দরদী নদীর
বুকের দর্পণে দোলে পুরাতন দ্বাদশ মন্দির।
আমারো হৃদয় এক নদী,
আমার জীবন তবে এখনো হলো না কেন মন্দিরের মতো মহাবোধি ?

মন্দিরের পাশে এক মাঠ,
দিগ্বলয় হতে আরো আরো দীর্ঘ মনে হয় যাকে,
হাট বসেছিল কাল, আজ তার বিষণ্ণবিরাট
শূন্য বুকে ঘুরে মরে একা একটি মা হারা বাছুর,
সমস্ত দুপুর
খুঁজেছে সে মাকে,
তারপর শুয়ে আছে বটের ছায়ায় মৌন রৌদ্রভারাতুর।

বিকেল ॥

উদাসীন মেঘে মেঘে ফুটে আছে থোকা-থোকা
আরক্তকরবী :
সমস্ত আকাশ যেন গগনেন্দ্র ঠাকুরের ছবি।
ধানকলে কাজ সেরে এইবার ঘরে ফেরে
সাঁওতালি মেয়েরা ঝাঁকে ঝাঁকে,
দাদারিয়া গানে-গানে সে-করবী তুলে আনে
খোঁপার ফণায় গুঁজে রাখে।

ভিড় থেকে স'রে আসি প্রবাসী আকাশে,
তবু কেন তার মুখ ভিড় ক'রে আসে ?
আরো দূরে পাহাড়চূড়ায়
দুই চোখ ডানা করে মেলি,
ওখানে কে ব'সে আছে ? আমারই বেদনা যেন চন্দনরাঙানো লালচেলি,
ওই তো রাজর্ষি সূর্য দিনশেষে শরীর জুড়ায়,
মৃত্যুতে মরে না, সে যে নব সবিতার তেজে
দীপ্তি পায় দিন থেকে দিন,
আমার বেদনা তবে এখনো হলো না কেন সূর্যের মতন সমাসীন ?

সন্ধ্যা ॥

কে ছড়ালো এই দুঃসহ মহানিশি ?
বিনিদ্র চোখ, নীরন্ধ্রে, নির্জনে
বাসনার বুড়ি ডাইনী গেল না সুদূর নির্বাসনে ?
অশান্ত মন। দিগন্তে তবু অপূর্ব উদাসীন
আপন আলোর পালঙ্কলীন সুপ্ত সপ্ত ঋষি !

৫ই সকাল ॥

গতরাত্রি গেছে যন্ত্রণায়,
বিগত শোকের শিল্পী আকাশের কোনায় কোনায়
সোনার মাধুরী ছিঁড়ে শ্রাবণের মেঘের মতন
কুটিল কাজল আঁকলো। হে নির্বাক ওগো নিরঞ্জন,
তোমার প্রতিভূ যেন এইবারে ভৈরবী শোনায়।

দুপুর ॥

মাঠে-মাঠে ওই ঝুমুর ছন্দে কাঁপছে চাষীর জীবনশৈলী
ওরে মন, কেন গেলিনে সেখানে, নিজের মনের গোপনে রইলি ?

ভুলে গেলি কেন কথা ছিলো তোর সবার সঙ্গে অঝোরে মিল্‌বো :
সেই-তো আমার স্বর্গসাধন, সেই-তো আমার জীবনশিল্প !

বিকেল ॥

অজ্ঞাতবাসের সঙ্গী আমার দুজন—
একজন কোন্ এক দূর গাঁয়ে সতীশের পিসী,
আমাকে ভেবেছে তার পরম সুজন,
অতএব মেনেছে সালিশী :
সকলেই চেনে তার ভিটা,
সন্নিহিত ইঁদারার পাশের জমিটা
একান্ত নিজস্ব তার—পাড়ার সবাই সেটা জানে,
অথচ পিসীর সঙ্গে সতীশের কলহ সেখানে !
কোলে-পিঠে গড়ে-তোলা সে-ই কিনা হিংসার প্রতীক ?
সুতরাং সে-জমির কোন্‌জন আসল শরিক ?

অন্যজনা সাতাত্তর বছরের বুড়ি,
যেন এক প্রাণবৃক্ষ জীবনে জীবনে শতঝুরি
ছড়িয়ে এখন ভাবে গুটিয়ে নিলেই ঠিক হতো,
কারণ আজন্ম তার পুজো আর ব্রত
ব্যর্থ ক'রে ভগবান একমাত্র বয়স্ক ছেলেকে
নিজের স্বর্গের স্বার্থে নিয়েছেন ডেকে ;
যখন ওপারে গেল একষট্টি বয়স ছিলো তার,
বিধাতার কাছে গেছে, বুঝিয়েছে এ-গাঁয়ের লোক,
কি-ক'রে ভুলবে সে তবু একে-একে একষট্টি বছরের শোক
শিরায় শিরায় যার সাতাত্তর বছরের ভার ?

আমি তাকে কি বোঝাই ; তাকে আমি বলিনি কিছুই,
সে যখন ফিরে গেল   নিরালা নীলিমা জুড়ে
        আমার শোকের পাশাপাশি,
তার সেই শোক রেখে আমি,
অপার আনন্দ নিয়ে তারপর দুজনারে ছুঁই।
এই রাত্রি গাঢ় হোক   তারপর দুটি শোক
        খুঁজে নিক্ বীতশোক বীণ—
হে নির্বাক নিরঞ্জন   তারপর এ-জীবন
        করে দাও সূর্যসমাসীন।

সেই সান্ত্বনা হয় যেন ধ্রুব :
যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব।

ছুটি শেষের রাত্রি ॥

আবার সেই ম্লান সহর, কালো গলি,
স্তিমিত গান, ওখানে যেন কোনো অসুখ
দুহাতে এসে ফেলেছে ঢেকে দিনের মুখ ;
কলকাতায় ফিরে চলি।
তবু নিলাম দুটি দিনের দুঃখসুখ,
নিরিবিলির ছায়ানিবিড় কণাকলি,
চূর্ণ হোক কলকাতার কালো গলি :
ব্যথার কুঁড়ি গানের ফুলে ফুটে উঠুক ॥

প্রতারণা

হুমায়ুন কবীর

কাছের পাহাড়ের গায়ে সবুজ ঘাসের আস্তর,
    দূরের পাহাড়ের মাথায় পাইনের সারি
        যেন হাজার মন্দিরের চূড়া।
মাঝখানে বয়ে চলেছে ছোট পাহাড়ি ঝর্ণা,
যতটুকু তার জল তার চেয়ে বেশী কলরোল।
        ঘাসের আচ্ছাদন নিস্পন্দ।
    দেখে মনে হয় যেন প্রাণহীন,
গভীর প্রশান্তি যেন ছড়িয়ে রয়েছে পাহাড়ের গায়ে।
দূরের পাইন স্তব্ধ ধ্যানমূর্তির মতন দাঁড়িয়ে,
        বাতাসে পাতাটুকুও নড়ে না,
মনে হয় সমস্ত পৃথিবীর স্তব্ধতা
        এখানে এসে জমাট বেঁধে গেছে।
বিরাট স্তব্ধতা এবং শ্যামল প্রশান্তির মাঝে
    একটুখানি চঞ্চলতা এনেছে খালি ঝর্ণার জলের ধারা।

হঠাৎ মনে পড়ে কত বড় মায়ার খেলা চলেছে এখানে।
        পাইনের স্তব্ধতা ছদ্মবেশী,
তারই আড়ালে চলেছে বাঁচবার কী নিষ্ঠুর সংগ্রাম।
কঠিন পাথর ভেদ করে যেখানে মাটীর একটুখানি কণা
তার রস নিঃশেষ ক'রে পাইনগুলির বাঁচবার কী কঠিন প্রয়াস !
শিকড়ে শিকড়ে সে কী জীবনরসের জন্য কাড়াকাড়ি,
একে অপরকে ছাপিয়ে উঠে
        আলো পাবার কী আকুলতা !
    ঘাসের বনেও জীবনের সেই দুর্নিবার ক্ষুধা।

আষাঢ় ১৩৬১

প্রতিটি ঘাসের শিকড়ে বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা,
দুর্বাদলের শ্যামল আচ্ছাদনের প্রতিটি তৃণ
অন্য সবাইকে বঞ্চিত ক'রে আলো-জল-বায়ুর পিয়াসী।
দেখতেই শুধু পাইনতরু স্তব্ধ সমাধিমগ্ন,
দেখতেই শুধু ঘাসের কোমল গালিচায় সবুজ প্রশান্তি।
ঝর্ণার জলধারার চঞ্চলতার মধ্যে রয়েছে প্রাণের আভাস।
সেখানে সংগ্রাম নেই, সেখানে আছে গতি।
ঢেউয়ে ঢেউয়ে মাথামাখি,
জলের কণায় কণায় ঠেলাঠেলি,
দুরন্ত আবেগে শুধু সামনে ছুটে চলে।
কঠিন পাথরকে ভিজিয়ে,
শুকনো মাটীকে সরস ক'রে,
রুক্ষ শিকড়কে প্রাণের রস জুগিয়ে,
পৃথিবীর চারিদিকে প্রাণ ছড়িয়ে,
সমস্ত প্রশান্তির মধ্যে জীবনের চঞ্চলতা এনে,
সবুজ ঘাসের গালিচা বেয়ে,
পাইনের মৃত্যুশীতল সবুজ অন্ধকার ভেদ ক'রে,
বর্ণহীন অথচ হাজার বর্ণে বিচ্ছুরিত জলের ধারা
দিবারাত্রি কার আহ্বানে
কোথায় ব'য়ে চলে?

গুলবার্গা। ২২ জুন ১৯৫৪

তিনটি কবিতা

শোভন সোম

১

এক ঝাঁক শিশু খুশির খেলায়
মুঠো মুঠো রেণু ছড়ায় হেলায়
শাখায় শাখায় কল-কলরবে
মেতেছে প্রাণের মহা-উৎসবে।
এক ঝাঁক শিশু যেন আলোকের তূণ থেকে ছুটে
শাঁ শাঁ রব তুলে জীর্ণ পাতার ক্ষীণ করপুটে
ছড়ায় আবির নতুন পাতার, খেলে সারাদিন
এক ঝাঁক শিশু গোটা পৃথিবীর শোধ করে ঋণ॥

২

এক শ্রাবণের বৃষ্টির কত স্রোতের সঙ্গে
আমাকে কখন হারিয়েছিলেম, বিপুল রঙ্গে
খেলার মাতনে—তাথা থৈ থৈ সে কী উচ্ছ্বাসে বাজিয়েছিলেম কত করতালি
এক শ্রাবণের বৃষ্টির শেষে পড়ে আছে শুধু চোখ-ধূ ধূ বালি॥

৩

একটি কথার স্পন্দন লেগে বুঝি কারো মনে
অজস্র ঢেউ তুলেছিল কণা
হৃদয় নিভৃতে কখন গোপনে
পিলসুজে পুড়ে ছাই হয়ে গেছি, কেউ জানলো না॥

সমুদ্রের প্রতি—জাহাজ থেকে

বুদ্ধদেব বসু

আমিও তোমার মতো নিঃসন্তান হয়েছি এখন।
তীর নেই, শস্য নেই, নেই পল্লী, কুটির, কানন।
শুধু ঢেউ, চঞ্চলতা; ফুলে-ওঠা দীর্ঘশ্বাস আর
সকল দিগন্ত জুড়ে ক্ষমাহীন ক্ষুধার বিস্তার।
যেন কোন জন্মান্তরে চিরন্তনী পরান-প্রিয়ারে
পেয়েছিলে ঈশ্বরের হাত থেকে এই অঙ্গীকারে,
'যারে ভালোবাসো তারে ছেড়ে দিয়ে চ'লে যেতে হবে।'
তাই আর শান্তি নেই। তাই চাপা-কান্নার তাণ্ডবে
ঢেউয়ে-ঢেউয়ে উতরোল প্রতিবাদ। তাই হাহাকার,
তুফান, তুষার-শিলা, ডুবে-মরা নাবিকের হাড়,
হাঙরের দাঁতে-ছেঁড়া যন্ত্রণার অব্যক্ত চীৎকার—
এই সব ছেয়ে আছে তিক্ত নীল রক্তের লবণ।

আমিও তোমারি মতো সর্বস্বান্ত হয়েছি এখন।

বর্ষণ

অরুণকুমার সরকার

রাত্রি আর নয় বিরহী যক্ষ,
ঊর্ধ্বগ্রীব, আহা, স্তনময়তায়।
পেয়েছে প্রাণ আজ, জেগেছে ক্লীব-যে
বৃষ্টিধারা অব্যর্থ লক্ষ্য।

ছুঁয়েছে শব্দের স্নায়ুর কেন্দ্রে
অবাক যন্ত্রণা মলিন পুষ্প,
বিলীন জোছনার আভার ফাঁকে-যে
অর্ধবিকশিত করুণ বন্দী।

ছুঁয়েছে উন্মাদ উধাও মুক্তি
অবাক লাখ লাখ ক্ষুধিত বৃন্ত,
শুষ্ক শাখে শাখে ঝরছে বৃষ্টি
রাধার চোখে নামে কিশোর কৃষ্ণ।

ঝরছে অবিরাম মুখর শব্দে,
অর্থ আর নয় সুদূরবোধ্য,
প্রস্ফুটিত ফুলে, বস্তুপুঞ্জে,
ঊর্ধ্বগ্রীব, আহা, স্তনময়তায়!

আবির্ভাব

বুদ্ধদেব বসু

তারপর এলো দেবদূত। বই প'ড়ে, গল্প শুনে যেমন ভেবেছি
কিছু নয় তার মতো। নয় লাল তলোয়ারে আঁকা,
আগুনের পাখা নেই, নেই কোনো অলৌকিক অলংকার।

মনে হ'লো উষ্ণ, ছোটো, বাদামি, নরম এক পাখি
বছরের ঢেউয়ের ঝাপসা ফেনা পার হ'য়ে এলো,
বুকে তার কিশোর কান্নার দাগ হেমন্তে হলুদ,
অথচ ঠোঁটের ফাঁকে নীড়ের প্রথম তৃণ, বসন্তের ভার।

অসীম নির্ভরে ভরা ছোট্ট মুঠোর মতো পাখি।

আমি ছিনু শুকনো ডাঙায় প'ড়ে। যেখানে নির্জনে
পাথর, আবর্জনা মরা মাছ, শ্যাওলা শামুক
কখনো দেয় না সাড়া জাহাজের সুদূর ধোঁয়ায়,
সেখানেই পালকের স্পর্শ তার চুম্বনের মতো।
আমার কঠিন মৃত্যু হ'লো তার বিশ্রামের দ্বীপ।

—কিন্তু কেন? বিচ্ছেদের অবসান হবে ব'লে?
নির্বাসন ভেঙে যাবে ঘরে-ফেরা মুখর হাওয়ায়?
ও-কথা তারাই ভাবে যারা ভালোবাসেনি এখনো।
তার পথ অন্তহীন, যাত্রা তার যুগে-যুগান্তরে,
তাই যাকে দেখা দেয় তার কিছু থাকে না তো আর—
কেবল তৃষ্ণার তাপে কবরের মাটি ফাটে।

সেই তো উদ্ধার।

বুদ্ধদেব বসুর কবিতা

নরেশ গুহ

রবীন্দ্রনাথের পর যে-পুরোধা কবিদের একদা-ধিকৃত 'ঔদ্ধত্যের' ফলে বাংলা কবিতার বর্তমান জন্মান্তর ঘটেছে তাঁদের মধ্যে বুদ্ধদেব বসুর আনুপূর্বিক কবিতাবলীর অন্তর্নিহিত ঐক্য অসাধারণ তাৎপর্যপূর্ণ। সুরু থেকেই আনকোরা আধুনিকের মন নিয়ে তিনি কবিতা লিখতে বসেননি। অথচ বিবেকবান আধুনিকের কাছে যে-শিল্পসমস্যা প্রধানতম তার লক্ষণ যথেষ্ট চড়া মাত্রাতেই 'বন্দীর বন্দনা'য় বর্তমান ছিল। এ সমস্যা পরলোক, ঈশ্বর আর অনন্তজীবনে আস্থা হারিয়ে ইহলোকেই শিল্প আর জীবনের দারুণ দ্বন্দ্বে নতুন ক'রে সমন্বয় সাধনের সমস্যা। এই সমন্বয় সন্ধানের ইতিহাসই বুদ্ধদেব বসুর কবিজীবনের ইতিহাস। এবং সেই সমন্বয় খুঁজতে গিয়ে আঙ্গিক, ভাষা, ছন্দ, উপমা উৎপ্রেক্ষা সব কিছু নিয়ে তাঁর কাব্যের চরিত্র এমন অত্বরান্বিত অথচ নিশ্চিত গতিতে বিবর্তিত হ'য়ে উঠেছে যা তাঁর মুগ্ধ পাঠকমণ্ডলীকেও প্রথম প্রথম এড়িয়ে যেতে পারে। পুরাতনের সঙ্গে তাঁর সংযোগের সেতুখানা তিনি একেবারে উড়িয়ে দেননি বলেই তাঁর রচনাবলী থেকে হৃদয়ঙ্গম করা সহজ যে আধুনিক বাংলা কবিতার সুসংগত স্বাভাবিক এবং অনিবার্য বিকাশ কোন পথে। সেজন্য, বলাবাহুল্য, তাঁর একটি মাত্র কাব্যগ্রন্থ কিংবা নির্বাচিত কয়েকটি মাত্র কবিতাই যথেষ্ট নয়, কেননা বুদ্ধদেব বসু সেই শ্রেণীর কবি যাঁর এক যুগের কবিতার সঙ্গে অন্য যুগের কবিতাবলী এক সংলগ্ন ধারাবাহিকতার সূত্রে গ্রথিত। বিচ্ছিন্ন কবিতা থেকে তাঁর শুধু খণ্ডিত এবং আংশিক পরিচয়ই পাওয়া যাবে। ইংরেজ কবিদের মধ্যে ইএটস্ এই শ্রেণীর কবি। বুদ্ধদেবের 'শ্রেষ্ঠকবিতা' নামের কাব্যসংকলন থেকে পাঠকদের অন্ততঃ এইটুকু সুবিধা হবে যে এই একটি গ্রন্থেই তাঁরা সমগ্র রচনাবলী থেকে কবির নিজের নির্বাচিত বহু কবিতা কালানুক্রমিক ভাবে সাজানো পেয়ে যাবেন এবং তা থেকে তাঁর কাব্যকলার আশ্চর্য বিবর্তনের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন হবে না।

জীবনানন্দ দাশের কাব্য আলোচনা করতে গিয়ে বুদ্ধদেব লিখেছিলেন :

'আমাদের কবিদের মধ্যে জীবনানন্দ সবচেয়ে কম 'আধ্যাত্মিক', সবচেয়ে বেশি 'শারীরিক'; তাঁর রচনা সবচেয়ে কম বুদ্ধিগত, সবচেয়ে বেশি ইন্দ্রিয়গত।' ইন্দ্রিয়গত ভাষার ব্যবহার বুদ্ধদেব বসুর নিজের রচনাতেও কিছু কম নেই। অকায় উপলব্ধির প্রকাশ করতে হলেও সচেতনভাবে তিনি সেইসব চিত্রকল্পেরই সহায়তা নিয়ে থাকেন যার ফলে তাঁর হৃদয়াবেগের কবিতাও প্রথম হানা দেয় আমাদের ইন্দ্রিয়ের দরজায়। দৃষ্টান্তের জন্য পাতা হাতড়াতে হবে না:

গাছের সবুজে রোদের হলুদে গলাগলি,
পাতায়-পাতায় হঠাৎ হাওয়ার বলাবলি;
উঁকি দেয় বুকে ভীরু কবিতার ক্ষীণ কলি—
আহা, বিকেল! সোনার বিকেল! ('বিকেল')

কিন্তু উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। আমার বলবার কথা এই যে ভাষাব্যবহারে সচেতনভাবে শারীরিক হয়েও বুদ্ধদেব আধুনিকদের মধ্যে 'আধ্যাত্মিক' কবি। তিনি যে ধর্মবিষয়ে কবিতা লিখেছেন, কিংবা তাঁর শিল্পজিজ্ঞাসা যে আসলে ঈশ্বরজিজ্ঞাসার নামান্তর তা কখনোই নয়। তিনি 'আধ্যাত্মিক' এই অর্থে যে তাঁর সমগ্র কাব্যরচনার মধ্য দিয়ে,—শিল্পীর সংজ্ঞা কী?—এই একটিমাত্র জিজ্ঞাসারই তিনি উত্তর খুঁজেছেন। এর চাইতে ভিন্ন কোনো আধ্যাত্মিক সমস্যা শিল্পীর পক্ষে অবান্তর সে কথা বলা বাহুল্য। আধুনিকের পক্ষে এই প্রশ্নের উত্তর যে এমন জরুরী হ'য়ে উঠেছে তার কারণ এ-যুগের মানসিক চরিত্র সংশয়ী বিজ্ঞানের পাঠশালায় গড়া; সমাজ এবং নীতির ক্ষেত্রে চিরাচরিত মূল্যবোধের বিপর্যয় এ-যুগের সামান্য লক্ষণ। 'অগ্রজের অটল বিশ্বাস' হারিয়ে অল্পবিস্তর সবাই আমরা অশান্ত উদ্‌ভ্রান্ত অস্থির। এ অবস্থায় বিবেকবান কবিমাত্রেই নতুন ক'রে শিল্পীর সংজ্ঞা নির্ধারণ করার তাগিদ বোধ ক'রেছেন। যার পরলোক নেই, স্বর্গ মিথ্যে হ'য়ে গেছে, জৈব অস্তিত্ব যার কাছে প্রহসন মাত্র:

অবাস্তব, তুচ্ছ, নিরর্থক,
পরিত্যক্ত বিবর্ণ পুতুল—
ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো, আর
কয়েকটি হাড়—
এই আমি, এ-ই আমি। ('দময়ন্তী')

নিদারুণ সত্য এই আত্মপরিচয় যার পক্ষে ভুলে থাকা অসম্ভব, তিনি যদি দৈবক্রমে শিল্পী হ'য়ে থাকেন তাহলে—শিল্পী হিসেবে তাঁর কাজ কী—এ প্রশ্নের কোনো চিরাচরিত জবাবই তাঁর আজ আর কাজে লাগবে না। দ্বন্দ্বে দ্বিধায় পীড়িত, হতাশা লাঞ্ছনার হাতে ছিন্নবিচ্ছিন্ন, আপাত অর্থহীন, শতগ্রন্থিময়, জটিলই এই জীবনকে নিয়ে কী আমি করতে পারি? কোন আশায়, কোন আনন্দে, কিসের আশ্বাসে?—নিজের স্বভাবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এ প্রশ্নের উত্তর কবির নিজেকেই খুঁজে নিতে হবে। যুক্তিব্যবসায়ীর সিদ্ধান্ত, নির্ভুলও যদি হয়, কবির প্রয়োজন মেটাবে না। উত্তর পাবার একটিমাত্র পথই কবির সামনে খোলা আছে—কবিতা রচনা। এই সূত্রে রজার ফ্রাই কৃত মালার্মে-অনুবাদের ভূমিকায় শার্ল মোরোঁ যে-কথা বলেছেন তা অনুধাবনযোগ্য।

There is no art. There are only men who are artists, who at each moment in their lives, are their own definition.

'বন্দীর বন্দনা' থেকে 'দ্রৌপদীর শাড়ি'—এই দীর্ঘ বিশ বছর ধ'রে লেখা কবিতার ভাব-ভাষা-চিত্রকল্প এমন কি ছন্দ থেকে মনোযোগী পাঠক আবিষ্কার করতে পারবেন বুদ্ধদেব বসুর মনে শিল্পীর সংজ্ঞাটিও দিনে দিনে কি ভাবে বিবর্তিত হ'য়ে উঠেছে। তাঁর প্রেমের কবিতার বৈশিষ্ট্য এই যে, যিনি প্রেমিক তিনি এখানে উপরন্তু সচেতন শিল্পীও। এ থেকে তাঁর কাব্যের ভাবানুষঙ্গের অলক্ষ্য জটিলতা অনুমেয়।

'বন্দীর বন্দনা' পড়তে ব'সে কবিতাগুলি আবার নতুন ক'রে ভালোবাসলুম। মনগড়া এক বিধাতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কথা আছে গ্রন্থের কোনো কোনো কবিতায়, যে বিধাতাকে অতুলচন্দ্র গুপ্ত মশাই বলেছিলেন 'পুতুল' আর যে বিদ্রোহকে 'পুতুলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ'। পৃথিবীকে সেদিন মনে হয়েছিল বন্দীশালা, যেখানে

আনন্দনন্দিত দেহে কামনার কুৎসিত দংশন
জিঘাংসার কুটিল কুশ্রীতা।

এবং এই কিশোর কবিতাবলীতেই দেখা যাবে শিল্পীর সঙ্গে জীবনের দ্বন্দ্ব কিসে

ঘুচবে, অস্তিত্ব কিসে অর্থময় হ'য়ে উঠবে সে জিজ্ঞাসা উপস্থিত। আর তখন কবি তার উত্তর খুঁজেছিলেন প্রেমের মধ্যে। অস্তিত্ব তখনই অর্থময় হ'য়ে ওঠে হৃদয় যখন বলতে পারে :

তবু আমি ভালোবাসি, তবু আমি ভালোবাসি আজি।

'বন্দীর বন্দনা'র বিশ বছর পরে লেখা 'দ্রৌপদীর শাড়ি'। একদা যে-প্রেমের আশ্রয় ছিল নারীদেহে তা এই বিশ বছরের কবিতায় ক্রমে দেহের আশ্রয় ত্যাগ করেছে, হ'য়ে উঠেছে বিশুদ্ধ একটি ভাবনামাত্র, ভাষার অলঙ্কারে সাজিয়ে যে ভাবনাকে রূপ দিতে পারাই শিল্পীর এখন একমাত্র কাজ, তাঁর আনন্দ, তাঁর জীবনের মূল্য। সংশয় এ যুগে অনিবার্য। এমন কি এই তরুণ বয়সের কবিতাতেও প্রেমের কাছে তাঁর কোনো ভাবালু রোমান্টিক প্রত্যাশা নেই :

ননীর শরীর তব যেমন রেখেছে ঢেকে কুৎসিত কঙ্কাল,
তেমনি তোমার প্রেম কোন প্রেতে করিছে গোপন—
তাহা কহিবো কি ?
আমার দুর্ভাগ্য এই সকলি জেনেছি। ('প্রেমিক')

স্বপ্নভঙ্গের তীব্র-যন্ত্রণা নিয়ে তিনি শুধু যদি ব্যঙ্গবিদ্রূপের কবিতা লিখেই শেষ করতেন তাতেও যুগের লক্ষণই থাকতো। কিন্তু বুদ্ধদেব বসুর মনের স্বভাব আস্তিকের। বিনষ্ট অতীত, শূন্যময় ভবিষ্যৎ নিয়ে, বর্তমানের বিভীষিকায় ডুবে মরা তাঁর আস্তিক্যবুদ্ধির সম্পূর্ণ বিরোধী। সংশয় অতিক্রম ক'রে এমন কোনো ধ্রুবআশ্রয়ের তিনি সন্ধানী যার অস্তিত্ব খুঁজতে হ'লে কোনো প্রাচীন ধর্ম কিংবা আধুনিক দর্শনের কল্পলোক হাতড়াতে হয় না।

মরণের তিক্ত কালকূট
আমার চরম ভাগ্য।·· ···············
তবু যে জাগিছে আজি সংগীত-তরঙ্গ-ভঙ্গ হৃদয়ের হিম সরোবরে—
সে শুধু তোমারি লাগি। ('আর-কিছু নাহি সাধ')

'কঙ্কাবতী'র কবিতাতেও নারীপ্রেমের এই অগাধ কুহকেরই বন্দনা। অনাত্মীয়

বিশ্বপৃথিবীর প্রাণের দরজা খুলে দেয় এই প্রেম, শিল্পীর কাজ সেই প্রেমের গান গাওয়া :

আঁকাবাঁকা মেঘ, একা বাঁকা চাঁদ, বাঁকারেখা চাঁদ, জলের নিচে,
আঁকাবাঁকা জল, একা বাঁকা চাঁদ, আকাশ ফাঁকা।
আমি চেয়ে থাকি, দেখি চোখ ভ'রে : মনে হয় মোর আঁকাবাঁকা জলে,
মেঘের রেখায়
একা বাঁকা চাঁদ চুপচুপ ক'রে কথা ক'য়ে যায় :
ফাঁকা আকাশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঝ'রে পড়ে সুর—'কঙ্কা! কঙ্কা!
কঙ্কাবতী।' ('কঙ্কাবতী')

এমনকি 'নতুন পাতা'তেও প্রেমই ইহলোকের স্বর্গদ্বার। পরিবর্তন দেখা দিয়েছে 'দময়ন্তী'র যুগে। নিঃসঙ্গতাই যে শিল্পীর বিধিলিপি একথা কবি এতদিনে মেনে নিয়েছেন, কেননা যে-প্রেম পৃথিবীকে স্বর্গ বানায় তার বাসা, জীবনই তাঁকে শিখিয়েছে, কোনো মরদেহেই চিরস্থায়ী নয়। নিছক বাঁচার মধ্যে সম্পূর্ণ নয় কোনো আনন্দের বৃত্ত। নিছক বাঁচার সঙ্গে শিল্পীজীবনের তাই জন্মান্তরের ব্যবধান। অতএব প্রার্থনা :

······আমার ইচ্ছার
চক্র থেকে মুক্ত করো সূর্য, চন্দ্র, সমুদ্র, পাহাড়,
মুক্ত করো জন্ম, মৃত্যু ; আমার প্রেমেরে
প্রেমেরেও মুক্তি দাও ইচ্ছার শৃঙ্খল থেকে—

('দময়ন্তী')

এ-প্রার্থনা, বলা বাহুল্য, শিল্পীর নিজের কাছেই নিজের প্রার্থনা। বহিরাশ্রয়ী মনের স্বাবলম্বী হ'য়ে ওঠার মধ্যে যে বেদনা আছে সেই বেদনাও নিস্পৃহ শিল্পীর কাছে কাব্যের উৎস। এ বিষয়ে কবি নিঃসংশয় হ'তে পেরেছেন 'দ্রৌপদীর শাড়ি'তে এসে। জীবনের নয়, ভাষার পথই শিল্পীর পথ, সঙ্গময় নিঃসঙ্গতার মধ্যে একাগ্রচিত্তে ভাষার প্রতিমা গড়াতেই শিল্পীর পরমার্থ—কবিতার পর কবিতায় এই প্রত্যয়ের কথা তিনি ব্যক্ত ক'রেছেন। শিল্পীর সঙ্গে

জীবনের আপাতবিরোধের অবসান হ'য়েছে। ব্যথা-ব্যর্থতা-হতাশা-বেদনা, সব কিছুর সঙ্গে শিল্পী নিরাসক্ত আত্মীয়তা জেনেছেন :

নবীন আমার প্রৌঢ় বয়স, প্রৌঢ় তোমার যৌবন
তোমাতে আমাতে এক জনমের ব্যবধান।
তোমার জীবনে এখনও ফলিত ললিতকলার রূপরস
আমার জীবন শুধু শিল্পের উপদান। ('প্রৌঢ় প্রেম')

গত কয়েক বছর ধ'রে বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় বিষয় হিশেবে ভাষা-ছন্দ এবং কবিতার বাহুল্য দেখে যাঁরা বিভ্রান্ত এবং উক্ত লক্ষণকে যাঁরা দুর্লক্ষণ ব'লে জল্পনা ক'রেছেন তাঁরা এই শিল্প সমস্যাটির কথা ভেবে দেখেছেন কিনা জানি না। নবলব্ধ এই প্রত্যয়ের কথা ছন্দের ভাষায় ঘোষণা ক'রেই বুদ্ধদেব ক্ষান্ত হননি। সে প্রত্যয়ের ফলে তাঁর কবিতার রূপগুণের কী পরিবর্তন হ'য়েছে সেটাই বড়ো কথা।

আমার ভাবার ছন্দ, আমার ভাষার স্বপ্ন যদি
ঢেউ তোলে কোনো সুদূর আগামী কল্যে,
আমি বেঁচে আছি সেই কলাকৈবল্যে। ('প্রৌঢ় প্রেম')

কিংবা

তণুর অণুর মন্ত্রমুগ্ধ গণিতে
যদি পারি মোর ভাষার ছন্দে ধ্বনিতে,
যদি তার রূপ ধ'রে দিতে পারি একলা রাতের ভাবায়,
কল্পলোকের আভায়,
সে কোন অনামী অনুকম্পায়ী আগামী কালের জন্য ;—
তাহ'লেই, শুধু তাহ'লেই আমি ধন্য। ('প্রৌঢ় প্রেম')

এ শুধু একটা 'মুডে'র কথা নয়। 'দ্রৌপদীর শাড়ি' থেকেই তাঁর কাব্যে মিতব্যয়ী ভাবভাষার নিগূঢ় সামঞ্জস্য দেখা দিয়েছে, সঙ্গীতময় প্রবহমানতার সঙ্গে মিলিত হয়েছে রেখাচিত্রময় ভাষার আশ্চর্য সংহতি গুণ। কঠিন আয়াস-লব্ধ আপাতসহজ ভাবচিত্রের বহু ব্যঞ্জনা অনভ্যস্ত পাঠকের কানমন এড়িয়ে যেতে পারে যদি তিনি শুধু বাইরের চেহারা থেকেই এ কবিতাকে তরল

অনুমান ক'রে থাকেন। আর যাঁরা মনে করেন পৃথিবীকে একটিবার ঢেলে সাজতে পারলেই শিল্পের সঙ্গে জীবনের চিরবিরোধ দূর হ'য়ে যাবে, কাজেই শিল্পীর কর্তব্য বিশ্বশোধনযজ্ঞে তাঁর লেখনীটিকে উৎসর্গ করা, তাঁরা যে বুদ্ধদেব বসুর কাব্যের সাম্প্রতিক পরিণতি দেখে দীর্ঘশ্বাস মোচন করবেন সেটা স্বাভাবিক। কবিতা লিখতে ব'সে ভাষার ভাবনা তাঁদের কাছে অকিঞ্চিৎকর, যেন সরবে ঘোষণা করবার মতো ভারী এবং দামী কোনো চিন্তা কিংবা অভিলাষ মনের মধ্যে জাগাতে পারাটাই শেষ কথা, তাহলেই আর কোনো সমস্যা থাকবে না। অন্যপক্ষে এলিঅটকেও লিখতে হয় যে ভাষার সমস্যা কবির কাছে জীবনে মেটবার নয় :

So here I am, in the middle way, having had twenty years—
Twenty years largely wasted, the years of *l'entre deux guerres*—
Trying to learn to use words, and every attempt
Is a wholly new start, and a different kind of failure
Because one has only learnt to get the better of words
For the thing one no longer has to say, or the way in which
One is no longer disposed to say it. And so each venture
Is a new beginning, a raid on the inarticulate
With shabby equipment always deteriorating
In the general mess of imprecision of feeling,
Undisciplined squads of emotion. . . . . (*East Coker*)

কবিতার কোনো স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ নেই। প্রাণের আনন্দময় স্বীকৃতিই তার একমাত্র প্রমাণ। অপর প্রমাণ শুধু যে অনিশ্চিত তাই নয়, বিপজ্জনক। তবু যে, এমন কি সৎকবিদের মধ্যেও, একের সঙ্গে অন্যের, এক কবিতার সঙ্গে অন্য কবিতার, বিস্তর তফাৎ তার কারণ সব কবির মনের চরিত্র এক নয়, এক হওয়া বাঞ্ছনীয়ও নয়। দৈবাৎ যে-পৃথিবীতে বাস করার সুযোগ পাওয়া গেল তার আকাশখানায় কাষ্টম্‌স্-পাস্‌পোর্টের দেয়াল নেই। মাটিতে নিশ্চিন্ত পিঁপড়ে জটিল দুর্গ বানায়। রকম রকম হাওয়া দেয় শীত-গ্রীষ্মের বহুব্যঞ্জনা ভরা। ছায়া ক'রে আসা মেঘের তলায় পীত-সবুজের জামিয়ার ঢাকা বৃক্ষ মাথা নাড়ে। পাখা মুড়ে পোড়ামাটির পায়রার মতো

রাঙা টালির ছাত ব'সেছে পাহাড় ঢালুতে। ধুলোওড়া রাঙা রাস্তার বাঁক দূরে অদৃশ্য। ছুটির দিনে মায়ের মুখে নাইতে যাবার তাড়া আসে। ভিন্নদেশের হানাবাড়ির উঠোনে নতুন ঢেঁকি পাতে বাস্তহারার দল। বন্যায় গৃহস্থের ডুবুডুবু খড়ো চালায় ব'সে অভুক্ত কুকুর বিশ্বস্ত পাহারা দেয়। খনিতে আবার ধর্মঘট, রেললাইনের পাশে দ্বিখণ্ডিত প'ড়ে নারীদেহ, চওড়া সিঁদুর টকটক্ করছে, বেকার স্বামী ছ'মাস উধাও। জাহাজের রেলিং আঁকড়ে-ধরা সারবন্দী শূন্য চোখ কোন দিগন্তে লড়াই করতে চ'লে গেল, স্বচক্ষে দেখা। সংসারপ্রকৃতির বিচিত্র এই নানাকিছুর সঙ্গে বাঁধা আছি। যোগসূত্র কোনোটা সরু, কোনোটা মোটা, লম্বা, না হয় খাটো। নির্বিশেষের এই সামান্য উপকরণ নিয়ে শেষ পর্যন্ত কবির কাজ হচ্ছে ভাষার সাহায্যে ধ্বনিময় প্যাটার্ণ তৈরি করা, যার স্বয়ংসম্পূর্ণ রূপের মধ্যেই আনন্দ বিধৃত থাকে। কাব্যের এই চরিত্র কারো-কারো ভালো না-লাগতে পারে। সেটা কোনো বড়ো কথা না। হিতবাদী কবির দরজাতেই না-হয় ভিড় করুন তাঁরা। তবে কাব্যের কাছে যাঁদের সব চাইতে বড়ো দাবী আনন্দের দাবী তাঁরা নিশ্চয়ই বুদ্ধদেব বসুর কবিতাবলী আবিষ্কার ক'রে কৃতজ্ঞ হবেন, আধুনিকের মন নিয়ে ঐতিহ্যকে যে-কবি আত্মসাৎ করেছেন, কাব্যরীতির বিবর্তনে সাম্প্রতিকদের মধ্যে আমরা অনেকেই যাঁর কাছে অশেষ ঋণী এবং যাঁর অনুসৃত সশ্রম কাব্যচর্চার মহৎ আদর্শ নিঃসন্দেহে বাংলা কবিতার মর্যাদা বাড়িয়েছে।

'বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা'। নাভানা

সমালোচনা

স্বর ও অন্যান্য কবিতা। কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত। মডার্ণ পাবলিশার্স, ৬নং বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলকাতা-১২। দেড় টাকা

স্বগত সন্ধ্যা। আনন্দ বাগচী। কৃত্তিবাস প্রকাশনী, ৫-এ, নিমতলা লেন, কলকাতা-১৩। দেড় টাকা

কলকাতার সেনেট হলে এই বছর যে কবি-সম্মেলন হ'য়ে গেল সেখানে দৈবক্রমে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় আমার পাশে বসেছিলেন। সেই সময় সামান্য কৌতুকের কিন্তু বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা লক্ষ্য করেছিলাম। সুভাষের কবিতা-পাঠের সময় যতই এগিয়ে আসতে লাগল, উত্তেজিতভাবে তাঁকে 'পদাতিকে'-র পাতা উল্টোতে ব্যস্ত দেখলাম। শেষ পর্যন্ত কিন্তু, কিমাশ্চর্য, 'পদাতিকে'-র একটি কবিতাকেও তিনি পাঠ-যোগ্য বিবেচনা করতে পারলেন না। অবশেষে, অনন্যোপায় হয়ে, তিনি তাঁর সাম্প্রতিক কবিতার বই 'চিরকুট' থেকেই কবিতা পছন্দ করলেন।

শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্করের কবিতার বই হাতে নিয়ে এই ঘটনাটি মনে পড়ল। রচনাগুলি যেন অন্য এক যুগের। বিগত মহাযুদ্ধের সময় বাংলাকবিতাকে যে-সংশয়পীড়িত নৈরাশ্যময় চেতনার সমবেত আর্তনাদ ব্যাপ্ত ক'রে রেখেছিল, 'স্বর ও অন্যান্য কবিতা' সেই দুরস্মৃতিবিজড়িত। প্রচলিত মূল্যগুলির প্রতি অনাস্থা, সৌন্দর্যের মৌল উপকরণগুলির প্রতি ব্যঙ্গমিশ্রিত করুণা, হয়তো তৎকালীন উদ্‌ভ্রান্ত আবহাওয়ায় স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে, আশার কথা, বাংলাকবিতা তার স্বাস্থ্য ফিরে পেয়েছে; তরুণতম কবিরা তো নিশ্চয়ই, এমন কি প্রবীণ কবিরাও, যাঁরা একদা দোলাচলে হতবুদ্ধি ছিলেন, জীবনের শাশ্বত সত্যে বিশ্বাসী হয়েছেন। এমতাবস্থায় কিরণশঙ্করের কবিতা, 'স্খলিত প্রণয় আজ ঠেকিছে মামুলি' ইত্যাদি পংক্তি, সুভাষের 'পদাতিকে'-র কবিতার মতোই কেমন যেন দূর-দূর ইতিহাসের ধূসর পাণ্ডুলিপি ব'লে মনে হয়।

"স্বর এবং অন্যান্য কবিতা'র রচনাকাল সম্ভবত যুদ্ধমধ্যবর্তী সময়। এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে এই কবির হতাশাক্রান্ত চেতনার স্বপক্ষে যুক্তি মেলে। তাঁর অনুভবে, তৎকালীন আরো অনেক কবির মতো, কোনো ফাঁকি নেই, তাঁর বেদনাবোধও কিছু ধার করা নয়। কিন্তু আক্ষেপের কথা কোনো সময়েই তা বিশেষ হয়ে ওঠেনি। 'মরুচারী মন খুঁজে ফিরে কোনো শান্তি কি' অথবা 'বাক্যের স্রোতে চায়না কিংবা স্পেইনে যাও' ইত্যাদি পংক্তি সুভাষ-কামাক্ষীপ্রসাদও অজস্র লিখেছেন।

কিন্তু সন্দেহ নেই এই বইয়ের কবিতা পাঠককে স্মৃতিচারণার সুযোগ এবং তজ্জনিত আনন্দ দেবে। উল্লেখযোগ্য কবিতাও এই গ্রন্থে একাধিক আছে। 'একচক্ষু' নামক কবিতাটির কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করি :

প্রকৃতিতে আয়োজন বরাবরই ছিল আর এখনো তো আছে
সৌন্দর্যের আবেদন ঋতুতে ঋতুতে প্রতি মানুষের কাছে
আকাশে যে সূর্য ওঠে তার পিছে ঘন নীলিমায়
দিগন্তের মেঘে-রঙে অপূর্ব বিস্ময় দেখা যায়,— …
আমরাই একচক্ষু শুধু, ঘূর্ণাবর্তে গিয়েছি তলিয়ে
ক্ষ'য়ে যাওয়া দগ্ধ চূর্ণ প্রস্তরের মতো।

শিল্পকলার বিবিধ কারুকাজেও কিরণশঙ্কর যত্নবান। তাঁর ছন্দে, শব্দ-ব্যবহারে কৃতিত্ব আছে। যদিও 'স্বর' নামক কবিতায় চলিতের সঙ্গে সাধু ক্রিয়াপদের মিশ্রণ কখনো কখনো পীড়া দেয় এবং 'শারদীয়া' কবিতাটির ছন্দবিন্যাসও কানে বাজে, তথাপি তাঁর সাধনা অবশ্যই সম্মানের।

কবিতার কারুকলায় আনন্দ বাগচী বিশেষ পরিশ্রমী। ছন্দের বৈচিত্র্যে, শব্দের সংস্থাপনে, অনুপ্রাসের দোলায়, উপমার অভিনবত্বে তাঁর অসীম উৎসাহ। এ-সমস্তই শিল্পীর সততাকে প্রমাণ করে। কিন্তু কেবল এইটুকুই যথেষ্ট নয়। আনন্দ বাগচীর কবিতায় এখনো কোনো বিশেষ মন গড়ে ওঠেনি—লঘু-চপলতা, উচ্ছ্বাসের অপব্যয় ইত্যাদি তারুণ্যের সহজ স্বভাবগুলি তাঁর কতিপয় উচ্চাকাঙ্ক্ষী

কবিতাকে সম্পূর্ণ হ'তে বাধা দিয়েছে। তবু, এই বইতে উল্লেখযোগ্য, মনে রাখবার মতো প্রচুর পংক্তি আছে, যেমন :

ছায়া-তরতর দুপুর সিঁড়ির শেষ ধাপে নেমে
আচম্‌কা কোনো সেগুণ বনের কাঠবেড়ালীর
মুখের মতন থমথমে রোদ।

শিল্পকলার বিচিত্র প্রকরণে যেমন তাঁর সহজাত অনুরাগ, সঙ্গে-সঙ্গে কবিতার বিষয়বস্তুর প্রতিও অধিকতর যত্নবান হ'লে তাঁর কাছ থেকে আমরা অনেক বেশি আশা করতে পারবো। কিন্তু ইতিমধ্যেই তিনি যা করতে পেরেছেন তা শুধু আশ্চর্য নয়, ঈর্ষনীয়। শব্দ দিয়ে তিনি একাধারে গান এবং ছবি—দুই-ই ফোটাতে পেরেছেন, বিক্ষিপ্তভাবে দু'এক জায়গায় নয়, ফোয়ারার মতো অজস্রধারায়। প্রথমকাব্যগ্রন্থে এতখানি প্রতিশ্রুতি আর কোনো তরুণ কবির ক্ষেত্রে দেখেছি ব'লে মনে হয় না।

অরুণকুমার সরকার

বহুদিন পর বাংলা কবিতায়
একটি নতুন সুর জন্ম নিলো
গৌরাঙ্গ দত্তের
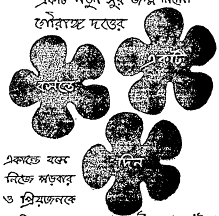

একান্তে বসে
নিজে পড়বার
ও প্রিয়জনকে
পড়িয়ে শোনাবার মতো বই। দাম দু'টাকা
কলকাতার সব দোকানেই পাবেন
প্রকাশক : নিরঞ্জন চৌধুরী
৯১৮, রাসবিহারী এভেন্যু, কলিকাতা

গ্রাহকদের প্রতি নিবেদন

'কবিতা'র এই সংখ্যায় আপনাদের চাঁদা শেষ হ'লো। আগামী (উনবিংশ) বছরের প্রথম সংখ্যা আশ্বিনে প্রকাশিত হবে। কবিতা-সম্পাদক বিদেশে আছেন ব'লে এ-বছরের প্রায় কোনো সংখ্যাই আমরা নির্ধারিত সময়ে প্রকাশ করতে পারিনি। আশ্বিনেই তিনি এদেশে পৌঁছবেন এবং তখন থেকে 'কবিতা'র প্রকাশ আবার নিয়মিত হ'বে ব'লে আমরা আশা করি।

আপনাদের নতুন বছরের চাঁদা (চার টাকা, রেজিষ্টার্ড ডাকে সাড়ে পাঁচ টাকা) ভাদ্রমাসের মধ্যে পাঠিয়ে দিলে আমরা বাধিত হবো। যাঁরা আর গ্রাহক থাকতে ইচ্ছুক নন তাঁরা দয়া ক'রে আগামী মাসের মধ্যেই আমাদের জানাবেন। ডাকমাশুল অনেক বেড়ে গেছে; ভি. পি. ফেরৎ এলে আমাদের ক্ষতি হয়; আপনারা একটু সচেষ্ট হ'লে এই ক্ষতির নিবারণ হ'তে পারে।

কবিতাভবন
১০১ রাসবিহারী এ্যাভেনিউ
কলকাতা ২৯

কবিতাভবন প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসুর বই

গল্পসংকলন

লেখকের বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন ধরনের আঠারোটি ছোটো এবং বড়ো গল্প। ছোটো গল্পের কারুশিল্পে বুদ্ধদেব বসুর প্রকৃষ্ট পরিচয় এই বইয়ে পাওয়া যাবে। রয়্যাল আকারে বোর্ডে বাঁধাই। উপহারের উপযোগী। ৫৲

সাড়া

বিখ্যাত প্রথম-উপন্যাস। পরিমার্জিত সুদৃশ্য সংস্করণ। ৩॥০

বিশাখা

একটি করুণ মধুর রসোজ্জ্বল প্রেমের কাহিনী। মনোরম প্রচ্ছদ। ২॥০

স্বতন্ত্র দুটি ছোটোগল্প

একটি সকাল ও একটি সন্ধ্যা ॥০
একটি কি দুটি পাখী ॥০

কবিতাভবন প্রকাশিত প্রতিভা বসুর উপন্যাস

সেতুবন্ধ ২॥০

অন্নদাশঙ্কর রায়

রাতের অতিথি

কাব্যনাটিকা। লেখক কর্তৃক স্বাক্ষরিত এবং প্রতিগ্রন্থের সংখ্যাযুক্ত এই পুস্তিকা মাত্র ১০০ কপি ছাপা হয়েছিল। বিক্রীত অর্থ 'কবিতা'-র পক্ষ থেকে পীড়িত কবি হেমচন্দ্র বাগচী মহাশয়কে পাঠানো হবে। এখনো কিছু কপি অবিক্রীত আছে। দাম এক টাকা।

কবিতা ভবন
২০২ রাসবিহারী এ্যাভিনিউ, কলকাতা

KAVITA—Vol. 16, No. 4: August 195[illegible]

Yearly Rs. 4/- or 6s. 6d. or £ 1. 50.
Per Copy Rupee 1/-
এক টাকা

Published quarterly at Kavitabhavan, 202, Rashbehari Avenue, Calcutta 29 India.

Editor & Publisher: BUDDHADEVA BOSE

Printed by Temple Press, 2, Nayaratna Lane, Calcutta 4.

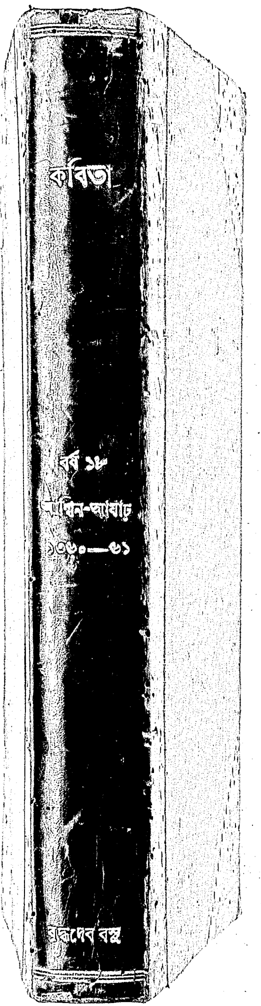
কবিতা
বর্ষ ১৮
আশ্বিন-আষাঢ়
১৩৬০—৬১
বুদ্ধদেব বসু